সেকুলার ভারতে ধর্ম ও রাজনীতি

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

উদ্ভাস
২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্
কোলকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩

'উবুদশ'-এর পক্ষে
২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্‌, কোলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে
গৌতম চৌধুরি কর্তৃক প্রকাশিত
এবং
লেজার গ্রাফিক্স, ৩, মধু গুপ্ত লেন্‌, কোলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত

অগ্রজদের স্মরণে

লেখকের নিবেদন

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক অনিলবরণ রায়ের তত্ত্বাবধানে ইউ.জি.সি. গবেষক হিসেবে 'Religion and Politics in Bengal : Continuity and Change' শীর্ষক গবেষণা সম্পাদন করার সময় (১৯৮০-১৯৮৪) ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে বিভিন্ন লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি রচনা মুদ্রিত রূপ পাবার পর অনুজ-প্রতিম সুহৃদ্ গৌতম চৌধুরির উদ্যোগে এগুলির এক সঙ্কলন 'সেকুলার ভারতে ধর্ম ও রাজনীতি' প্রকাশ পেতে চলেছে।

আমাদের প্রতিপাদ্য, ভারতের 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নীতি বহাল থাকার জন্যই বিবিধ সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘ'টে চলেছে, যার বীভৎসতম রূপ ২০০২ সালের 'গুজরাট'। এই নীতি— সমাজ ও রাজনীতি সেকুলারাইজ করতে অক্ষম। 'সেকুলার' শব্দের প্রকৃত অর্থ ধর্মহীন। 'ধর্মনিরপেক্ষ' নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা হোলো ব্রিটিশ-আমলের 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি'। স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে এক সমাজবিজ্ঞানী 'মালটি রিলিজিয়াস কালচারাল পলিসি' ব'লে অভিহিত করেছেন। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণ একে 'রিলিজিয়াস ইম্‌পারাশিয়ালিটি' বলেছেন। বিভিন্ন রচনায় এই 'কনসেপ্ট'-টি এসেছে ব'লে আমরা প্রথম রচনায় 'ধর্মহীনতাকে' প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছি। পরবর্তীতে কালানুক্রম অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। পাঠকের সামান্য মনোযোগে উৎসাহ পাওয়া যাবে ভবিষ্যতের রচনার প্রস্তুতিতে। এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি পূর্ব-প্রকাশিত হ'লেও পরিমার্জন করা হয়েছে।

শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই বইয়ের প্রাক্-কথন লিখে দিয়েছেন অধ্যাপক স্বপনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়। প্রথাগতভাবে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি না।

পরিশেষে একটি কথা, প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি 'The Week' (২৪.৩.২০০২) পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে; তাঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

আজ বিশেষ ক'রে মনে হচ্ছে মা-বাবার কথা; যাঁদের কাছে সমাজেতিহাসের পাঠ শুরু হয়েছিল। সত্যকে সত্য বলার শিক্ষণ যাঁরা দিয়েছিলেন!

৬.২.২০০৩

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়
কোলকাতা-৭০০ ০৫০

সূচিপত্র

ধর্ম ও ধর্মহীনতা	১৫
যুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায়	২৯
উনিশ শতকের বাঙলায় হিন্দু জাতীয়তা	৩৬
সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা ঃ 'আনন্দমঠ' বিতর্ক	৪৪
জাতীয়তা ও জাতীয় সঙ্গীত	৬৭
বিবেকানন্দের রাজনীতি	৭৩
ভাষা নিয়ে রাজনীতি ঃ সেকালে ও একালে	৮০
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি	৮৯
শ্মশ্রু— শিখা ও নারী	১০৯
জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা ঃ মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা	১১৭
রবীন্দ্র দৃষ্টিতে হিন্দু জাতিভেদপ্রথা	১৩৫
গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও রাজনৈতিক ধর্ম	১৪১
ধর্মান্ধতা ও নির্বাচনী রাজনীতি	১৫৪
'সেকুলার' ভারতে রাজনৈতিক হিন্দুত্ব	১৬৫
'সেকুলারিজম' ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা	১৭৭

ধর্ম ও ধর্মহীনতা

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মশাইকে সাম্প্রদায়িক বলার মতো লোক দেশে বোধহয় বেশি পাওয়া যাবে না। অথচ তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'তরী হতে তীর'-এ তিনি লিখেছেন, "বড়লাট কর্জন-এর মতো যাদের খ্যাতি ছিল কলকাতাপ্রেমী ব'লে তাদের ভালোবাসা 'মুসলমানের মুরগী পোষার' বেশি কিছু ছিল না কোনো কালে।"

সামাজিক ও লৌকিক কারণে প্রবাদ প্রবচনের উৎপত্তি। উচ্চবর্ণ হিন্দুবাবুর দৃষ্টিতে মুরগী পোষা অবশ্যই খারাপ কাজ, এক ধরনের নীচ বৃত্তি। মার্ক্সবিরোধী সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খাইম হিন্দু বামুনের ঘরে জন্মালে অবশ্যই একে বলতেন 'প্রফেন' বা অপবিত্র, ধর্ম বহির্ভূত ব্যাপার। বর্ণহিন্দুরা মনে করেন 'নেড়েরা' মুরগী পোষে কেটে-কুটে খাওয়ার জন্য; এ কাজ শিষ্টাচারী হিন্দুবাবুদের যোগ্য কাজ নয়। এ মনোভাব থেকেই আমরা সচেতন বা অচেতনভাবে বলি 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত' অথবা 'পড়েছি মোগলের হাতে' ইত্যাদি।

এক সম্প্রদায়কে যখন অপর এক সম্প্রদায় অবজ্ঞা যা তাচ্ছিল্য করে তখনই এ ধরনের প্রবাদ প্রবচনের উৎপত্তি হয় এবং ক্রমশ তা বাক্যশৈলী বা রচনাশৈলীতে স্থান দখল ক'রে নেয়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতো জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তখন 'সামাজিক স্বভাবের' বশবর্তী হয়েই এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করেন অসচেতনভাবেই, যাঁর অন্তত এ ব্যাপারে মুক্ত দৃষ্টি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

মন্ত্রী, নেতা, সরকারি ব্যক্তিরা এবং বহু সাধারণ মানুষও মনে করেন সাম্প্রদায়িকতার অর্থ খুন-জখম, নারীত্বের অসম্মান, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ইত্যাদি অপকর্ম। কিন্তু মানুসকে মানুষের পূর্ণ সম্মান জানাবার অক্ষমতাও তো সাম্প্রদায়িকতা, "মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে" যে জীবন যাপন তার মতাদর্শকে আমরা সাম্প্রদায়িকতাই বলবো, হোক না তা নিষ্ক্রিয়। বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় এ মনোভাব লালন করেছে যুগ যুগ ধ'রে যা মনুষ্যত্বকে বহুভাবে লাঞ্ছিত করেছে, অপমানিত করেছে! ধার্মিক বর্ণহিন্দু নিষ্ঠাভরে 'ধর্মতন্ত্র' পালন ক'রে এসেছেন যুগ যুগ ধ'রে; এই ধর্মতন্ত্র বলে— "মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মানো তবে ধর্ম ভ্রষ্ট হইবে।"

ইংরেজ রাজছত্রের 'নিরাপদ আশ্রয়ে' স্থান লাভ করার পর বর্ণহিন্দুবাবুরা প্রধানত রামমোহনের ইতিহাসচর্চার ফলে মুসলমানের প্রতি অতিমাত্রায় বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে অভিজাত হিন্দু-মুসলমানে বিবিধ পার্থক্য ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকলেও তা উনিশ-বিশ শতকের রাজনৈতিক হিন্দুত্ব আর রাজনৈতিক ইসলামের মতো কদর্য রূপ ধারণ করেনি, 'দ্বি-জাতি উদ্ভবের কাবণগুলিও ব্রিটিশ-পূর্ব বাঙলা বা ভারতে অনুপস্থিত ছিল।

প্রধানত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) উদ্ভুত বঙ্গসমাজে বর্ণহিন্দুর উচ্চমন্যতা আর অর্থ-লোভ, মুসলমানের রাজ্য হারানোর নিষ্ফলা ক্ষোভ, ইংরেজ বিদ্বেষ, হীনমন্যতা এবং ব্রিটিশের

ইন্ধনের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৮৪৮ সালে লর্ড এলেনবোরো বাহাদুর বলেন, "আমি এই জাতি [race] (মুসলমান)-র [শত্রুতা] উপেক্ষা করতে পারি না; এরা আমাদের জাত-শত্রু! এ কারণে আমাদের উচিত হিন্দুদের দলে টানা।"[১] ব্রিটিশের এই কৌশলের ফলেই হিন্দু-মুসলমানে পারস্পরিক বিদ্বেষের জন্ম হয়, বিস্তৃত হ'তে শুরু করে "ঐ জাজিমতোলা আসনের বহুদিনের মস্ত ফাঁক"! পরবর্তীকালে হিন্দুবাবুরা বুঝতে পারেননি ঐ ফাঁকটা "ছোট নয়, ওখানে অকূল অতল কালাপানি, বক্তৃতা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই তা পার হওয়া যায় না।" 'কালাপানি' পার হওয়া যায়নি, ইতিহাস কলঙ্কিত, দেশ ভাগ হয়েছে।

আজ বিভিন্ন বর্ণের নেতারা বক্তৃতা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দেন— "এক জাতি, এক প্রাণ, একতা"— কিন্তু একতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আজও বহু মানুষ রবীন্দ্রনাথ কথিত সেই স্বদেশী প্রচারকের ভাবনায় ভাবিত! স্বদেশী বাণীর প্রচারক এক গ্লাশ জল খাবার সময় তাঁর মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া থেকে নেমে যেতে বলতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননি। এ তো প্রচারকের ধর্মবিধি! আজকের ভাবতেও এই ধর্মবিধি পালন অসাংবিধানিক নয়।

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে বহুবিজ্ঞাপিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রথম পুরুষ রামমোহন রায় ব্রাহ্মণত্বের অহমিকা ত্যাগ করতে পারেননি। ভারতবর্ষের সফলতম ক্যারিজমাটিক রাজনৈতিক নেতা মহাত্মা গান্ধী মুসলমান বা খৃষ্টানের গৃহে ফল ছাড়া কিছু খেতেন না।[২] "শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনো দিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই।" স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বদেশ নিয়েও কম কাণ্ডকারখানা চলছে না, নেতারাও ঢাক পেটাচ্ছেন আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত ক'রে, কিন্তু স্বজাতির অভিষেক আজও হয়নি, অকূল অতল কালাপানি আজও যোজন বিস্তৃত।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারফৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটলেও এই হতভাগ্য দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও 'সেকুলারিজম'-এর পক্ষে কোনো আন্দোলন গ'ড়ে ওঠেনি। দাঙ্গাবিধ্বস্ত খণ্ডিত ভারতে 'সেকুলারিজম'-এর কথা বারবার উচ্চারিত হ'লেও ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনায়করা সেকুলারিজম-এর প্রকৃত অর্থ গোপন ক'রে যাবতীয় ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারে উৎসাহ-দান করার ব্রিটিশ-কৌশলকেই বরণ ক'রে নেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ইতিহাসের ছাত্র ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের সেকুলারিজম সম্পর্কে বলেন, "যেহেতু আমরা এক সেকুলার রাষ্ট্র গড়েছি, এ কারণে অনেকে মনে করেন যে আমরা ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী নই। [আমাদের সেকুলারিজম-এর প্রকৃত অর্থ] আদৌ তা নয়; আমরা আমাদের দেশে প্রত্যেকে নিজ পছন্দমতো মত ও পথ পালন ও প্রচার করার পূর্ণ অধিকার ভোগ করি ও প্রতিটি ধর্মের মঙ্গল চাই এবং তাদের বাধাহীন বিকাশ চাই।"

আর নেহরু বলেন, "সেকুলার রাষ্ট্র মানে এমন কোনো রাষ্ট্র নয় যেখানে মানুষে ধর্ম পরিত্যাগ করবে, সেকুলার রাষ্ট্র মানে এমন এক রাষ্ট্র যেখানে রাষ্ট্র সমস্ত ধর্মকে রক্ষা করে, কিন্তু

কোনো নির্দিষ্ট এক ধর্মের মূল্যে অন্য কোনো ধর্মের পক্ষাবলম্বন করে না— বা কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে না।''

আরও পরবর্তীকালে ভারতের সংবিধানে 'সেকুলার' শব্দটি সংযোজিত হয় রুদ্রাক্ষের কণ্ঠহারে সজ্জিতা ইন্দিরা গান্ধীর কল্যাণে! অথচ তিনিও সেকুলার শব্দের প্রকৃত অর্থ গোপন করেন। একে রাজনৈতিক অসাধুতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞান লিখিত হয় রাজনৈতিক নির্দেশে বা প্রাপ্তির আশায়। তাই অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই সেকুলারিজম-এর ভারতীয় ভাষ্য বা ধর্মনিরপেক্ষতা লাভ ক'রেই সন্তুষ্ট, কখনো-বা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এঁরা ভারতরাষ্ট্রের ধর্ম বিষয়ক উদারতায় মুগ্ধ।

রাষ্ট্র— সেকুলার, রাজনীতি— সেকুলারিজম-এর অনুবর্তী, অথচ তুচ্ছ কারণেই নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িকতা সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেশভাগের এতদিন পরেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে, শিশু পিতৃহারা হয়, মা হন পুত্রহারা। চোখের জল আর হৃৎপিণ্ডের রক্ত— ধর্ম বোঝে না, 'জাত' বোঝে না, অথচ কত সহজেই দাঙ্গার তালিকায় সংযোজিত হয় নতুন নতুন তথ্য।

১৯৬৯ সালের শীতে কোলকাতার এক জনসভায় 'সীমান্ত গান্ধী' আব্দুল গফফর খান বলেন, ''ভারত ও পাকিস্তানে ধনীরাই দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়, [আর এই দাঙ্গায়] কখনোই ধনীদের মৃত্যু হয় না।''[৩] সরল সত্য! এদেশে ধনপতি কুবের আর তার রক্ষাকর্তারা জানেন কী ক'রে প্লীহা-সম্বল মুসলমান কৃষক— আর কীটদষ্ট শ্বাসযন্ত্র-সম্পন্ন হিন্দু-মজুরের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া যায়।[৪] দ্বি-জাতি তত্ত্ব এখন সংবিধান আর রেডিও-টেলিভিশনে স্থান পেয়েছে; স্থান পেয়েছে নির্বাচনী ইস্তাহার আর ব্যালট বাক্সে। এ সবই ঘটে— বিভিন্ন গোত্রের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবর্গ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুর দল আর সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী-'পণ্ডিত'দের সম্মিলিত কণ্ঠে আবৃত্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মনিবপেক্ষতা নামক সুবিধাবাদী শব্দযুগলের ছত্রছায়ায়। দাঙ্গা হয়, নিহত হয় মানুষ, প্রাণের 'মূল্য' চুকিয়ে দেওয়া হয় নিষ্প্রাণ মুদ্রার মূল্যে! প্রবল প্রতাপে বিরাজ করেন 'সর্বত্যাগী' ধর্মগুরুর দল; লজ্জাহীন, লোভী রাজনৈতিক নেতা; প্রশাসন আশ্রয় দেয় হত্যাকারীকে; 'সেকুলার' দেশ 'এগিয়ে চলে' ধর্মের পথে, ভক্তির পথে, গভীর থেকে গহন অন্ধকারে!

স্বাধীন ভারতে সম্প্রদায়িক অশান্তির কারণ দর্শাতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে আবু সৈয়দ আয়ুব বলেছেন, ''আমাদের সংবিধান উদার, সহিষ্ণু এবং নিরপেক্ষ....'' ইত্যাদি! আমাদের মনে হয় কোনো সাম্প্রদায়িক সমাজে 'উদার', 'নিরপেক্ষ' সংবিধান নিষ্ফলা হ'তে বাধ্য। এর কারণ ভারতের সমাজ ও রাজনীতি বহুলাংশেই ধর্মান্ধতার প্রভাবে প্রভাবিত। সমাজ ও রাজনীতিকে 'সেকুলারাইজ' করার কোনো প্রচেষ্টাই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়করা নেননি বরং এর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা প্রচার ক'রে জনসাধারণকে সচেতন না ক'রে, আলোকিত না ক'রে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার আর অন্ধতাকে 'জাতীয় সংস্কৃতি' রূপে বরণ ক'রে নিয়েছেন। এর ফলে পৃথক নির্বাচনী রাজনীতির বিলুপ্তি ঘটলেও ভারতের গণতান্ত্রিক প্রবাহে ধর্মীয় 'সংখ্যাগুরু' ও 'সংখ্যালঘু' বিভাজন আজও দৃষ্ট হয়। ভারতের রাজনৈতিক-সংস্কৃতি ধর্মাশ্রয়ী হওয়ার জন্য কেবলমাত্র

সাম্প্রদায়িক চিন্তাই নয়— জাতপাত গুরুবাদ ইত্যাদির প্রকাশ্য-প্রভাব তথাকথিত সেকুলার নেতাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপে দেখা যায়।

কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী ভারতরাষ্ট্রকে "Non-interventionist" সেকুলার রাষ্ট্র বলেছেন। অর্থাৎ ভারতরাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে নিরপেক্ষ, তাদের ধর্ম পালনের ব্যাপারে উদার এবং জনসাধারণের ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো (যতক্ষণ না তা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছে বা নৈতিকতা ক্ষুণ্ণ করছে) ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করে না— বা 'নাক গলায় না'। এই কারণে, সাম্প্রদাযিক সংগঠনগুলি প্রকাশ্যেই তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। একদা জহরলাল নেহরু "organised religion" বা 'সংগঠিত ধর্ম'গুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন। হিন্দুধর্মে কোনো 'চার্চ' না থাকলেও হিন্দু সমাজটাই 'থিওক্র্যাটিক' সমাজ অর্থাৎ ধর্মাশ্রয়ী সমাজ; শত সহস্র বছর ধ'রে জাতিভেদপ্রথার অচলায়তন হিন্দুর বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে ব'সে আছে। খৃষ্টান বা মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মবোধ আজও বহুলাংশেই প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠিত বা 'অর্গানাইজ্‌ড'; সুতরাং প্রগতি-বিরোধী। এই পশ্চাৎমুখী সমাজ-প্রবণতার বিপরীতে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার প্রক্রিয়াকে 'সেকুলারাইজেশন' বলা যায়। সেকুলারাইজেশনের ফলে ব্যক্তিমানুষ জীবিকা, রাজনীতি, বিবাহ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সিদ্ধান্ত নেয় যুক্তিসিদ্ধ পথে, ধী-র পথে, প্রজ্ঞার পথে— ধর্মীয় অনুভূতি বা অন্ধবিশ্বাস তথা লোকাচারের ক্রীড়নক হয়ে নয়।[৫]

আমরা আগেই বলেছি, আমাদের দেশে সেকুলার শব্দের অর্থ করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষতা। আমাদের ধারণা— 'সেকুলারিজম'-এর অর্থ বাঙলা শব্দ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'য় সঠিকভাবে পরিস্ফুট হয় না। ওপার বাঙলার লেখক সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন 'সেকুলার' শব্দের অর্থ করেছেন 'ইহজাগতিক'। রশীদ আল ফারুকী 'সেকুলার' শব্দের বাঙলা অর্থ হিসেবে 'ধর্ম নিরপেক্ষ' শব্দযুগল ব্যবহার করেছেন। বদরুদ্দীন উমর 'সেকুলারিজম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও অতি সংক্ষেপে এর তাৎপর্য আংশিকভাবে বিবৃত করেছেন, "একটি সমাজে সেকুলারিজম বলতে যেটা বোঝায় তাকে ধর্মনিরপেক্ষতাই বলুন বাঙলায় বা অন্যকিছু বলুন, সেকুলারিজম একটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না, একটা রাষ্ট্র ধর্ম থেকে বিযুক্ত হ'তে পারে না, যদি সেই সমাজে যাকে বলা হয় একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব না হয়।" একথা বললেও উমর সাহেব একই আলোচনার অন্যত্র 'সেকুলারিজম'-এর বাঙলা অর্থ হিসেবে 'ইহজাগতিকতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার লেখক গৌতম রায় লিখেছেন, "ভারত যেহেতু একটি গণতন্ত্রী রাষ্ট্র তাই এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীও নিজের ভাবধারার প্রচারের এবং সংগঠন গড়ার সুযোগ পায়।" অর্থাৎ রায় মশাইয়ের দৃষ্টিতেও 'সেকুলারিজম' আর ধর্মনিরপেক্ষতা সমার্থক। তিনি লিখেছেন, "ভারত রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতায় প্রতিশ্রুত রাষ্ট্র....,"[৬] কিন্তু এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মান্য করা হয় না, এবং এই প্রবণতার সূচনা ইন্দিরাজীর আমল থেকে। নেহরু-ভক্ত গৌতম রায়ের এই কথা গ্রাহ্য হ'লে বলতে হয়, নেহরুর বন্ধুবান্ধব যেমন বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, চক্রবর্তী রাজাগোপাল প্রমুখ ছিলেন খাঁটি সেকুলার এবং এঁদের আমলে ভারতবর্ষে সেকুলারিজম-এর আদর্শ মান্য করা হোতো। অথচ ইতিহাস কিন্তু একথা বলে না।

আমরা বিশেষ জোর দিয়েই বলতে পারি— দেশবিভাগ-উত্তরকালে একমাত্র নেহরু ছাড়া আর কোনো নেতা প্রকৃত অর্থে সেকুলার ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনে নেহরু অজ্ঞেয়বাদী তথা সেকুলার ছিলেন; কিন্তু অন্য জ্যোতিষ্করা প্রায় সকলেই ছিলেন ধর্মান্ধ, কূপমণ্ডুক এবং সাম্প্রদায়িক। এ কারণে কংগ্রেসের অনেক নেতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য মুসলমানদের দায়ী করেন এবং মুসলমানদের এই ব'লে উপদেশ দেন যে, তাঁদের উচিৎ পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস গা।[৭]

আনন্দবাজারের অপর এক লেখক এ. কে. রায় কিন্তু লিখেছেন ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ''শত ধর্ম প্রস্ফুটিত হোক'' নয়, অথবা ''বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রও নয়....''[৮] ভারতবর্ষের প্রচারিত ও প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতা আর যা-ই হোক, তা যে সেকুলারিজম নয়, একথা এ. কে. রায়ের রচনায় প্রকাশ পেলেও— বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে তিনি যাননি। তাঁর রচনায় কিছু ইতিবাচক ইঙ্গিত থাকলেও আলোচনা গভীরতা লাভ করেনি।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা ভারতরাষ্ট্রকে সেকুলার রাষ্ট্র মনে করেন না। তাঁরা ভারতের 'সেকুলারিজম'কে 'সিউডো সেকুলারিজম' বা 'মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা' বলেন এবং সমস্ত লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে হিটলারী কায়দায় দীর্ঘদিন ধ'রে গণহত্যা চালিয়ে নির্বোধ দম্ভে ঘোষণা করেন, ''রাশিয়া যেমন কমিউনিজমের, আমেরিকা যেমন ধনতন্ত্রের, তেমনই ভারত হোলো হিন্দু সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার গবেষণাগার।''[৯] আর 'রিলিজিয়াস ইম্পারশিয়ালিটি' তথা 'মালটি রিলিজিয়াস কালচারাল পলিসি'কে সরাসরি অগ্রাহ্য ক'রে আস্ফালন করেন, ''মুসলিমদের নিরাপত্তা হিন্দুদের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল।''[১০] অথবা ''মুসলিমদের উচিৎ ইসলামকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা।''[১১] —সত্যিই এরা 'বর্বর'।

মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা সেকুলার রাজনীতি অথবা সেকুলারিজম-এর মতাদর্শকে সম্পূর্ণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তীব্রভাবে আক্রমণ ক'রে থাকেন। লক্ষ করার বিষয় হোলো এঁরা সেকুলার রাজনীতির প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু পরিমাণে অবগত আছেন এবং এ কারণে এঁদের বক্তব্য সেকুলারিজম-এর আদর্শের প্রতি অতিমাত্রায় বিদ্বেষপূর্ণ। এঁরা প্রচার করেন, ''জনসাধারণকে নীতিহীন রাজনীতির পরিবর্তে নীতিযুক্ত রাজনীতিতে অভ্যস্ত করা সময়ের একটা বড় দাবি। ধর্ম ও রাজনীতিকে যাঁরা পৃথক মনে করেন, তাঁদের কাছে এই কঠিন রোগের [নীতিহীন রাজনীতি] কোনো দাওয়াই নেই। এ দাওয়াই তাঁদের কাছেই আছে যাঁরা ধর্মকে রাজনীতি মনে করেন আর রাজনীতিকেও মনে করেন ধর্ম। ধর্মহীন রাজনীতির.... কুফল ও তার বিকল্প সম্পর্কে তাই সাধারণ মানুষের আজ চিন্তা করার সময় এসেছে।''[১২]

আমাদের বিচারে 'সেকুলারিজম'-এর বাঙলা প্রতিশব্দ যদি খুঁজতেই হয়, তবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' থেকে 'ধর্মহীনতা' শব্দটি অধিকতর উপযুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সেকুলারিজম— এই দু'টি 'কনসেপ্ট' বা ধারণা মূলগতভাবেই পৃথক। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমাদের মনে হয় সেকুলারিজম-এর সঙ্গে ধর্মহীনতার নৈকট্য রয়েছে। পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন— 'সেকুলার' শব্দটির অর্থ হোলো ''ধর্মের থেকে পৃথক'', ''ধর্মবিরোধী'', ''ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন....'' ইত্যাদি। সেকুলারিজম পরজগৎকে স্বীকার করে না— এ কারণে সেকুলারিজম-এর বাঙলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'ইহজাগতিকতা'কেও গ্রহণ করা যায় না। আধুনিক

ভারতের রাজনৈতিক ট্র্যাডিশন অনুসরণ ক'রে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে আমরা 'রিলিজিয়াস নিউট্র্যালিটি' বলতে পারি। ধর্মপ্রাণ, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণ 'সেকুলারিজম'কে 'রিলিজিয়াস ইম্‌পারশিয়ালিটি' বলেছেন। ভারতের শাসক-এলিট-অনুসৃত এই নীতি তত্ত্বগতভাবে প্রধান দু'টি সম্প্রদায় সম্পর্কে নিরপেক্ষ। অর্থাৎ 'ইটপুজো', আর 'বোরখা' 'তালাক'-এর দাবির প্রতি সস্নেহে সহনশীল, শিখা আর শ্মশ্রুর দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ। দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটলে নেতৃবৃন্দ 'ক্ষতিপূরণ' করেন; সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেন না— ভোট হারাবার ভয়ে।

কার্ল মার্ক্সকে 'ধর্মের সমাজতত্ত্ব' (Modern Sociology of Religion)-এর জনক বলা যায়। মার্ক্স বলেছেন— ধর্ম মানুষকে তৈরি করে না, মানুষ ধর্মকে তৈরি করে। মার্ক্স-পূর্ব যুক্তিবাদীরাও মনে করতেন মানুষ ধর্মের অগ্রজ। কিন্তু যুগে যুগে ধর্মবেত্তা আর সমাজকর্তার দল প্রচার কবেছেন— ধর্ম ঈশ্বরের কথা বলে, ধর্ম আদর্শ জীবন-যাপনের পাথেয়, ধর্ম ঈশ্বর লাভের সোপান। মহান ভারতে 'গীতা'র শিক্ষা— নিষ্কাম কর্ম, বর্ণগত বৃত্তি— ধর্মনিষ্ঠ ও সৎ জীবন-যাপনের একমাত্র উপায়, যার অনুসরণ ধার্মিক মানুষকে পরজন্মে দেয় অধিকতর শান্তি, স্বীকৃতি, বৈভব, অবশেষে মুক্তি! সমাজে বৈষম্য, অবিচার, অনধিকার সবই পরম করুণাময়ের ইঙ্গিত-বাহিত, তাকে অনুসরণ করাই বর্ণ ধর্ম। প্রশ্ন নয়, বিদ্রোহ নয়, চাই নিষ্ঠা, চাই অসূয়াহীন কর্ম। 'শাশ্বত ভারত' উদ্ভাসিত হয়েছে ব্রাহ্মণ তত্ত্বজ্ঞানী আর ক্ষত্রিয় নৃপতির পারস্পরিক সহযোগিতার অনড় অটল ব্যবস্থায়।

শান্তি সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করেছে নবীন ধর্ম ইসলাম। এর ব্যাখ্যা-কর্তা সুগভীর বিশ্বাসে বিধাতার নির্দেশের কথা বলেছেন, "জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা করার অধিকার সর্বসাধারণ প্রাণী ও মানুষের জন্যই সর্বতোভাবে সমান। খোদার নির্দিষ্ট পথে (হালাল উপায়ে) যে যত পারো উপার্জন করো এবং খোদার নিয়মে তাহা ভোগ ও ব্যবহার করো। অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সকল মানুষই যে একেবারে সমান উপার্জন করিতে পারিবে, এমন কোনো কথাই হইতে পারে না। কারণ মানুষের বুদ্ধি, প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও কর্মকৌশল স্বভাবতই সমান নহে। কাজেই উপার্জন-ক্ষমতাও সকলের সমান হইবে না। তাই কাহারও ধন বেশি আর কাহারও কম হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নহে— অন্যায়ও নহে.... দুনিয়ার জীবনে মানুষের রুজি আমিই তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছি এবং আমিই (রুজির ব্যাপারে) কাহারও অপেক্ষা কাহাকেও বেশি দান করিয়াছি— যেন পরস্পর পরস্পরের দ্বারা কাজ করাইতে পারে।"[১৩]

সেইন্ট মার্ক-এর সুসমাচারের অনুজ্ঞা "রাজার প্রাপ্য রাজাকে দাও, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও!" বিধাতার আশীর্বাদেই রাজার শাসন বৈধ! শাসন মেনে চলো!

যুগে যুগে সভ্যতার প্রেক্ষাপটে পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে; শাস্ত্রজ্ঞানী ব্রাহ্মণকুল, উলেমা, 'স্বর্গ-নরকের বার্তার প্রচারক' ও 'স্বর্গের চাবির নিয়ন্ত্রণ কর্তা' যাজক সম্প্রদায় ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁদের সুসমাচারের মূলকথা বৈষম্যভিত্তিক সমাজে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন; দ্বন্দ্ব নয়— সহযোগিতা; যুক্তি নয়— বিশ্বাস; সংগ্রাম নয়— আত্মসমর্পণ; ইহজগৎ নয়— পরজগৎ! ভাগ্যের লিখন অমোঘ, 'সভ্যতার পিলসুজ'-এর উচিৎ এই বিধান মেনে নেওয়া; ইহজাগতিক ক্লেশ দেবে পরজীবনে অমরত্বের প্রতিশ্রুতি। উপনিষদে তত্ত্বজ্ঞানীর উপদেশ— "বিত্তের দ্বারা

অমরত্বের কোনো আশা নাই"। পরম করুণাময় ঈশ্বর শ্রমজীবীকে অমরত্বের সন্ধান দিয়েছেন আর নিষ্ঠুর নরপতির শাসন-দক্ষতায় ঈশ্বরের আসন অটুট রয়েছে। ধর্মভীরু মানুষের মনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে ঈশ্বরের বাণী। সৃষ্টি হয়েছে "বিপরীত জগৎ চেতনার"।[১৪]

তবুও সমাজের প্রগতি ঘটেছে, আর প্রগতির শর্তই হোলো জিজ্ঞাসা অনুসন্ধিৎসা আর দ্বন্দ্ব। তাই বিত্তহীনের দল ভেবেছেন, সংগ্রাম করেছেন, কখনো কখনো বিদ্রোহ করেছেন। ভারতে চার্বাকপন্থীরা জড়বাদ প্রচার করেন। এঁরা বলেন, "যারা দেহোত্তর অস্তিত্বের কথা বলে, তারা মিথ্যা বাক্‌বিস্তার করে। শরীরের যখন মৃত্যু হয়, মূর্খ আর জ্ঞানী— সকলেই সমানভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর পর কিছু বাকি থাকে না।" পাশ্চাত্যে আধুনিকতার উদ্বোধনে কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩), ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) চরম অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছেন; 'বে-শারা'র দল মন্দির-মসজিদের চৌহদ্দির বাইরে 'প্রেমময়'-এর সন্ধান করেছেন; প্রতীচ্যে এসেছে নবজাগরণ আর এদেশের কবি গেয়েছেন "সবার উপরে মানুষ সত্য!"

পাশ্চাত্য জগতে এক যুগসন্ধিক্ষণে সেকুলারিজম সংক্রান্ত চিন্তার উন্মেষ ঘটে। এই মতবাদ— বিশ্বাসের উপরে স্থান দেয় যুক্তিকে, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বানের উপরে স্থান দেয় জিজ্ঞাসাকে, ধর্মান্ধতার উপরে স্থান দেয় বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিকে। ক্রান্তিলগ্নের আলোড়নে বিধিলিপি অস্বীকার করার স্ফূর্তিতে ব্যক্তি আপন ইতিহাস গ'ড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে, নির্দিষ্ট এক সম্প্রদায়ের মানুষ হয়ে ওঠে একক, অনুসন্ধিৎসু। একক মানুষ ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতানুসারে সেকুলারিজম-এর মতাদর্শ রেনেশাঁস ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলশ্রুতি। রেনেশাঁসের মানবতাবাদ অদেখা জগৎ বা পরজগতের বিশ্বাসকে অস্বীকার করে; মানবজীবনের অর্থ সন্ধানে ব্যাপৃত হয় বস্তুজগতের সীমার মধ্যে। ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-৩৫) যাজকদের ভণ্ডামী, আপ্তবাক্যের জঞ্জাল আর ঈশ্বরতত্ত্বের কোলাহল থেকে রাজনীতির ব্যাখ্যাকে মুক্ত করার প্রয়াস পান। মাটির পৃথিবীতে আস্থাশীল মানুষ অগ্রসর হয় অকুতোভয়ে।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন পাদ্রীতন্ত্রের যাবতীয় দুর্নীতি স্বেচ্ছাচার আর অত্যাচারের মূলে কুঠারাঘাত করে। প্রতিবাদী মানুষ চার্চ ও ধর্মান্ধতার বন্ধন ছিন্ন ক'রে একক ব্যক্তিরূপে ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে "আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের এই একাকীত্ব" প্রতিযোগী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের একাকীত্ব থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন ছিল না।[১৫] একক ব্যক্তি যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সন্ধান করে তখন এই প্রক্রিয়া— ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথেও পাথেয় হয়ে ওঠে। ব্যক্তিমানুষ তখন সাম্প্রদায়িক বা 'গোষ্ঠী-মানসিকতা'র বন্ধন ছিন্ন ক'রে নতুন জীবনবোধের সন্ধান পায়। এই নবচেতনার ফলে একক মানুষ ট্র্যাডিশন-আশ্রয়ী ধর্মান্ধতার সনাতন পথ পরিত্যাগ ক'রে পরিপূর্ণ আধুনিক মানুষ হয়ে ওঠে।[১৬] প্রকৃত অর্থেই প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত নবীন বুর্জোয়া যুগের উপযুক্ত ধর্ম হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি বলিষ্ঠ নাস্তিক্যবাদেরও উন্মেষ হয়। যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রতীচ্যের মানবসমাজে এক "অত্যাশ্চর্য বুদ্ধিবিপ্লব" ঘটে। অজ্ঞানতা আর অন্ধতার অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জ্বল যুক্তির উদ্ভব হয়। বেকন (১৫৬১-১৬২৬)— অনুসন্ধান

ও পরীক্ষার দ্বারা সত্যানুসন্ধানের নতুন পথ দেখান। লক (১৬৩২-১৭০৪) ঘোষণা করেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মানস-প্রত্যক্ষ বিষয় ছাড়া আর কোনো কিছু জানবার উপায় নেই।

আটের শতকে বেকন ও লক প্রদর্শিত মুক্তচিন্তা কয়েকজন মনীষী— ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ফরাসী যুক্তিবাদীরা যুক্তিবাদের পথের অভিযাত্রী হন। তাঁরা রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের ভণ্ডামী আর বিবিধ অপকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। এঁরা ছিলেন নাস্তিক, জড়বাদী, সংশয়বাদী (Scepticism) ইত্যাদি। ঈশ্বর, আত্মার অবিনশ্বরতা এবং পাপ-পূণ্য ও পরলোকে তার বিচার ও শাস্তি বা পুরস্কারের সুপ্রাচীন বিশ্বাসের অচলায়তনে এঁরা আঘাত হানেন। ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) ছিলেন সংশয়বাদের প্রবক্তা, অলৌকিক ক্রিয়ায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রণালীতে তিনি ধর্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে হিউম— যাজকদের চাতুরী ব'লে বিশ্বাস করতেন। "প্রায় দুই শতাব্দী ধ'রে পাশ্চাত্যের সমাজে এই বৈপ্লবিক চিন্তালোড়ন চলতে থাকে।"[১৭]

নবচেতনার এই প্লাবনে ভেসে যায়, হারিয়ে যায় পুরোনো মূল্যবোধ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উল্লাসে পরাভূত হয় ভ্রান্তবিশ্বাস, গতির কাছে হার মানে জড়তা আর স্থবিরতা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলে দুঃসাহসিক অভিযান; শুরু হয় ব্যক্তিমানুষের জয়যাত্রা। জীর্ণ হয়ে যাওয়া ধর্মবিশ্বাসের নিগড় ভেঙে ব্যক্তিমানুষ নতুন এক 'ধর্মের' সন্ধান পায়। সময়, পরিশ্রম, অর্থ, বস্তু, দূরান্তে উপনিবেশ স্থাপন— এ সবই হয়ে ওঠে জীবন যাপনে আরাধ্য। পরজগতে সুখ-শান্তির আকুতি মলিন হয়ে যায় ইহজগতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুকঠিন সংগ্রামে! স্বর্গের বাসনা নয়, পৃথিবী হয়ে ওঠে বরণীয়, আদরণীয়। কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) ও রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) দর্শন মানবজীবনে অতিপ্রাকৃত কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২)-এর 'উপযোগিতাবাদ' সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। হলব্যাখ (১৭২৩-১৭৮৯) প্রচার করেন বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা। শুরু হয় অতিবৃদ্ধ ঈশ্বর আর মূঢ় অত্যাচারী ধর্মধ্বজাধারী যাজককুলের নির্বাসনের পালা।

নবীন বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তাদের মুখপাত্র স্বাধীন বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামে রত হন। যুগ সৃষ্টিকারী শিল্পবিপ্লব, গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও আধুনিক নগরের বিস্তার সেকুলারাইজেশন-এর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। বস্তুজগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন— রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন— সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটায়। যুগারম্ভে এক নতুন বিশ্ববীক্ষার জন্ম নেয়— 'সেকুলারিজম"। যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, 'নেগেটিভলী রিলিজিয়াস' অর্থাৎ ধর্ম বা ধর্মান্ধতার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। এই নতুন বিশ্ববীক্ষার ফলস্বরূপ নবজীবনধারা ধর্মনির্দেশিত পথ পরিত্যাগ করে। এই মতবাদের উত্থানের ফলে ধর্ম আর রাজনীতির মধ্যে গ'ড়ে ওঠে এক 'অলঙ্ঘ্যনীয় প্রাচীর!' পুরাতন মতাদর্শ আর প্রগতির সঙ্ঘাতে 'সেকুলারাইজেশন'-এর প্রক্রিয়া গতিলাভ করে; এর ফলে ধর্মীয় চিন্তা ধর্মাচরণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক গুরুত্ব লোপ পায় বা হ্রাস পায়। সমাজবিজ্ঞানী প্র্যাট লিখেছেন, তিনশো বছর আগে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে কোনো দ্বিমত ছিল না। আজ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বহু মানুষ অবিশ্বাসী, অনেকে সন্দিহান, আর অনেকে মনে করেন এ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করাটাই অর্থহীন।[১৮] অপর এক সমাজবিজ্ঞানীর মতে 'সেকুলারিজম' [এর মতবাদ] ধর্মীয় বা অতি-প্রাকৃতিক [বন্ধন থেকে] মুক্ত। এই মতবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব

আত্মার অবিনশ্বরতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিতর্ক চালাবার অধিকার দেয়। এই মতবাদ এমন এক বস্তুজগতের সন্ধান করবে যেখানে মানুষ দরিদ্র নয়, নয় বঞ্চিত![১৯] আধুনিক যুগে ভাগ্যবিধাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে, পরজগৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু মানসভূমি সেকুলারিজম-এর অবদান। আবুল ফজল লিখেছেন, ''ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর তাবৎ পৃথিবীর মালিক— এ সব সামাজিক দিক থেকে স্রেফ হাওয়ায় বেলুন ওড়ানো। এর কোনো সামাজিক মূল্যই নেই। এতে কোনো সামাজিক তথা মানবীয় সমস্যারই সমাধান হয় না। এ সব ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের অঙ্গ হ'তে পারে। কিন্তু কোনো বিশ্বাসই [অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস] সামাজিক শান্তি বা শৃঙ্খলা আনতে সক্ষম নয়।''[২০]

অতিবৃদ্ধ ঈশ্বরের নির্বাসনের পালা মধ্যযুগের অবসান ঘটায়।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, সেকুলারিজম প্রাগ্রসর আধুনিকতার অন্তরঙ্গ সঙ্গী। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, ''বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে ধর্ম হোঁচট খাচ্ছে পদে পদে। কোনো ধর্মের এমন শক্তি নেই যে আজ ডারউইনের বিবর্তনবাদ বাতিল ক'রে দেয়, নাকচ ক'রে দেয় মর্গানের সমাজতত্ত্ব, এবং ভ্রান্ত ব'লে প্রমাণিত করে কোপার্নিকাস-গ্যালিলিওর আকাশ তত্ত্ব, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে।''[২১]

আমরা আগেই বলেছি, সমাজবিজ্ঞানীদের মতে সেকুলারিজম— প্রাগ্রসর আধুনিকতার অন্তরঙ্গ সঙ্গী। যখন যুবক প্রধানমন্ত্রী কোনো এক 'মাচান বাবা'র শ্রীপদে মস্তক ঠেকান অথবা রাষ্ট্রপতির পদলাভ করার পর এক 'প্লুরাল সোসাইটি'র প্রথম নাগরিক— ধর্মস্থানে গিয়ে মস্তক মুণ্ডন ক'রে আসেন তখন মনে হয় আমাদের দেশের হর্তাকর্তাদের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে মধ্যযুগের ভাবাদর্শ দোর্দণ্ডপ্রতাপে বিরাজ করছে; এর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারের কৌশল তো আছেই! এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য, ''রাজনীতিবিদের মুখে এখন ধর্মের যত বুলি শোনা যায়, স্বয়ং ধর্মপ্রবর্তকদের মুখেও কোনোদিন তত ধর্ম-বুলি শোনা যায়নি।''[২২] এ তো ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদান! ইংরেজ তার সাম্রাজ্য গড়ার জন্য, অটুট রাখার জন্য এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়। এ কারণে আজও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুধার্ত, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভোটাব নামক প্রাণীরা ধর্ম-রাজনীতিবিদের প্রতারণার শিকার হন। এই হতভাগ্য উপমহাদেশে 'আধুনিকতার' সূচনা ''ক্লাইভের খঞ্জর'' ''বাঙালির খুনে লাল'' হবার সৌজন্যে! তাই বর্তমানের বহু-বিজ্ঞাপিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে মধ্যযুগের অবসান হয়নি; ''পর দীপমালা নগরে নগরে/তুমি যে তিমিসা তুমি সে তিমিরে!'' নগরে নগরে আজ আধুনিকতম বিলাস-ব্যসন-ব্যভিচারে নিমজ্জিত ঈশ্বর-ভাগ্য-পরকাল-বিশ্বাসী ক্ষমতালোভী মানুষের দল; অন্নহীন ভারতবর্ষ পুঞ্জিভূত তমসায় ভারাক্রান্ত, অনাহার আর ঈশ্বর-বিশ্বাস তার নিত্যসঙ্গী! এ দেশে ''কী দিবে তোমারে ধর্ম!''

ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা ''লুটের স্বরাজ'' খুঁজে পায় ধর্মান্ধ ভারতে। স্থিতাবস্থা এদের স্বার্থ সাধন করে। এ কারণে এরা প্রকৃত সেকুলার রাজনীতি বা ধর্মহীন রাজনীতি সভয়ে এড়িয়ে চলে। সংবিধানে বিধৃত মহান ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয় অবলীলায়, পঁচিশটি মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা করেন 'দেশভক্তের দল', আর মানুষকে বোঝানো হয় বিধর্মীর উপাসনালয়ে জন্ম নিয়েছিলেন অবতার।

এ দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতি— টেলিভিশন, রেডিও, সিনেমা, তথা যাবতীয় প্রচারমাধ্যম-মারফৎ নিত্য আমাদের শাসন করে, এই সংস্কৃতি মূলত ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতি। হিন্দু-ধর্মাশ্রয়ী-সংস্কৃতি আর ইসলাম-আশ্রয়ী-সংস্কৃতি দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। ধর্মের এই অচলায়তন বৈশ্য সম্রাটের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ধর্ম— ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্ধতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। 'বিপরীত জগৎ চেতনায়' মোহাচ্ছন্ন মানুষ আবহমান কালের বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থাকে বৈধ ও ঈশ্বর-নির্দেশিত ব'লেই মনে করে। পরকালের মোহে ইহলোকের অবিচার নীরবে মেনে নেয়; সামান্য ইন্ধনেই ভ্রাতৃঘাতী সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়।

ধর্মান্ধ এই দেশে— ধর্মাশ্রয়ী-সংস্কৃতির বিপরীতে— ধর্মহীন সেকুলার সংস্কৃতির বিকাশ প্রসার ও প্রচার আশু কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি-পাওড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক— প্রত্যক্ষ ভগবান দয়া প্রেমের পুজো দেশে হোক।" "তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পুজো হে বাপু!" আমাদের দেশে এই "কাল্পনিক ঈশ্বরের" নির্বাসনের জন্য আমরা তাঁর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে পারি, "আমি তোমাদের কুসংস্কারগ্রস্ত নির্বোধের চেয়ে ঘোর নাস্তিকরূপে বরং দেখতে চাই। কারণ নাস্তিকরা প্রাণবন্ত, মৃত নয়, তাদের দিয়ে কিছু করা যেতে পারে।"

আমরা আগেই বলেছি আমাদের দেশে ধর্মহীনতার বীজ প্রোথিত হয় চার্বাক দর্শনে, মধ্যযুগ উদ্ভাসিত শাস্ত্রবিরোধী মানবধর্মের উদাত্ত প্রচারে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ-রাজমুকুটের শাসন কায়েম হবার পর উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'র নাস্তিক সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত প্রচার করেন, "পরিশ্রমেই ফসল পাওয়া যায়, ঈশ্বর উপাসনার ফল শূন্য।"

উনিশ শতকের 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'ডিরোজিয়ান'রা ছিলেন ঘোরতর নাস্তিক। এঁদের অনেকেই— জাতপাতের ধারণা, পূজার্চনা, বা অন্য আচার অনুষ্ঠান-এ বিশ্বাস ত্যাগ করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, "ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্তে হোমারের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশসকল আবৃত্তি করিত।" "....অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমান্তে যাইত; তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য 'আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো' বলিয়া চিৎকার করিত.... কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনের ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীগণকে ডাকিয়া বলিত, 'এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি....' ইত্যাদি।"[২৩]

সেকালের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন নাস্তিক। তিনি ছিলেন প্রথম আমলের দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তিনি বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন না। আরও পরে অক্ষয় কুমার "প্রার্থনাদির প্রয়োজন স্বীকার করতেন না এবং শেষ-বয়সে অনেকটা অজ্ঞাবাদী হয়ে পড়েন।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) উদ্ভুত শিক্ষিত-বাবুসম্প্রদায় এঁদের সজোরে প্রত্যাখ্যান করেন। তাই পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেনের ভণ্ডামী[২৪] আর রামকৃষ্ণের ভক্তিবাদ বাঙালি হিন্দুকে

গভীরভাবে প্রভাবিত করে। নবহিন্দুবাদের জোয়ারে বঙ্গসমাজ প্লাবিত হয়ে যায়; অক্ষয় কুমারের শিক্ষা বিনষ্ট হয়।

শোনা যায়— বাঙলার নয়নের মণি ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন সংশয়বাদী। বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন নাস্তিক, মার্ক্সবাদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। ফাঁসির আসামী কানাইলাল দত্ত 'পবিত্র' গীতা পুকুরের জলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আর ভগৎ সিং— যাঁর সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা ছিল গান্ধীজীর জনপ্রিয়তার সমতুল্য, তিনিও মার্ক্সবাদে প্রভাবিত হয়েছিলেন, নাস্তিকতায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনায়।

আমাদের বক্তব্য হোলো, সেকুলারিজম, অর্থাৎ ধর্মহীনতা প্রচার করার ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য পাওয়া যেতে পারে আমাদের মাতৃভূমির ইতিহাস থেকেই। কারণ প্রকৃত সেকুলারিজম বস্তুত নাস্তিকতার সমীপবর্তী। মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর অনুগামীরা সেকুলারিজমকে শ্রেণী-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চাননি বা পারেননি। এ কারণে রায়ের প্রভাব মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত মানুষের এক ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।" আবুল ফজলের ভাষায় বলি "....মুসলমান খাঁটি মুসলমান আর হিন্দু খাঁটি হিন্দু হ'লেই মিলন সহজ হবে— একথা আমার কাছে সোনার পাথরবাটি; বরং মানুষ যখন এবং যেখানে প্রচলিত মুসলমানত্ব ও হিন্দুয়ানীকে ছাড়িয়ে গেছে সেখানে মিলন সহজ ও অবাধ হয়েছে।" এই শিক্ষা বাঙালিকে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথই।

উপসংহারে আমরা বলি, উষালগ্নের আবাহনে ধর্মহীন বিশ্ববীক্ষা হোক আমাদের ধ্রুব!

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!
ভেদি দৈত্য কারা
আয় সর্বহারা!
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১। Quoted in Atulananda Chakrabarti : The Recovery of India. Calcutta 1972. p. 87.

২। রামভক্ত মহাত্মাজীর এমত মনোভঙ্গি আমরা অন্যত্র উল্লেখ করেছি; মহাকাব্যের রামচন্দ্র কিন্তু শূদ্র ও চণ্ডাল উনমানব গুহক চণ্ডালের কাছে ফলমূল গ্রহণ করেননি; ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র মুনি-ঋষিদের আতিথ্য গ্রহণ করতেন।
সুকুমারী ভট্টাচার্য; রামায়ণ ও মহাভারত : আনুপাতিক জনপ্রিয়তা, কোলকাতা ১৯৯৬; পৃ. ১৪

৩। Vide Atulananda Chakrabarti. Op. cit. p. 105.

৪। পরাধীন ভারতে গান্ধীজীর কোষাগার আর স্বাধীন ভারতে ধনপতি-চূড়ামনি শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা মহাশয় এবং তাঁর পুত্র-পৌত্রাদি কীভাবে ধর্মান্ধতা তথা সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে থাকেন, তার এক নজীর উপস্থাপিত করা যায়, "শুধু সুখসম্পদের পিছনে ছুটলে চলবে না....। কোলকাতার বালীগঞ্জে 'ঘনশ্যাম দাস বিড়লা সভাগর'-এর

উদ্বোধনের সময় জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী এই অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নানা ভাষা নানা মত থাকা সত্ত্বেও ধর্মের সূত্রই ভারতবাসীদের ঐক্যডোরে বেঁধে রেখেছে। ধর্মের সংরক্ষণে বিড়লা পরিবার ও ঘনশ্যাম দাসের সহায়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩.১২.১৯৮৪

এই শঙ্করাচার্যরাই 'সতী মাহাত্ম্যের' নামে জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মারার সমর্থনে বাণী দেন; মহিলাদের বেদস্পর্শে প্রবল আপত্তি জানান; অথবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনা-গৃহে অবতার-পত্নীর হেঁসেল আবিষ্কার ক'রে 'পুজো' করা ইট-পাটকেল বহন ক'রে মূঢ় ধর্মান্ধ মানুষের মননে সাম্প্রদায়িক চিন্তায় উস্কানি দেন; আর সদর্পে ঘোষণা করেন— "প্রধানমন্ত্রী আমাকে ভয় পান, আমি তাঁকে ডরাই না।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫.৪.১৯৯৪

একথা সুবিদিত যে ঘনশ্যাম দাসজী হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন আর.এস.এস.-এর সঙ্গে প্রীতিডোরে বাঁধা ছিলেন।

মহান ভারতে, ক্ষুধার্ত ভারতে ঐশ্বর্যের চূড়ায় অধিষ্ঠান করলেও ঘনশ্যাম দাসজী নিজেকে 'যোগী' রূপে প্রচার করতেন। Organiser, Vol. X X X IV. No. 27, 21-27, November 1942

'যোগী'র বিরুদ্ধে মজুর খ্যাপাবেন কে?

এই "যোগী" ভবলীলা সাঙ্গ করার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক মার্ক্সবাদী সদস্য বিড়লাজীকে 'দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শিল্পপতি' রূপে বর্ণনা করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভস্মাধারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

ডালমিয়া সাম্রাজ্যের বড় শরিক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুহরি ডালমিয়া মহাশয় 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'-এর সভাপতি। তিনি মসজিদ ভেঙে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চান।

অপর এক পুঁজিপতি মোদি-গোষ্ঠী তাঁদের বাৎসরিক লাভের পাঁচ থেকে দশ শতাংশ অর্থ ধর্মের সেবায় ব্যয় করেন।

Samita Bhatia. 'Religious Capital', The Telegraph Magazine, 8.5.1994

৫। সেকুলারাইজেশন-এর ফলে সমাজ রাজনীতি ও রাষ্ট্র ধর্মহীন হয়ে উঠতে পারে। আমাদের ধারণা— আদর্শ সেকুলার বা ধর্মহীন রাষ্ট্র বাস্তবে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শিল্পবিপ্লব-উত্তর ধনতান্ত্রিক ইংল্যাণ্ডের (তথা য়ুরোপের) সমাজ বহুলাংশে ধর্মহীন হ'লেও রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের নিকট-সম্পর্ক রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ভারত-পাকিস্তান-বাঙলাদেশের সমাজ থেকে অনেক অনেক বেশি সেকুলার বা ধর্মহীন, কিন্তু সেখানেও টাকার ওপর লেখা থাকে "আমরা ঈশ্বর বিশ্বাস করি।"

আমাদের দেশের হিন্দুদের মধ্যে জাতিপ্রথা বা 'কাস্ট সিস্টেম'— সমাজ রাজনীতি ও রাষ্ট্রকে সেকুলারাইজ করার ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। নগরায়নের ফলে জাতপাতের ধারণায় ভাঙনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ব'লে কেউ কেউ দাবি করেন; কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য-সন্তান পাদুকাবিপণি খুলে বসলেও বিবাহের সময় স্বজাতি-কন্যারই পাণিগ্রহণ করেন।

কলকারখানায়-অফিসে উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণের মানুষ হয়তো একই ক্যাণ্টিন থেকে একই কাপ-ডিশে চা বা খাবার খান; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরাই আবার উচ্চবর্ণের অহমিকা

আর কুসংস্কারের পরিচয় দিয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ শ্রমিকও উপবীতর অভিমান বজায় রাখেন। আর হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক দূরত্ব আজও যোজন-বিস্তৃত এবং তা স্পষ্ট, নগ্ন। এ কারণে আজও শহর মফস্বলের 'হিন্দু হোটেলে' মুসলমান প্রবেশ করেন না বললেই চলে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত পুস্তকে আবদুর রউফ লিখেছেন আজও বর্ণহিন্দু-বাঙালি "জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বহন ক'রে চলেছেন মজ্জাগত মুসলিম-অবজ্ঞার সংস্কার.... এই মনোভাবের প্রকাশ প্রায়শ এতই সূক্ষ্ম যে সব-সময় তাকে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যেখানে যা হবার ঠিকই হয়। এইভাবে আর যা-ই হোক, সম্মিলিত বাঙালিসত্তার স্ফূরণ কখনই হ'তে পারে না।" হিন্দুদের মধ্যে এই মনোভাব আজ বর্দ্ধমান, একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

আমাদের দেশে ধর্মীয় আইডেনটিটিকে বিনষ্ট ক'রেই শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হ'তে পারে— কারণ উভয় উভয়ের পরিপূরক, ধর্মান্ধতা— স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবন্ধক।

৬। গৌতম রায়; মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সাজানো লড়াই; আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.৪.১৯৯০

৭। Dilip Hiro. Inside India Today. London 1976. p. 238
মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের এমত উপদেশের কারণ তাঁরা মুসলমান-ধর্মান্ধতার তোয়াজ করার চেষ্টা চালালেও আক্রমণাত্মক হিন্দু-ধর্মান্ধতার অচলায়তনে সামান্য আঘাতও করতে চান না; তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু-দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

৮। এ. কে. রায়; 'ঈশ্বরের রাজনীতি'; আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩.১.১৯৮৮

৯। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০.৪.২০০২

১০। উপরোক্ত

১১। উপরোক্ত

১২। 'মীযান', ২৩.৫.১৯৮২

১৩। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম; ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা; ঢাকা ১৯৭৬; পৃ. ১০৬-১০৭

১৪। মার্ক্সীয় সমাজবিজ্ঞান অনুসারে 'বিপরীত জগৎ চেতনা'র অর্থ— "এক নির্দিষ্ট সমাজ-চেতনা যা জনগণের মনে পার্থিব শক্তিগুলি, যা তাদের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে, এক অপার্থিব, অবাস্তব শক্তি, অর্থাৎ ভাগ্যনিয়ন্তা অদৃষ্ট ঈশ্বর রূপে প্রতীয়মান হয়।" Dictionary of Philosophy Moscow 1967 p. 357

১৫। Enich Fromm. The Fear of Freedom. London 1960. pp. 93-94

১৬। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শাসন-শোষণের সঙ্গে ধর্মান্ধতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এ কারণে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই রাজনৈতিকবোধে-উদ্বুদ্ধ মানুষ ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেন।
স্পেনের গৃহযুদ্ধের (১৯৩৬) পূর্বাহ্নে বিক্ষুব্ধ শোষিত জনতা দুশোটি গীর্জা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেন পাদ্রীতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য।
"প্রাচ্যের দুঃখী 'মহাদেশ' চীনেও বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগে.. লুঙফেঙ মহিলা আশ্রমে কৃষকরা ও ইস্কুল-শিক্ষকরা মাংস রান্নার জন্য কাঠের দেবমূর্তিগুলো টুকরো টুকরো ক'রে জ্বালানী ক'রে নিয়েছিল.... তুঙফুঙ মন্দিরে তিরিশটির বেশি দেবমূর্তি— ছাত্র ও কৃষকেরা মিলে পুড়িয়ে দিয়েছিল।"

মাও সে তুঙ; নির্বাচিত রচনাবলী; কোলকাতা ১৯৭০ (প্রথম খণ্ড); পৃ. ৫২
এশিয়া-ইউরোপের অপর এক দেশ তুরস্কে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে মুস্তাফা কামাল মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে 'খলিফাতন্ত্র' উচ্ছেদ করা হয়। ১৯২৬ সালে 'শরিয়াত' বা 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' নির্বাসনে যায় এবং আধুনিক তুরস্ক সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী ও জার্মানী প্রভৃতি দেশের অনুসরণে সেকুলার আইনকানুন প্রণয়ন করে।

১৭। বিনয় ঘোষ; বিদ্রোহী ডিরোজিও; কোলকাতা ১৯৮০; পৃ. ৯০

১৮। Vernon Prat. Religion and Secularaisation. London 1970. p. 11.

১৯। The Encyclopaedia Americana. New York Volume XXIV. 1959. p. 52.

২০। আবুল ফজল; 'মানবতন্ত্র'; অরুণ সেন ঃ আবুল হাসনাত (সম্পাদনা); বাঙালি ও বাঙলাদেশ; কোলকাতা ১৯৯৯; পৃ. ৩৯

২১। আরজ আলী মাতুব্বর; 'আমার পরিচয়'; উপরোক্ত পৃ. ৩১

২২। আবুল ফজল; পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৪

২৩। শিবনাথ শাস্ত্রী; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ; কোলকাতা ১৯৮৩; পৃ. ১০২

২৪। বিনয় ঘোষ; বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা; কোলকাতা ১৯৬৮; পৃ. ৩০৫

[অনীক. জুলাই ১৯৯৪]

যুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায়

রবীন্দ্রযুগের অন্যতম প্রতিভা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন— ভারতবর্ষে মুসলমানের আগমনের পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষ এই বহিরাগতদের 'জননী স্বরূপা' হয়ে উঠেছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই এক জননীর কোলে ভারতবর্ষের উর্বর মাটিতে— সংঘর্ষের পথে নয়, বিরোধের পথে নয়, সমন্বয়ের মহাসাগর অভিমুখে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণী প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ভারত বিজয় পদদলিতদের ও দরিদ্রদের মুক্তির কারণ হয়েছিল। আর এজন্যই আমাদের দেশের বিশেষত বাংলার এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন; "কেবল তরবারি ও অগ্নির দ্বারা এ কাজ হয়েছিল মনে করা নিছক পাগলামী।"[১]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মুসলমানের আমলে হিন্দুসমাজের যে কোনো ক্ষতি হয় নাই, তাহার কারণ, সে আমলে ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাহিরের দিকে টানা না পড়াতে আমাদের অন্নের স্বচ্ছলতা ছিল.... ধনকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলে জনসাধারণের মনে যে হীনতা আসে, আমাদের দেশে তাহা ছিল না।"[২] কার্ল মার্ক্স দেখিয়েছেন— ইংরেজপূর্ব শাসকরা অচিরেই 'হিন্দুভূত' অর্থাৎ 'হিন্দুস্তানী' তথা ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন।[৩]

ডঃ তারাচাঁদ লিখেছেন, "বহিরাগত মুসলমানরা ভারতেই তাঁদের বাস্তুভিটা গ'ড়ে তোলেন.... মুসলিম-বিজয়ের প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নেবার পর ভারতের সমাজে আদানপ্রদান-মারফৎ প্রতিবেশী রূপে দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কই গ'ড়ে ওঠে।"[৪]

ভারত-আক্রমণকারী এই 'হিন্দু বিদ্বেষীদের' 'হিন্দু ভূত' হবার সামাজিক প্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিক-সমাজবিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "মোগল-পাঠান প্রভৃতি মুসলমান-বিজেতার ঋণকে আমি বিজেতার জরিমানা হিসাবে দেখতে পারি না। সে ঋণকে আমি তাজমহল, ফতেপুরসিক্রী, মিএগ-কি-মল্লারের দিক থেকেই দেখি.... একত্র বসবাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমান একটি নিখিল ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ভারতবর্ষেরই জমি চাষ ক'রে; হিন্দুস্তানের ভাষাকে অদলবদল ক'রে; পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা, রান্নাবান্না ও অন্যান্য নানা রকমের মানসিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত সংস্কারকে উলটেপালটে; অন্য সমাজের প্রপীড়িত মানুষদের বুকে টেনে নিয়ে— পাঁচ-সাতশো বছরকার পূর্বের বিজেতার দল ভারতবর্ষের অন্যান্য অধিবাসীদেরই মতন ভারতবাসী ব'লে গণ্য হবার অধিকার অর্জন করেছেন।"[৫]

উপরের আলোচনা থেকে একথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা যায় যে, মুসলিম শাসকরা ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-প্রজার ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করার মতো নির্বোধ ছিলেন না। মুসলিম শাসনের আমলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও শাসকরা রাজনীতিকে ধর্মের অধীন করেননি, ধর্মকে রাষ্ট্র রাজনীতির অধীনে রেখেছিলেন।[৬]

মধ্যযুগে সমন্বয় সাধনার এই ছিল অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর নির্ভর ক'রেই হিন্দু-মুসলিমের ধর্মাশ্রয়ী বিশ্বাস-সংস্কৃতি-চিন্তা-চেতনার সমন্বয় সাধনা সম্ভব হয়। সে যুগে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র আর মোল্লা-মৌলবীতন্ত্র যখন পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত[৭] তখনই সাধারণ হিন্দু-মুসলিম— লোকবৃত্তের আধারে দেবতাকে প্রিয়, প্রিয়কে দেবতা করেছেন; খনন করেছেন মানবধর্মের এক দুর্বার ধারা; আর এর ফলে আমরা পেয়েছি এক বিপুল ঐশ্বর্য— কিন্তু রাজনীতির ঝড়ঝাপটায় আমরা তা বিস্মৃত হয়েছি।

রাজনীতির কথা থাক্; আমরা বরং অন্ত্যজ সাধকের কথা ভাবি। ঘরছাড়া লোককবির একতারার কথা ভাবি। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির ধারায় সমগ্র ভারতের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলাও তার আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গঙ্গা-পদ্মার বাংলা শাস্ত্রপন্থী নয়, মানবপন্থী। এ কারণে বাংলার সমন্বয়— আবেগের সমন্বয়, হৃদয়ের ঐক্য।

মধ্যযুগের বাংলায় গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র আর জাতিভেদপ্রথার অত্যাচার অনাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্যই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলামের মূল দর্শন অর্থাৎ নিরাকার একেশ্বরবাদের থেকে সামাজিক আদর্শ অর্থাৎ সামাজিক সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট[৮] তথা দীক্ষিত হন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। বাংলায় বা ভারতের অন্যত্র নিচু জাতির হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণ— ভারতে কোরাণের বাণী প্রচারিত হয় সুফী সাধকদের প্রচার মারফৎ।[৯] এঁরা ধর্মান্ধদের মতো নয়— এঁদের সহজ সরল বাণী ছিল পরমেশ্বরের সঙ্গে একমাত্র তাঁর প্রতি প্রেম মারফৎই মিলন সম্ভব। এই বার্তাই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আপ্লুত করে। এ কারণে দু'টি ধর্মের গোঁড়া ধর্মান্ধদের প্রভাবের বাইরে এক সমন্বয়বাদী লোকধর্ম গঙ্গা-পদ্মার নিচুতলার মানুষদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অসংখ্য লোকধর্মমত পলিমাটির গন্ধ মাখা স্নিগ্ধ বাতাসের দেশে জন্মলাভ করে— যেমন বাউল, কর্তাভজা, সাহেবধনি, খুশি বিশ্বাসী, জিকির প্রভৃতি।[১০] বাংলার মাটিতে লোকপ্রিয় ইসলামের রূপ ছিল পীর অথবা 'পুণ্যবান' ধর্মগুরুদের প্রতি ভক্তি ও পূজা আরাধনা। বাঙালি হিন্দুর কাছে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক দীর্ঘদিনের প্রিয় বিষয় ছিল, আছে; বাংলার মুসলমান তাই হিন্দুর প্রিয় গুরু-চেলা বা গুরু-শিষ্য সম্পর্কের ইসলামী প্রতিরূপ গ'ড়ে তোলেন 'পীর-মুরিদি'। কোরাণের বাণী বাঙালির কাছে ছিল অপরিচিত। ছয় বছরের পরিশ্রমে (১৮৮১-১৮৮৬) সর্বধর্মসমন্বয়ে বিশ্বাসী মৌলবী গিরিশচন্দ্র সেন প্রথম সটীক 'কোরাণ-শরিফ'-এর বঙ্গানুবাদ করেন। এর আগে বাংলার মানুষের কাছে কোরাণ-শরিফের বাণী দূরধিগম্য ছিল। প্রচলিত লোকায়ত হিন্দুধর্মের প্রভাব, ইসলাম সম্পর্কে সম্যক্ ধারণার অভাব, অসম্পূর্ণ ধর্মান্তর ইত্যাদি কারণে বাংলার ইসলাম এক বিচিত্র রূপ ধারণ করে। বহু দেববাদী পীরদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস, পীরের আস্তানায় মানত, পীরের মূর্তিধ্যান, পীরের কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, পীরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত খাদ্যদ্রব্যকে প্রসাদ রূপে গ্রহণ, এইসব আচার ইসলাম-বিরোধী। কিন্তু এ-সবই ছিল বাংলা তথা ভারতের মুসলমানদের প্রচলিত ধর্মমত।[১০] আনিসুজ্জমান লিখেছেন— "পীরের মাজাবে অনুষ্ঠিত উরস শরীফে বিংশ শতাব্দীতেও হজরত মুহম্মদের (দঃ) শ্মশ্রু, পোশাক ও 'কদম শরীফ' (অর্থাৎ পাথরের উপর তাঁর পায়ের ছাপ— যার সঙ্গে বিষ্ণুপদ প্রদর্শনের তুলনা সহজেই মনে পড়ে) প্রদর্শিত

হ'তে দেখা গিয়েছে।[১১] (বর্তমান লেখকও বাল্যকালে মালদা জেলার গৌড়ে 'কদম রসুল' অর্থাৎ প্রফেটের পায়ের ছাপ দেখেছেন। আবার মাইল দুয়েক দূরে 'রামকেলি' জনপদে শ্রীচৈতন্যের পায়ের ছাপও দেখেছেন। হায় আজ কেন মসজিদ ভাঙা হয়!)।

এইভাবেই মধ্যযুগের বাংলায় লোকায়ত-হিন্দুত্ব আর লোকায়ত-ইসলামের যুক্তবেণী দুর্বার গতিতে মানব মিলনের মহাসাগর অভিমুখে ছুটে চলে। ধর্মান্ধ মোল্লারা লোকায়ত-ইসলামকে 'বেশারা' বা শাস্ত্রবিরোধী আখ্যা দেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত রক্তচক্ষু হিন্দুসমাজ কর্তাদের এঁদের প্রতি জ'মে থাকা ঘৃণা আর ক্রোধ বিপুল পরিমাণে প্রকাশিত হয়। কিন্তু লোকবৃত্তের আধারে ভাব সমন্বয়ের ধারা এগিয়ে চলে। এই মানবধর্মের ভাবগত রূপটিকে সম্যক অনুধাবন করার জন্য আমরা কয়েকটি গানের উল্লেখ করবো— যদিও বহু পাঠকের কাছে এগুলি পরিচিতি!—

শেখ মদন বাউল তাঁর একটি সুপ্রসিদ্ধ গানে সম্প্রদায়ধর্মকে মানবধর্মের অন্তরায় ব'লে গণ্য করেছেন—

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।
তোর দুয়ারেই— নানান তালা
পুরাণ কোরাণ তসবি মালা,
ভেদ পথই তো প্রধান জ্বালা,
কাইন্দ্যা মদন মরে খেদে।[১২]

কানাই নামের এক বাউল জানেন সম্প্রদায় আর ধর্মের পথ এক নয় এবং এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীকে প্রীতির চোখে দেখেন না। তাই কানাই গেয়ে ওঠেন—

এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়।
সকলেরই এক রক্ত ঘরে আশ্রয়।
মালা পৈতা একজন ধরে,
কেউ-বা সুন্নত করে।
তবে ভায়ে ভায়ে মারামারি ক'রে
যাচ্ছিস কেন সব গোল্লায়।[১৩]

বিনয় ঘোষ আরও অসংখ্য সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, যেমন 'পাগলনাথী', গোবরা সম্প্রদায়, বাবা আউলের সম্প্রদায়, রামবল্লভী সম্প্রদায় ইত্যাদি। "বর্ণ জাতি,.... সম্প্রদায় কোনো কিছুই এঁরা মানেন না, এঁরা আজও গান গেয়ে বেড়ান—

কালী কৃষ্ণ গড খোদা
কোন নামে নাহি বাধা,
বাদীর বিবাদ দ্বিধা

তাতে নাহি টল,
মন, কালী কৃষ্ণ গড খোদা বল রে!
মগে বলে কারা তারা
গড বলে ফিরিঙ্গী যারা
খোদা ব'লে ডাকে তোমায়
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।[১৪]

বাউল চূড়ামণি লালন লেখেন—.
সব লোক কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কি রূপ দেখলাম না
এ নজরে॥....
কেউ মালা কেউ তসবি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।[১৫]

বাউলশ্রেষ্ঠ লালন ফকিরের অপর একটি গানে মানবধর্মের উদ্ভাস লক্ষ করা যায়—
ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন ব'লে
তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই।[১৬]

সমন্বয়সাধনের ধারায় আর এক দীপ্ত দৃষ্টান্ত এক নাম না জানা কবির একটি গান—
এক কৃষ্ণ জগৎময়
কৃষ্ণ বিনা গতি নাই
যেমন মহম্মদকে পৃথিবীতে
পাঠিয়েছেন দয়াময়![১৭]

মধ্যযুগের বাংলায় হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতি আর ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্যে। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে দক্ষিণ রায় আর বড় খাঁ গাজীর মধ্যে যখন তুমুল লড়াই চলছে— ঈশ্বর তখন কোরাণ আর পুরাণ হাতে অর্ধ শ্রীকৃষ্ণ আর অর্ধ পয়গম্বর বেশে এসে রণ-রত দু'জনের মধ্যে সখ্যভাব সৃষ্টি ক'রে তাঁদের মধ্যে রাজত্ব ভাগ ক'রে দিলেন।[১৮] 'রায়মঙ্গল' কাব্য থেকে কবি-কল্পনার সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—
অর্ধেক মাথায় কালা
এক ভাগ চূড়া টালা

বনমালা ছিলম্বিনী তাতে
ধবল অর্ধেক কায়
অর্ধ নীল মেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে।

হিন্দু-মুসলিমের যুক্ত সাধনার এত উজ্জ্বল অধ্যায় থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তা ব্যাহত হয় ব্রিটিশের ভেদনীতি আর তজ্জনিত স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কূটতর্কে। ভারতবর্ষে ইংরেজ তার অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা কায়েম করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সুপ্রাচীন গ্রামসমাজগুলির (চার্লস মেটকাফ যাকে বলেছিলেন 'লিটল রিপাবলিক') ভাঙন ও ক্ষয় শুরু হয়। ইংরেজ অধিকৃত ভারত পরিণত হয় এক স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে। ভারতের ধন-দৌলত লুণ্ঠন ক'রে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হয়, ভারতে ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের শিল্পনগরগুলি নিষ্প্রদীপ হয়ে পড়ে। ক্ষুধার তাড়নায় সমৃদ্ধ মানবধর্মের রচয়িতা লোককবির একতারার তার ছিঁড়ে যায়। ম্যাঞ্চেস্টারের কলের ভোঁ হঠাৎই আমাদের 'আধুনিক' ক'রে দেয়, শুরু হয় রেনেশাঁসের পালা। জন্ম হয় এক 'রাজনৈতিক হিন্দুত্ব' আর 'রাজনৈতিক ইসলাম'-এর। শুরু হয় 'আমরা' আর 'ওরা'র যুগ। আধুনিক যুগের ধর্ম-সংস্কার শতাব্দী-সঞ্চিত ভ্রাতৃত্ব-ভাবকে ক্ষুণ্ণ করে, বিপথগামী করে। 'অকূল অতল কালাপানি' দীর্ঘতর হয়, তার পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। ঘরছাড়া বাউল-ফকিররা আজও আছেন, আজও তাঁরা গান বাঁধেন, গান গান, কিন্তু বিশ্বায়নের ঢক্কানিনাদে এঁদের মাধুকরীর ঝুলি আজ অপূর্ণই থেকে যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের জাতক 'রাজনৈতিক হিন্দুত্ব' আর 'রাজনৈতিক ইসলাম'-এর পারস্পরিক দ্বেষ আর দূরত্ব আজ বৃদ্ধি পেয়েছে, পাচ্ছে। 'সেকুলার' দেশের নেতারাও কিছুই প্রায় করছেন না। তাই শেষলগ্নে স্মরণ করি সত্যদ্রষ্টা সেই ঋষিকে—

আমার আত্মার মাঝে ঘন হোলো কাঁটার বেড়া এ
কখন সহসা রাতারাতি
স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিবো বাড়ায়ে
ওরে মূঢ়, ওরে আত্মঘাতী।
ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামী
ঈশ্বরের করো অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন্ শয়তান।
ও কাঁটা দলিতে গেলে দুই দিকে ধর্মধ্বজীদলে
ধিক্কারিবে। তাহে ভয় নাই,
ও পাপ আড়ালখানি উপাড়ি ফেলিবে ধূলিতলে,
জানিবো আমরা দোঁহে ভাই।....

নির্দেশিকা

১। বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ প্রথম খণ্ড; বইপত্র; কোলকাতা ১৯৭৭; পৃ. ২৮৬

২। রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড; পশ্চিমবঙ্গ সরকার; কোলকাতা ১৯৬১; পৃ. ৪৩

৩। Karl Marx and F. Engels. The First Indian War of Independence, 1857-1859. Moscow, Foreign Languages Publishing House (n.d.); p. 34.

৪। Dr. Tara Chand. Quoted in Nursingdas Agarwala. The Hindu-Muslim Question. Calcutta 1951. p. 43.

৫। ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড; কোলকাতা ১৯৮৭; পৃ. ৬৭

৬। Harabans Mukhia. "Medieval Indian History and the Communal Approach", in Romila Thapar and Others (ed.) Communalism and the Writing of Indian History. New Delhi 1981. p. 35.

৭। Romila Thapar. A History of India, Vol. I. Penguing Books 1982. p. 302.

৮। Vide M. N. Roy. The Historical Role of Islam. Bombay 1943. pp. 77-78.

৯। আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য; কোলকাতা ১৯৭১; পৃ. ২৫

১০। উপরোক্ত; পৃ. ২৮

১১। " পৃ. ২৮

১২। " পৃ. ১৮৭

১৩। " পৃ. ১৮৬

১৪। বিনয় ঘোষ; বাংলার নবজাগৃতি, ১ম খণ্ড; কোলকাতা ১৩৫৫; পৃ. ১৩৮-১৩৯

১৫। আনিসুজ্জামান; পৃ. ১৮৩

১৬। " পৃ. ১৮৩

১৭। মযহারুল ইসলাম, 'আঙ্গিকতার আলোকে ফোকলোর'; বাংলা একাডেমি, ঢাকা; 'পুস্তক পবিচয়'. আনন্দবাজার পত্রিকা; ২২.৮.২০০০

১৮। আনিসুজ্জামান; পৃ. ১১৩

[গণশক্তি, শারদ সংখ্যা ১৪০৮/২০০১]

উনিশ শতকের বাঙলায় হিন্দু জাতীয়তা

১৮৮৪ সালে অবসরপ্রাপ্ত আই.সি.এস. স্যার জন স্ট্রেচী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণ দান কালে বলেন, "ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় হোলো— ভারতবর্ষ ব'লে কোনো দিন কিছু ছিল না, এখনও নেই!" স্ট্রেচী বলেন, "ব্রিটিশ সরকারের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ এবং দেশীয়দের সমস্বার্থ বোধ সত্ত্বেও [ভারত বোধের মতো] কোনো বিষয় জন্মলাভ করবে না।" তিনি আরও বলেন, "বোম্বাই, পাঞ্জাব, বাঙলা, বা মাদ্রাজের মানুষের চিন্তনে এক সাধারণ জাতীয় মনোভাব গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব।"[১]

স্ট্রেচীর এই সিদ্ধান্তের পেছনে এক সাম্রাজ্যবাদীর ঔদ্ধত্য দৃষ্টিগোচর হয়। বিশ্বের সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ তার শোষণ-লুণ্ঠন-উৎপীড়ন বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভুত্ব ছাড়াও এক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভুত্ব কায়েম করার চেষ্টা করে। ফ্যাঁনো লিখেছেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সবসময়ই উপনিবেশের মানুষদেরকে তাদের আপন সংস্কৃতির হীনতা দৈন্য আর নিজ-জাতির অনস্তিত্ব মেনে নেবার জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টাই গ্রহণ ক'রে থাকে।[২]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ— বিজিত কৃষ্ণবর্ণ প্রজাদের 'সভ্য' করার জন্য ও 'বর্বর' ভারতীয়দের ওপর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য তরবারি আর 'পবিত্র' ক্রুশ সমানভাবেই ব্যবহার করে। ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খৃষ্টধর্মের ধ্বজাধারী মিশনারীদের কার্যকলাপ হিন্দুদের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ পুঁজির অনুচর এই পাদ্রীদের উদ্দেশ্য ছিল 'সুসমাচার' প্রচার ক'রে দেশীয় ধর্মের হীনতা আর ভারতীয় জাতির (এই জাতীয়তা বোধ যতই অপরিণত হোক না কেন) অনস্তিত্ব প্রমাণ করা। ধূর্ত ব্রিটিশের কূটকৌশলে সাম্রাজ্যবাদ আর পাদ্রীতন্ত্র একাকার হয়ে ওঠে ভারতের পার্থিব আর 'অপার্থিব' বিজয় সম্পূর্ণ করার জন্য।

সুজলা সুফলা ভারতবর্ষকে শোষণ ক'রে, লুণ্ঠন ক'রে, নিঃস্ব ক'রে দাসত্বের বন্ধন চিরস্থায়ী করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ১৮৩৫ সালে এক আপাত-নিরীহ উপায় অবলম্বন করে; তা হোলো, প্রাচ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে পাশ্চাত্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। বর্দ্ধিষ্ণু ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক ফেরীওয়ালা টমাস ব্যাবিংটন মেকলে— বিজিতদের সাংস্কৃতিক হীনতা দৈন্য আর জাতিগত অনস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার কাজে প্রাচ্যবাদী শিক্ষার প্রবক্তাদের ব্যঙ্গ ক'রে বলেন— "দেশীয়দের শেখানো হবে ভ্রান্ত ইতিহাস, ভ্রান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভ্রান্ত চিকিৎসাশাস্ত্র— কারণ এরা এক মিথ্যা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত!" এই মূঢ় ও উদ্ধত ব্যক্তিটি বলেন— "সমগ্র ভারতীয় ও আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুল্য জ্ঞানরাশি যে-কোনো ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের একটি বইয়ের তাকেই পাওয়া যাবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে অর্থব্যয় ক'রে দেশীয় যুবকদের শেখানোর কোনো মানে হয় না, যে— একটি গাধা স্পর্শ করলে কী ক'রে শুদ্ধ হওয়া যায় অথবা একটি ছাগল হত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বেদ-এর কোন্ মন্ত্রটি আবৃত্তি করতে হবে।"[৩]

প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ পুঁজির উদ্দেশ্যে ছিল ভারত শাসনের জন্য রাজানুগত এক আমলা বাহিনী তৈরি করা— যারা শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে ভাবনায় হবে ইংরেজ, শুধু গাত্রবর্ণ আর রক্তে হবে ভারতীয়। এ কারণেই পাশ্চাত্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন। এর ঠিক একবছর পর ১৮৩৬ সালে মেকলে বলেন, ''পাশ্চাত্যবাদী বিদ্যাচর্চার ফলে তিরিশ বছর পর দেশীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মধ্যে একজনও মূর্তি-পূজক পাওয়া যাবে না, এর জন্য ধর্মান্তকরণের প্রয়োজন হবে না।'' মেকলের পৃষ্ঠপোষক বেণ্টিঙ্ক সাহেব বলেন, ''এই শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে ভারতের 'ক্রিশ্চানিকরণ' সম্পন্ন হবে।''[৪]

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩) উদ্ভূত ধনী বাঙালির প্রথম প্রজন্ম মেকলের স্বপ্ন পূর্ণ করেন। এঁরা ইংরেজি শিক্ষায় 'শিক্ষিত' হয়ে, পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় 'আলোকিত' হ'য়ে শ্বেত প্রভু আর কৃষ্ণকায় স্ব-জাতির মধ্যে শাসকের শোষণের সহায়ক এক ভদ্রশ্রেণী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সাম্রাজ্যবাদীর সাংস্কৃতিক নীতির দৌলতে উদীয়মান এই ভদ্রবাবু-সম্প্রদায় অচিরেই দেশীয় সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ড্যানিয়েল লারনার-এর মতো সমাজবিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়াকে ''দেশীয় সত্তার [বন্ধন থেকে] মুক্তি''[৫] বলেছেন। ব্রিটিশের কাছে তাদের শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য এই ধরনের এক সাংস্কৃতিক নীতির অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। এই সময় থেকে পাশ্চাত্য জগৎ সম্পর্কে ভদ্রবাবুদের বিনম্র শ্রদ্ধা আর মোহ ক্ষীয়মান হয়ে পড়ে; তাঁরা আত্মানুসন্ধানে রত হন। আগ্রাসী খৃষ্টধর্মের প্রতিক্রিয়ায় এঁরা নিজ দেশ, নিজ ধর্ম, নিজ সভ্যতা আঁকড়ে ধরেন। বিত্ত আর বিদ্যা দুই-ই এঁরা অর্জন করেন ব'লে এঁরাই হয়ে ওঠেন আধুনিক বঙ্গসমাজের মুখপাত্র। সমাজের এই ক্ষুদ্র অংশ ক্রমশ ইংরেজিয়ানার পরিবর্তে দেশাভিমানী হয়ে পড়েন; এবং 'জাতি প্রতিষ্ঠায়' অগ্রসর হন। যদিও এঁরা এর দীক্ষা গ্রহণ করেন সাম্রাজ্যবাদীর 'চিত্ত ভাণ্ডার' থেকেই; দেশের কৃষক-কারিগরশ্রেণীর সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আপসবিমুখ সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে নয়।[৬]

হিন্দু ভদ্রবাবুরা জাতি প্রতিষ্ঠার সোপান হিসেবে অবলম্বন করেন হিন্দুত্বকে। এঁদের প্রয়াসেই গ'ড়ে ওঠে 'নব হিন্দুবাদ', যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্ব তথা স্বদেশকে 'আপন গরিমায়' প্রতিষ্ঠা করা আর এর মাধ্যমে উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্ত ভদ্রশ্রেণীকে মিলিত করা, সংহত করা। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভদ্র হিন্দু-বাঙালির জগতে হিন্দু-ধর্মাশ্রয়ী-সংস্কৃতি ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব বা রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণযোগ্য ছিল না।[৭] এই কারণে এঁরা মুখ ফেরান 'মহিমাময়' প্রাচীন ভারতের দিকে, 'পূর্বপুরুষ'-এর ধর্মের দিকে, 'গৌরবময় আর্য ভারত'-এর দিকে। নবলব্ধ এই 'জাতীয় চেতনা' জনবিচ্ছিন্ন হিন্দু-ভদ্রবাবুদের নিজস্ব সম্পদ হয়ে ওঠে। কারণ প্রতিবেশী উচ্চবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায় তখন ক্ষয়িষ্ণু, রাজ্য হারানোর নিস্ফলা ক্ষোভে হতোদ্যম, ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণে অনিচ্ছুক, ধর্মীয় গোঁড়ামী আর কুসংস্কারে ভারাক্রান্ত, গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। হিন্দুবাবুদের সঙ্গে দেশের হিন্দু-মুসলমান কৃষক-কারিগরশ্রেণীর ছিল সহজাত বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব— যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাই উনিশ শতকের হিন্দুবাবুর খণ্ডিত জাতীয় চেতনা সমগ্র জাতিকে একীভূত করতে পারেনি। এই দুর্বলতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের হিন্দু-ধর্মাশ্রয়ী জাতীয় চেতনা উত্তরপুরুষকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হ'তে প্রেরণা দেয়।

ব্রিটিশ ভারতে বাঙলারই ছিল ইংরেজ শাসনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক কারণে পরবর্তীকালে বাঙলাই হয়ে ওঠে দেশীয় রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের পীঠস্থান। মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত-উচ্চবর্ণ-উচ্চশিক্ষিত ভদ্র বাঙালির সৃষ্ট হিন্দু-জাতীয়তার কেন্দ্রস্থল। সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সংগ্রামে মতাদর্শগত পাথেয়কে জাতীয়তাবাদ বলা যায়।[৮] ব্রিটিশ-অধীন ভারত বা বাঙলায় সার্বভৌম অধিকার অর্জনের জন্য প্রয়াস চালানোর মতো সামাজিক-রাজনৈতিক-সামরিক ক্ষমতা তৎকালের হিন্দুবাবুদের ছিল না কিন্তু পরাধীনতার গ্লানিও এঁরা বোধ করতেন, তাই সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই এঁদের স্বদেশ সাধনা শুরু হয়, কার্যত যার রূপ হোলো অতীতচারিতার মাধ্যমে 'হিন্দু ভারতের উদ্বোধন', 'লুপ্ত হিন্দুমহিমা'র গুণকীর্তন, আর মধ্যযুগে মুসলমান শাসনের প্রতি, তথা যবনের প্রতি উদগ্র বিদ্বেষের প্রচার, যার প্রথম উদগাতা 'ভারত পথিক' রাজা রামমোহন রায় আর সার্থক রূপকার 'সাহিত্য সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র।

হিন্দুবাবুদের দেশপ্রেম চর্চার সর্বোত্তম পন্থা ছিল মেলা সভা ইত্যাদি সংগঠন গ'ড়ে তোলা। ১৮৬০ সালে নবহিন্দুবাদের প্রথম তাত্ত্বিক রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরব সম্পাদিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করা আর হিন্দু ধর্মত্যাগী যুবকদের স্ব-ভূমিতে ফিরিয়ে আনা।

১৮৬৬ সালে শ্রীবসু একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় তিনি হিন্দু যুবকদের চিত্তে জাতীয়তা বোধ গ'ড়ে তোলার জন্য তাদের মধ্যে পুরুষকার সঞ্চার করাব কথা বলেন। রাজনারায়ণ একটি সমিতি গ'ড়ে তার মাধ্যমে যুবকদের দেশাত্মবোধক গানে উদ্বুদ্ধ করা, হিন্দু চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রাচীন গৌরব সম্পর্কে তাদের অবহিত করার প্রয়াস নেন। এই সময় তিনি হিন্দুবাবুদের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা রূপে দেখা দেন। ১৮৭১ সালে তাঁর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক ভাষণ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় শ্রীবসু বলেন, "আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে.... আমি দেখিতেছি আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া.... পুনরায় নব যৌবনান্বিত, পুনরায় জ্ঞান সভ্যতাতে উজ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে....।"[৯]

সেকালের খ্যাতনামা পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' লেখে-- "হিন্দুধর্ম নির্বানোন্মুখ হইয়াছিল, রাজনারায়ণবাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন....।"[১০] 'সনাতন ধর্ম রক্ষিণী সভা'র সভাপতি কালীকৃষ্ণদেব রাজনারায়ণের ভূয়সী প্রশংসা ক'রে তাঁকে 'হিন্দুকুল শিরোমণি' রূপে বরণ ক'রে নেন। 'কলির ব্যাস' অভিধাতেও তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৮৮১ সালে রাজনারায়ণ লেখেন, "মুসলমানেরা যখন 'ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশান'-এ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন, হিন্দুদেরও 'মহা হিন্দু সমিতি' গঠন করা উচিৎ।"[১১]

১৮৮৬ সালে রাজনারায়ণ রচিত 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় তিনি 'মহা হিন্দু সমিতি'র উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে লেখেন, "....হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণত হিন্দুজাতির উন্নতি সাধন করা....."। হিন্দু-ঐক্যের জন্য রাজনারায়ণ জাতিভেদ প্রথা সমর্থন করেন।[১২] এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি ছিল, বিশ্ব এখনও সমাজতন্ত্রী এবং সমতাবাদীদে' গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয়।[১৩]

এই সময় রাজনারায়ণ প্রমুখ সৃষ্ট 'নব হিন্দুবাদ'-এর জোয়ারে ভেসে গিয়ে বহু বিশিষ্ট মানুষ বাল্যবিবাহ আর জাতিভেদপ্রথার প্রচার শুরু ক'রে দেন। এঁরা মনে করতেন হিন্দুধর্ম-আশ্রয়ী যাবতীয় সংস্কার-কুসংস্কার দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। তৎকালের আক্রমণাত্মক খৃষ্টধর্ম আর বিদেশ থেকে ধার করা সংস্কৃতির আড়ম্বরের প্রতিক্রিয়ায় এঁরা বৃহদাকার হিন্দু-অচলায়তনকেই বরণ ক'রে নেন।[১৪]

হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রধান পুরুষ হলেন নবগোপাল মিত্র। তিনি ১৮৬৭ সালে ঠাকুরবাড়ির সহায়তায় 'চৈত্র মেলা' বা 'হিন্দু মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই মেলায় শরীরচর্চার প্রদর্শন ছাড়াও কৃষি ও শিল্পের উদ্বোধন এবং সকল ক্ষেত্রে 'জাতি'কে উন্নত করা ইত্যাদির আলোচনা হোতো। বাহুবলে ইংরেজ তাড়ানোর কথাও নবগোপাল চিন্তা করতেন। 'ন্যাশনাল পেপার', 'ন্যাশনাল সোসাইটি' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি 'ন্যাশনাল নবগোপাল' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

হিন্দু মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে বলেন, "এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা.... যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগের জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে।

আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কেবল আমোদপ্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য— ভারতভূমির জন্য।"

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, 'ন্যাশনাল নবগোপাল' অথবা হিন্দু মেলার অন্যান্য উদ্যোক্তাদের ভাবনাচিন্তায় অ-হিন্দুর বিশেষ কোনো স্থান ছিল না। আবার উর্দু বা ফারসী শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মুসলমানরাও মনেপ্রাণে ছিলেন অ-ভারতীয়, তাঁদের হৃদয় ও মনন বাঁধা ছিল পশ্চিম এশিয়ায়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "একবার একজন পত্রপ্রেরক 'National Paper'-এ এক পত্র প্রেরণ করিয়া সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান— কেন এই প্রতিষ্ঠানের 'জাতীয়' শব্দের পরিবর্তে 'হিন্দু' নামকরণ হইয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তরে সম্পাদক বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতের হিন্দু সংহতির জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কারণ The Hindus certainly form a nation by themselves (ভারতে হিন্দুরা নিশ্চিত একটি নেশন)!' এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, হিন্দু বুর্জোয়ারাই সর্বপ্রথমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী হইতে পৃথক করিয়া ভারতে নিজেদের স্বতন্ত্র নেশন বলিয়া দাবি করে।"[১৫]

১৮৮০ সাল থেকে হিন্দু মেলার অধিবেশন বন্ধ হবার পরেও হিন্দু-চিত্তে এর অনুরণন দীর্ঘস্থায়ী হয়। হিন্দু মেলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।" এই ভারত হিন্দু ভারত!

উনিশ শতকের বাঙলায় নব হিন্দুবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সভা-সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্জীবনী সভা'র নামও উল্লেখযোগ্য। এই সভার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এর সভ্য ছিলেন। এই 'গুপ্ত সভা'য় 'হিন্দু স্বদেশ'-এর চর্চাই হোতো, কিন্তু মূল বিষয় ছিল 'উত্তেজনার আগুন পোহানো।'

উনিশ শতকের বাঙলায় নব হিন্দুবাদ আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের ভক্তিবাদ ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের আক্রমণাত্মক হিন্দুত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে শাক্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলন বাঙলার বিপ্লবীদের প্রভাবিত করে। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত 'সিডিশন কমিটি'র[১৬] রিপোর্টে বলা হয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'ভক্তি আন্দোলন'-এর বিকৃত রূপ বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের সহায়ক হয়।

বাঙলার সাহিত্য হিন্দু-জাতীয়তার পুষ্টি সাধন করে। হিন্দুত্ব-আশ্রয়ী সাহিত্য-আন্দোলনের প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর চিন্তার মূল বিষয় ছিল 'হিন্দু ঐক্য' স্থাপন করা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে লেখেন— "আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল, তাহাই আমার কর্তব্য। যাহাতে কোনো হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য....

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিবো। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিবো.... পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিবো।"[১৭]

উগ্র হিন্দু-জাতীয়তার সরব আত্মঘোষণাই হোলো ঋষি বঙ্কিমের ধ্যান, তাঁর দেশপ্রেমের মূলমন্ত্র। আর এ কারণেই, "ভাই— এমন দিন কি হইবে যখন মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িবো?" বঙ্কিম তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে হিন্দুর মাতৃপূজাকে এক নতুন রূপ দেন। মাতৃপূজার লোকপ্রিয় তিনটি রূপের সঙ্গে স্বদেশের কল্পিত বিবর্তনের সাযুজ্য স্থাপন ক'রে সাহিত্যসম্রাট সচেতন-হিন্দুর মননে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত করেন।

বঙ্কিমের প্রভাবে নবহিন্দু আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। তৎকালের অনেক সাহিত্যবিদ যবন-বিদ্বেষ আর হিন্দু-দেশপ্রেমমূলক আখ্যান রচনা করেন। এঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত অগ্রগণ্য। কিশোব রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য একটি গান রচনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রের এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের উক্ত গানে যবন-বিদ্বেষ আর হিন্দু-দেশপ্রেম অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে; "জ্বল, জ্বল চিতা দ্বিগুণ, দ্বিগুণ/পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা/ জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন/ জুড়াবে এখনই— প্রাণের জ্বালা। / শোন্ রে যবন। শোন্ রে তোরা/ যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,/ সাক্ষী হলেন দেবতা তাহার/এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।"

হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করেছি। এই বিষয়ে তাঁর অবদানের আলোচনা আবশ্যিক। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাম্প্রদায়িক হওয়া সত্ত্বেও বিবেকানন্দ ছিলেন নব-হিন্দুবাদ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ।

বিবেকানন্দ তাঁর নিখাদ দেশপ্রেম আর আক্রমণাত্মক হিন্দুত্বের সম্মিলনে হিন্দুর চিত্ত জয় করেন; হিন্দুর দেশাভিমান জাগ্রত করেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙলার মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে— ব্রিটিশ শক্তি অতি অবশ্যই বিদেশী শোষক, বিদেশীর স্বার্থ আর স্বদেশের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী, ইংরেজ অত্যাচারী প্রভু!

ঠিক এই সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় বিবেকানন্দ তাঁর আক্রমণাত্মক হিন্দুত্বের বাণী প্রচার করেন। নেহরু লিখেছেন, বিষাদগ্রস্ত হিন্দুর মননে বিবেকানন্দের বাণী এক 'টনিক'-এর মতো কাজ করে; তাঁর প্রেরণায় হিন্দু তাঁর 'অতীত'-এর মূল খুঁজে পায়। বিবেকানন্দ বিমর্ষ হিন্দুকে তার উপনিষদের ধর্মের বাণীর মাধ্যমে বিশ্বজয় করার স্বপ্ন দেখান, "ভারতীয় চিন্তা, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা আর-একবার বিশ্ববিজয়ে বের হবে.... আমি এক ভাবুক মানুষ, আমার ধারণা হিন্দুজাতির দ্বারা সমস্ত পৃথিবী জয়.... আমরাও বড় দিগ্বিজয়ী.... সে বিজয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার.... আর-একবার ভারতকে পৃথিবী জয় করতে হবে.... জাতীয় জীবনে জাগ্রত ও প্রাণবন্ত জাতীয় জীবন লাভের একমাত্র শর্ত হচ্ছে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা বিশ্ববিজয়....".[১৮] অথবা— "হিন্দুর রক্তে ও হিন্দুর অর্থে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, জেনে রাখিস, আজকের ব্রিটিশ এম্পায়ার একদিন হিন্দু সাম্রাজ্য হয়ে যাবে।"[১৯]

রাজনারায়ণ, নবগোপাল, বঙ্কিমচন্দ্র এঁরা সকলেই এক বলিষ্ঠ হিন্দুজাতির অভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন; বিবেকানন্দও মনে করতেন যে অদূর ভবিষ্যতে মোহজাল ছিন্ন ক'রে হিন্দু এক বলিষ্ঠ জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। তিনি তাঁর এক ব্রিটিশ ভক্তকে বলেন, "দ্যাখো, এই ভারতবর্ষটিকে.... hypnotise ক'রে ফেলেছে, তাইতেই অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবাসীদের বুকের উপর ব'সে রক্ত চুষে খাচ্ছে। কিন্তু যেদিন hypnotism চুলোয় যাবে এবং ভারতবাসীরা নিজেদের ভিতরকার শক্তি বুঝতে পারবে, সেদিন তোমাদের চেপটে মেরে ফেলবে— will squeez you like lemon...."[২০]

অসংখ্য স্ববিরোধী কথা বললেও তৎকালীন হিন্দুর দৃষ্টিতে ব্রিটিশের পাশ্চাত্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ এক প্রবল প্রতিবাদ রূপে দেখা দেন। সম্ভবত বেন্টিঙ্ক ও মেকলের নীতি ও তাঁদের 'ভবিষ্যৎ বাণী'কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার জন্যই তিনি মূর্তিপূজার স্তুতি করেন এবং দেবী আরাধনার সঙ্গে দেশমাতৃকা বন্দনার সাযুজ্য স্থাপন করেন, "ভুলিও না— তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত.... ভুলিও না নীচু জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত— তোমার ভাই।"[২১]

রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাবিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র বর্ণহিন্দু, উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতি; মুচি-মেথরও যে স্বদেশ-বন্দনায় অংশ নিতে পারেন, তাঁরাও যে ভারতীয় জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ— একথাও প্রথম বলেন বিবেকানন্দ।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় ও পরবর্তীকালে হিন্দু-রাজনীতিক ও বিপ্লবীদের কণ্ঠে নবহিন্দুবাদ, বিশেষত বিবেকানন্দের চিন্তা মূর্ত হয়ে ওঠে, যদিও প্রকৃত অর্থে 'মুচি-মেথর' আজও বর্ণহিন্দুর সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে অপাংক্তেয়। সমসাময়িক ও অদূর অতীতের চিন্তানায়কদের তুলনায় মুসলমান-সম্প্রদায় সম্পর্কেও তাঁর ভাবনা অনেক সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তববাদী। কিন্তু বাংলা তথা ভারতবর্ষের 'ট্র্যাজিডি', উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের নেতৃবৃন্দ সাধারণ শ্রমজীবী হিন্দু-মুসলমান-মুচি-মেথরের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রাম গ'ড়ে

তোলার প্রয়াস নেননি। তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়তো অন্যরকমভাবে রচিত হোতো।

স্ট্রেচী সাহেবের মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ ক'রে উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে ও বিশ শতকের গোড়ায় হিন্দু-রাজনীতিক ও অগ্রণী ব্যক্তিদের চিন্তায় ভারত-বোধ জাগ্রত হয়, যার সূচনা ঘটে সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের অবদানে— "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে,"— যদিও এই ভারতে অহিন্দু অথবা মুচি-মেথরের কোনো উজ্জ্বল ভূমিকা নেই!

পরবর্তীকালে রাশিয়ার বিশ্ব-কাঁপানো বিপ্লবের প্রভাবে ভারতের বিপ্লবীরাও প্রভাবিত হন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি পরিত্যাগ ক'রে মার্ক্সবাদের চর্চা শুরু করেন, ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি ক্ষীয়মান হ'তে শুরু করে। ১৯২০-'২১ সাল থেকে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী যুগের সূচনা হবার পর ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদ ইতিমধ্যে ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' ও ১৯১০ সালে 'হিন্দু মহাসভা'র জন্ম দেয়। ১৯২০ সালে হিন্দুগুরু শঙ্করাচার্য বলেন, গান্ধীজীর অহিংসার বাণী হিন্দুধর্মের নীতি ও আর্য-দর্শনকে মূল থেকে উৎপাটিত করবে এবং গান্ধীজীর অহিংসার বাণী হিন্দুর ওপর প্রভুত্ব করার জন্য মুসলমানকে উৎসাহিত করবে। এই ব্যক্তিটি হিন্দুদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ, ও তিলকের শক্তি-আরাধনার বাণী অনুসরণ করার আহ্বান জানান।[২২] সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা হিন্দুগুরুর এই উপদেশ সাদরে গ্রহণ করেন, তাঁরা প্রাচীন ভারতের ক্ষাত্রতেজ-চর্চার ওপর বিশেষ জোর দেন।

খিলাফৎ আন্দোলনের হুজুগ (১৯২১) কেটে যাবার পর সারা দেশে শুরু হয় হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। উনিশ শতকের হিন্দু-জাতীয়তার 'স্পিরিট' এই সময় উগ্র হিন্দুত্ব ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিণত হয়। সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা এই সময় সারা দেশে 'শুদ্ধি' (অর্থাৎ পূর্বতন হিন্দু বর্তমানের মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় ফিরিয়ে আনা) ও গো-রক্ষা আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু করেন। সমগ্র উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডল— শ্রেণী-রাজনীতির পথ রুদ্ধ করে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিপতি ও সামন্তশ্রেণীর উদ্দেশ্য সফল হয়।

বহুকথিত 'সেকুলার' ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের কণ্ঠে উনিশ শতকের হিন্দু-জাতীয়তার এক বিকৃত অনুরণন শোনা যায়। সেই সময় যা ছিল এক খণ্ডিত জাতীয় চেতনা; আজ তা হননের রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের তাত্ত্বিক নেতা গোলওয়ালকার মশাই বলেন, হিন্দুস্তান হাজার বছর ধ'রে শক্তি ও গৌরবের আসনে সমাসীন ছিল; তার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর থেকেই হিন্দু-জাতির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি উপলব্ধি করা যায়।[২৩] এই চরম সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিটি তাঁর অনুগামীদের শিক্ষা দেন, হিন্দু-ভারতে অভ্যন্তরীণ বিপদ হোলো মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায় ও কমিউনিস্টরা। অত্যন্ত সহজবোধ্য শিক্ষা!

স্বাধীন ভারতের কাণ্ডারীরা সাম্প্রদায়িকদের ঝাড়েবংশে উচ্ছেদ করার কোনো চেষ্টাই করেননি। আজ হিন্দু-সাম্প্রদায়িকরা সাধারণ মানুষের ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে বিধর্মীদের পুড়িয়ে খুন করছে, নারীর সম্মানহানি করছে, উপাসনা স্থল ধ্বংস করছে— আবার ভোটে জিতে এসে সরকারও চালাচ্ছে। গুজরাটের গণহত্যা অভূতপূর্ব। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্রয়ে, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্রয়ে— সাম্প্রদায়িক পুলিশ-প্রশাসন এবং সরকারি দল হতভাগ্য গুজরাটে নিশীথকালের

দুঃস্বপ্নের মতো এক বিভীষিকার রাজত্ব স্থাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী দেশবিদেশের ধিক্কারে নির্লিপ্ত থেকে বাণী দেন, "দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে মোদী সরকার যথেষ্ট ভালো কাজ করেছে...."[২৪] জিঘাংসু সরকারের প্রশংসা ও যবনের নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইতিহাস ও 'থিওলজী' বা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। 'সেকুলার', গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ইসলামের এখন দুটো রূপ, একটা রূপ সত্যপথে চলতে শেখায়। অন্য ইসলামে সহিষ্ণুতা নেই, সেখানে জেহাদের ডাক.... ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সহ মুসলিমরা যেখানেই আছেন, সেখানেই তাঁরা.... শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে থাকতে পারেন না। আতঙ্ক ছড়িয়ে তাঁরা ধর্মপ্রচার করেন.... ইসলাম শিক্ষা দাও, কিন্তু তলোয়ার দিয়ে ধর্মপ্রচারের শিক্ষা দেওয়া চলবে না।"[২৫]

রক্তাক্ত স্বদেশে হয়তো কোনো অনাথ নবজাতক বেঁচে থাকবে, বুনো গাছের মতো বেড়ে উঠবে অবাধ্যতায়, শত দলন সত্ত্বেও— সকলের অজ্ঞাতে যে, "স্বজন হারানো শ্মশানে" শত্রুর চিতা জ্বালাবার জন্য প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করবে, "ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো"— শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টিতে তখন সত্য-সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবে; "শূদ্র যুগ আসবেই"। যে-সব রামভক্ত 'ধর্ম-ব্যবসায়ী' "এক টুকরো রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কী দেবে"! আজ যারা বিশ্বায়নের নামে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে বিদেশীর কাছে বন্ধক রাখছে, তাদের দখল থেকে পুরো রুটিটা কেড়ে নিক ক্ষুধার্ত হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান-মুচি-মেথর। শুরু হোক সংগ্রাম! "তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী! তোমাদের প্রণাম করি।"

টীকা ও তথ্যসূত্র

১। Mehtotra, S. R. Towards India's Freedom and Partition. New Delhi 1979. p. 1.

২। Fanon Frantz. The Wretched of the Earth. Suffolk 1976. p. 190.

৩। Smith D. E. India as a Secular State. New Jersey 1963. p. 339.

৪। Ibid, p. 339.

৫। Vide, Kopf David. British Orientatism and Bengal Renaissance : The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835. Calcutta 1969. p. 175.
লারনার সাহেব মার্ক্সের 'idiocy of rural life' বা 'গ্রাম্য জীবনের মূঢ়তা' থেকে 'মুক্তির' ধারণা (concept) ধার ক'রে ঔপনিবেশিকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে বিজিত দেশের মানুষের 'চিন্তার মুক্তির' কথা বলেছেন। কিন্তু সামন্ত-সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকারী শিল্পবিপ্লব না ঘটলে কোনো দেশে চিন্তার বিপ্লব ঘটে না। ইংরেজের শোষণ-লুণ্ঠনের পরোক্ষ কারণে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যরা (ইয়ং বেঙ্গল) কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ও দেশপ্রেমের পক্ষে দাঁড়ালেও হিন্দুসমাজের ভিত্তিতে আঘাত দিতে পারেননি। ইংরেজ এখানে শোষণ-লুণ্ঠনের জন্য এসেছিল, শিল্পবিপ্লব ঘটাতে নয়। তারা 'ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র' হিসেবে কিছু কিছু পশ্চিমী মূল্যবোধ ও শিক্ষা প্রচার ক'রে, এক সঙ্কর সংস্কৃতির জন্ম দেয়। যা আজও আমাদের সমাজে দৃশ্যমান।

৬। "ইংরেজ ভারতের পরমোপকারী.... যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার

হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা.... উল্লেখ করিলাম— স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা— ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড; তুলি কলম, কোলকাতা ১৩৯৩; পৃ. ২৪০-২৪১

৭। নব-হিন্দুবাদের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা রাজনারায়ণ বসু 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উদগাতা পাশ্চাত্যের 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের' প্রশস্তি করেন 'সাম্য' প্রবন্ধে; কিন্তু পরে নিজেই এই রচনার প্রকাশ বন্ধ ক'রে দেন।
১৮৬৬ সালে বরাহনগরে চটকল-শ্রমিকদের জমায়েত এক নতুন যুগের সূচনা করে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৭০ সালে 'শ্রমজীবী সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁরই উদ্যোগে। ১৮৭২ সালে 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই বছরেই শিবনাথ শাস্ত্রী একটি কবিতার মাধ্যমে শ্রমিকদের 'প্যারী কমিউন' সম্পর্কে অবহিত করেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজেকে কমিউনিস্ট বলেন।
আমাদের বক্তব্য হোলো 'নব হিন্দুবাদ'-এর নির্মাতারা সমসাময়িক বাঙলা তথা ভারতের সমাজ-রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই নতুন ধারা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, দেশে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী অব্যাহত গণসংগ্রাম (যার চরম উৎকর্ষ হোলো ১৮৫৭-র স্বাধীনতা যুদ্ধ) সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, এমত চিন্তা বোধহয় সঠিক নয়। 'নব-হিন্দবাদ'-এর প্রবক্তারা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের জন্যই শ্রমিক-কৃষকস্বার্থের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন।

৮। Hooghe Overview : Liesbet. 'Nationalist Movements and Social Factors : A Theoretical Overview' Plural Societies, Vol. XX, No. 1. June 1990.

৯। উদ্ধৃতি, চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র; পূর্বোক্ত; পৃ. ৮৭৫

১০। শাস্ত্রী শিবনাথ; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ; কোলকাতা ১৯৮৩; পৃ. ২৮৬

১১। দে অমলেন্দু; বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ; কোলকাতা ১৯৭৪; পৃ. ২০৭

১২। উপরোক্ত; পৃ. ২০৭-২০৮

১৩। Kopf David; The Brahmo Samaj and The Shaping of The Modern Indian Mind. Princeton 1979. p. 181

১৪। ইতিহাসের পরিহাস, রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের সময় অনুষ্ঠানগৃহে উপস্থিত হবার 'অপরাধে' ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি 'শুদ্র' রাজনারায়ণকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। গোলাম মুরশিদ; রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ— পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা; ঢাকা ১৯৮১; পৃ. ৩২

১৫। দত্ত ভূপেন্দ্রনাথ; ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম; কোলকাতা ১৯৮৩; পৃ. ৮৭

১৬। Sedition Committee Report. Calcutta 1919. p. 17

১৭। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র; পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯

১৮। বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড); কোলকাতা ১৯৭৭; পৃ. ২৭৩-২৭৪

১৯। বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড); পৃ. ২৭১

২০। উপরোক্ত, পৃ. ২৬৯

২১। উপরোক্ত (১ম খণ্ড), পৃ. ৯২

২২। Andersen and Damle. The Brotherhood in Saffron. New Delhi 1987. p. 20.

২৩। Golwalkar M. S. Bunch of Thoughts. Bangalor 1980. p. 212.

২৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬.৫.২০০২

২৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩.৪.২০০২

সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা ঃ 'আনন্দমঠ' বিতর্ক

লোকাল ট্রেনের বিরক্তিকর জার্নি; চোখ বুজে ছিলাম। দুই ভদ্রলোক খেলাধূলার আলোচনা করছিলেন। খেলাধূলা থেকে আলোচনা মোড় নিয়ে পাঞ্জাব সমস্যা স্পর্শ করলো, চোখ খুললাম। এক ভদ্রলোক বললেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামে শিখদের তো অনেক অবদান ছিল, তাহলে আজ শিখ-হিন্দুতে মারদাঙ্গা হচ্ছে কেন?" অপেক্ষাকৃত বেশিবয়সী ভদ্রলোক হাতের 'স্টেটস্‌ম্যান' নাড়িয়ে হাওয়া খেয়ে 'ভগবান জানেন' ধরনের একটা মুখভঙ্গি করলেন। মন্তব্য করলাম, "ওর জন্য তো ব্রিটিশরাই দায়ী।" কোথায় যাবেন, কোথায় থাকেন, কী করেন ইত্যাদি প্রশ্ন ক'রে 'স্টেটস্‌ম্যান বাবু' বেশ আলাপ জমালেন; পাঞ্জাব সমস্যা থেকে ব্রিটিশ, ব্রিটিশ থেকে দেশ-বিভাগ, সংবিধান, সাম্প্রদায়িকতা, 'ইসকন', অবশেষে 'আনন্দমঠ'-এ এসে আলোচনার বিরতি ঘটলো। ইংরেজিতে বিদায় জানিয়ে অপর ভদ্রলোক তাঁর নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে গেলেন। 'স্টেটস্‌ম্যান বাবু' কট্টর না হ'লেও 'বামপন্থী'— তিনি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। উত্তরপুরুষকে ধরাশায়ী ক'রে তিনি সিদ্ধান্ত টানলেন— "আগে হিন্দুদের একাংশ সাম্প্রদায়িক চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলেন, আজ তাঁরা লুপ্ত অথবা বিলীয়মান, আজকের হিন্দুরা সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে, 'সেকুলার' চিন্তায় আস্থাশীল।" তিনি এর দৃষ্টান্ত দিলেন যে পশ্চিমবাংলায় গরু কুরবানী নিয়ে আজ আর দাঙ্গা হয় না। ট্রেন তখন দু'জনেরই গন্তব্যের কাছাকাছি। কাজেই কথা আর এগোলো না, হাসিমুখে পরের স্টেশনে তিনি নেমে গেলেন। একটা কথা বলা দরকার, 'স্টেটস্‌ম্যান বাবু' কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে ছিলেন— তিনি এম.এস.সি. পাশ, দায়িত্বপূর্ণ চাকরি করেন এবং ঘুষ খাবার সুযোগ থাকলেও তিনি ঘুষ খান না।

উচ্চশিক্ষিত হিন্দু-বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে 'র‍্যানডাম স্যাম্প্লিং' করলে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে প্রায় একই মতামত পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা সত্যি সত্যি এমনটা হ'লে খারাপ হোতো না। কিন্তু এই আপাত 'সেকুলার' অসাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের আদি-বাসিন্দা ছাড়া পূর্ব বাঙলা থেকে উৎখাত হয়ে আসা বিশাল সংখ্যক মানুষ, এমন-কি 'বামপন্থী' পার্টির পাইয়ে দেবার নীতির দৌলতে যাঁরা কিছুটা স্থিতি লাভ করেছেন তাঁরাও— জ্ঞানত অথবা অসচেতনভাবে সাম্প্রদায়িক। দাঙ্গা যাঁরা বিস্মৃত হননি, যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাকে বিন্দুমাত্র সমালোচনা না ক'রেও অন্ধবিদ্বেষে মনে করেন সব মুসলমানই সাম্প্রদায়িক, 'হিন্দু জাতি'র শত্রু।

একথা ঠিক, পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণীভিত্তি বা অর্থনৈতিক ভিত্তি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণ নিশ্চিহ্ন হয়নি। সমাজের মৌল পরিবর্তন না হ'লে এরও পরিবর্তন হবে না। ভারতের শাসকদের 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'র নীতি বা 'মালটি রিলিজিয়াস কালচারাল পলিসি'র[১] ফলে বর্তমান ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি বর্তমান। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা

সম্পূর্ণভাবে সংবিধানসম্মত— যতক্ষণ না তা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বা ব্যাহত করে। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণভাবে আইনসম্মত; দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটলেই রাজনৈতিক নেতাদের টনক নড়ে। এই নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি বহুলাংশে সাংস্কৃতিক। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলমানের যে সমান্তরাল সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছিল, তার প্রভাব থেকে আজও আমরা মুক্ত হ'তে পারিনি। ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবাংলার প্রচলিত ইতিহাসে এমন কোনো অধ্যায় নেই যার সম্পর্কে মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে গৌরব বোধ করতে পারেন। উভয়েই যার সমান অংশীদার এমন কোনো সংস্কৃতিও (সঙ্কীর্ণ অর্থে) নেই। আর এই কারণেই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ছাড়া অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলমানই পৃথক পৃথক সংস্কৃতির বৃত্তে 'ঘুরপাক' খান। দেশবিভাগ-উত্তর হতাশা, ঐতিহাসিক কারণ-সঞ্জাত বিচ্ছিন্নতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের আত্মঘোষণা আর উচ্চমন্যতা, রাজনৈতিক দলগুলির কৌশল, সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলির প্রচার ইত্যাদি বিবিধ কারণে সাধারণ মুসলমান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিকতর ধর্মমুখীন তথা 'আইডেনটিটি' সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। ভোটের সময় ছাড়া রাজনীতি-সচেতন অথবা 'সমাজ-সচেতন' হিন্দুবাবুরা মুসলমানদের কথা ভুলে থাকতেই অভ্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রাজনৈতিক সামাজিক বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে মুসলমানরা অনুপস্থিত— একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। 'ভদ্রলোক মুসলমানরা' আছেন বিধানসভায় মন্ত্রী বা এম.এল.এ. হয়ে অথবা 'সেকুলার' পার্টির 'সংখ্যালঘু সেল'-এ— স্পষ্টতই রাজনৈতিক কৌশল, কারণ ভোটে জিততে হ'লে 'হিন্দু রাজনীতিকদের' 'মুসলমান গান্ধীবাদী' অথবা 'মুসলমান মার্ক্সবাদী'র প্রয়োজন হয়।

দেশবিভাগের পর গত শতকের 'নব জাগরণ' বা 'বঙ্গীয় রেনেসাঁস'-এর উত্তরসূরী হিন্দু-বঙ্গবাবুরা মার্কিন আর সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতির প্রভাবে 'আন্তর্জাতিক মানুষ' হয়ে উঠলেন, কিন্তু অন্তরে থাকলো হিন্দুয়ানীর কুসংস্কার; 'সেকুলার' রাষ্ট্রে হিন্দু-ভদ্রসম্প্রদায় হিন্দুয়ানী চরিতার্থ করার সব সুযোগই পেলেন। হিন্দুয়ানী অপমানিত হবার বা লাঞ্ছিত হবার কোনো ভয় আর থাকলো না অহিন্দুর আক্রমণে! ভারতের সমাজের মতো 'প্লুরাল সোসাইটিতে' সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বাভাবিক সুবিধার জন্য হিন্দুরা আপাতদৃষ্টিতে 'সেকুলার'। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুত্বের দাপট রাষ্ট্রের কর্ণধারদের আশীর্বাদপুষ্ট। 'গো-মাতা'র রক্ষাকর্তা বিনোবা ভাবের মৃত্যুতে তাই জাতীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত থাকে আর 'মার্ক্সবাদীরাও' এই পলিটিক্যাল সাধুটিকে 'দেশপ্রেমিক' অভিধায় অভিহিত ক'রে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অন্যদিকে অনেক মুসলমান এখনও নিজেকে 'প্রথমে মুসলমান, পরে ভারতীয়' হিসেবে ঘোষণা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।[৩] অনেকে পৃথক 'মুসলিম সংস্কৃতি' (যার সবচেয়ে স্পর্শকাতর দিক হোলো 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন'), উনিশ শতকের 'মুসলিম জাগরণ', বর্তমানের হিন্দু-মুসলমানের পৃথক অস্তিত্ব ইত্যাদি চিন্তায় আচ্ছন্ন। সঙ্কীর্ণ 'মুসলিম আইডেনটিটি' অটুট রাখতেই এঁরা আগ্রহী। পাশ্চাত্যের সেকুলার মতাদর্শ, যা আমাদের সমাজে প্রগতির শর্ত সৃষ্টি করতে পারে, এঁদের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এসবই সংবিধান ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ধর্মনিরপেক্ষতা বা 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি'র নীতি অনুমোদিত। 'সেকুলার' ভারতে তাই পরম ধর্মাচারী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বা শিখের দেখা সহজেই মেলে কিন্তু প্রকৃত অর্থে সেকুলার ভারতীয়র দেখা মেলে না বললেই চলে। সমাজ, রাজনীতি, বা সংস্কৃতিকে প্রকৃত

অর্থে সেকুলার করার ক্ষেত্রে, যার সূত্রপাত হ'তে পারে 'ডি-কমিউনালাইজেশন' বা 'নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ক্ষান্তিহীন প্রচার' মারফৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশেষ দায়িত্ব আছে। কিন্তু হিন্দুবঙ্গবাবুরা বাইরে অসাম্প্রদায়িক সাজলেও 'বঙ্গীয় রেনেসাঁস'-এর ধারা অনুসারী 'হিন্দু-আইডেনটিটিতে' সামান্য আঘাত লাগলেই গর্জন ক'রে ওঠেন, বিচলিত হয়ে ওঠেন। আমরা এরকম হট্টরব শুনেছি— 'আনন্দমঠ'-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে হিন্দুবাবুদের বিতর্কে।

সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা ঃ উৎস

উনিশ শতকের হিন্দুবঙ্গবাবুদের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ভগীরথ রামমোহন রায়ের রচনায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শ্বেত-বণিকরা বুঝেছিলেন এদেশে রাজ্যপাট বিস্তৃত করতে হ'লে ধনবান হিন্দু-সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রয়োজন। কারণ অভিজাত মুসলমান-সম্প্রদায় তখন ক্ষমতা হারানোর নিষ্ফলা ক্রোধ আর হতাশায় ইংরেজ-বিদ্বেষী অথবা নির্বোধ বিলাস আর ব্যভিচারে জীর্ণদশাগ্রস্ত, ক্ষয়িষ্ণু। কোম্পানি-শাসনের সূচনা থেকেই ট্র্যাডিশনাল অভিজাতশ্রেণীর ভাঙন শুরু হয়। —হিন্দু বা মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কেই একথা বলা চলে। এ সত্ত্বেও পলাশীর যুদ্ধ আর তার পরবর্তী ঘটনা ধনবান হিন্দুদের কাছে ছিল রাজাবদলের পালা। নতুন শক্তির পক্ষাবলম্বন করাই তাঁদের কাছে শ্রেয় মনে হয়েছিল, মহারাজা নন্দকুমার ব্যতিক্রম। কোম্পানির শাসনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থনৈতিক আর বিবিধ সামাজিক পরিবর্তন শুরু হয়, তার ফলে ভাগ্যান্বেষী বেণিয়া, মুৎসুদ্দি আর ফড়িয়াদের হাতে প্রচুর নগদ অর্থ সঞ্চিত হয়। এঁদেব অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণ হিন্দু। বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের হাতে নগদ অর্থ সঞ্চিত হ'তে পারেনি। ব্রিটিশ-অধিকৃত বাঙলায় উচ্চশ্রেণীর গণ্ডীতে সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বেণিয়ালী আর মুৎসুদ্দিগিরি ক'রে, প্রধানত বিভিন্ন জনবিরোধী কার্যকলাপ মারফৎ ধনবান হিন্দুরা শ্রেণী-পুনর্গঠনের যে সুযোগ পেলেন, নগদ অর্থের অভাবের ফলে মুসলমানরা তা থেকে বঞ্চিত হলেন।

অন্যদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর তার দেশীয় অনুচরদের বিরুদ্ধে অব্যাহত গণসংগ্রাম ছিল হিন্দু-মুসলমান কৃষক-কারীগরশ্রেণীর মিলিত শক্তির স্ফূরণ যার প্রথম প্রকাশ 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' (১৭৬৩-১৮০০)। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যে ইংরেজ ছিল ভীত উদ্বিগ্ন। তাই রাজ্য শাসনের তাগিদেই ইংরেজের প্রয়োজন হয়েছিল 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' বা 'ভাগ করো শাসন করো' নীতির। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত শ্রমজীবী হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অটুট ছিল। কিন্তু এর অনেক আগেই হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট হয় ব্রিটিশ। 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতির প্রথম ঘোষিত নিদর্শন পাওয়া যায় ১৮২১ সালে। ঐ বছর জনৈক ব্রিটিশ অফিসার 'এশিয়াটিক রিভিউ'-এ লেখেন, "রাজনৈতিক, সামাজিক, অথবা সামরিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি হওয়া উচিৎ 'ভাগ করো শাসন করো'।"[৪]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শোষণ-লুণ্ঠনের প্রথমদিকে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শ্রেণী-স্বার্থগত-ঐক্য ছাড়াও ধর্মীয় আচার আচরণ বিশ্বাস আর সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক সাদৃশ্য ছিল। ভারতের বা বাঙলার সাধারণ মুসলমানের ইসলামবোধ আর শ্রমজীবী হিন্দুর ধর্মবোধ

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে অনেক ক্ষেত্রেই মিলেমিশে প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেও এর কোনো কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্যই ইংরেজের প্রয়োজন হয়েছিল 'যুক্তিসম্মত' এক ঐতিহাসিক পটভূমি, যার চিন্তা ক্রমশ সমাজের নিচুস্তরেও প্রবেশ করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উদ্ভূত নতুন জমিদার ও উচ্চবিত্তশ্রেণীর মুখপাত্র ছিলেন রামমোহন রায়। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন ছিল নিছক লুণ্ঠন; বাঙলার লুণ্ঠিত সম্পদের ফলেই ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হয়।[৫] রাজা রামমোহন এই শাসনকে শুধু স্বাগতই জানাননি, ইংরেজ বাণিয়াকে 'পিতা' ও 'রক্ষাকর্তা' রূপে বরণ ক'রে ছিলেন। রামমোহনের দৃষ্টিতে বাণিয়ার এই শাসন ছিল বিধাতার আশীর্বাদ; ইংরেজ ছিল ধর্মের রক্ষক। তাঁর মতে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলা-বিহারের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করার আগে অর্থাৎ 'মুসলমান শাসন'-এর আমলে মুসলমানের অত্যাচারে ও নিপীড়নে হিন্দুর ধর্ম পদদলিত হয়েছে, বিশেষত দৈহিক দুর্বলতার জন্য বাঙালির রক্তপাত ঘটেছে বারবার, বাঙালির ধর্ম লাঞ্ছিত হয়েছে, তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে যদিও তারা বরাবরই রাজানুগত ছিল। অবশেষে বিধাতার অনুগ্রহে ইংরেজ জাতি বাঙালিকে এই অত্যাচারের জোয়াল থেকে মুক্ত ক'রে [আপন স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছে]।[৬]

রামমোহন প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে 'অসহায় হিন্দুর' ওপর মুসলমানের অত্যাচারের এই ইতিহাস প্রচার করেন ১৮২৩ সালে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতির প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণার মাত্র দু'বছর পর রামমোহনের এই ইতিহাসচর্চা তাৎপর্যপূর্ণ! ধূর্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্য রামমোহনের এই ইতিহাসচর্চাকে সাদরে বরণ ক'রে নেয়।

সম্ভবত রামমোহনই প্রথম বাঙলা তথা ভারতের রেনেসাঁসের কথা চিন্তা করেন। আলেকজাণ্ডার ডাফকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন যে, ইউরোপীয়ান রেনেসাঁসের মতো এখানেও কোনো [আন্দোলন] ঘটতে পারে।[৭] রামমোহন এবং পরবর্তীকালে বহু বিশিষ্ট মানুষের দৃষ্টিতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবিস্তারের ফলেই এদেশে আধুনিকতা আর 'নবজাগরণ'-এর উদ্ভব; ইংরেজই এখানে ন্যায়বিচার আর শান্তির রাজ্য স্থাপন করে। তাই গত শতকের 'নবজাগরণ' প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন— সার্বিক শান্তি স্থাপন আর সমাজের আধুনিকীকরণের পর ইংরেজের মহত্তম অবদান হোলো রেনেসাঁস, যা ঐ দু'টি ঘটনার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি, রেনেসাঁস উনিশ শতকের বৈশিষ্ট্য চিহ্ন; আধুনিক ভারত তার সমস্ত কিছুর জন্যই 'রেনেসাঁস'-এর কাছে ঋণী![৮] নীলকরের 'ওকালতি'[৯] করার জন্য যিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন সেই আচার্য যদুনাথ ব্রিটিশ-শাসন তথা 'রেনেসাঁস' সম্পর্কে উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কয়েক বছর পর। এ অন্য প্রসঙ্গ, আমাদের বক্তব্য হোলো স্যার যদুনাথের ভাষায় 'ইংরেজ বাণিয়া প্রতিষ্ঠিত' সার্বিক শান্তির অর্থ উচ্চবর্ণ উচ্চবিত্ত হিন্দুবঙ্গ-সম্প্রদায়ের শান্তি— আর এই 'শান্তি' তাঁদের প্রভুভক্তির পুরস্কার মাত্র! ব্রিটিশ বাণিয়া স্থাপিত 'সার্বিক শান্তির' সারমর্ম বুঝেছিলেন বঙ্গীয় 'রেনেসাঁস'-এর প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন, বুঝেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদপুষ্ট ভূঁইফোড় হিন্দুবঙ্গবাবু-সম্প্রদায়।[১০] এই বাবু

সম্প্রদায়ের কাছে ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের শাসনব্যবস্থার থেকে ইংরেজ শাসন অনেক বেশি অভিপ্রেত ছিল, তার কারণ ইহজগতে উন্নতির বিশেষ সুবিধা, কৃষক-শোষণের স্থায়ী অধিকার; আর এঁদের স্বার্থপ্রসূত ধারণা ছিল "ইংরেজ রাজ্যে প্রজা [অর্থাৎ ধনবান উচ্চবর্ণ হিন্দুবাবু-সম্প্রদায়] সুখী হইবে। নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে।" ঋষি বঙ্কিমের এই উক্তি রামমোহনের ইতিহাসচর্চার ফলশ্রুতি।

আমরা আগেই বলেছি, 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতি প্রয়োগ করার জন্য ইংরেজের এক 'যুক্তিসম্মত' ঐতিহাসিক পটভূমিকার প্রয়োজন ছিল। রামমোহন তাঁর ইতিহাসচর্চায় ব্রিটিশকে ধর্মের রক্ষক আর ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের মুসলমান-শাসকদের হিন্দুর শত্রু সাজিয়ে ব্রিটিশকে 'ভেদনীতি' প্রয়োগ করার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে 'অসহায়' হিন্দু-প্রজার ওপর মুসলমান-শাসকের 'নির্মম অসহনীয় অত্যাচারের' বর্ণনা পরবর্তীকালের ইংরেজ ও দেশীয় ঐতিহাসিকদের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক এলিয়ট-এর মতে— মধ্যযুগের ভারতে হিন্দুর ধর্ম, প্রাণ, সম্পদ, নারী এসবই ছিল নির্মম অত্যাচারের শিকার; হিন্দুর এই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটে ইংরেজের রাজ্য প্রতিষ্ঠায়। তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, তাঁর ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ-শাসনের বহুবিধ সুফল সম্পর্কে [হিন্দু] প্রজাদের অবহিত করা আর বাগাড়ম্বরী বাবুদের দেশপ্রেম সম্পর্কিত হৈচৈ ঠাণ্ডা করা। অধ্যাপক ইরফান হাবিব বলেছেন— ব্রিটিশ-ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য ছিল এমন এক ইতিহাস ব্যাখ্যা যেখানে ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের সমস্ত [মুসলমান] শাসকই ছিলেন নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, অসহিষ্ণু; চিরকালই হিন্দু আর মুসলমান ছিল বিরুদ্ধভাবাপন্ন, আর এ কারণেই দয়ালু ইংবেজের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।[১১]

আমরা দেখতে পাচ্ছি রামমোহনের ইতিহাসচর্চার সঙ্গে ব্রিটিশ-ঐতিহাসিকদের ইতিহাস চর্চায় বিশেষ কোনো তফাৎ নেই।— আজও হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, একমাত্র আকবর আর দারাশিকো ছাড়া প্রতিটি মুসলমান-শাসকই ছিলেন এক-একটি বিভীষিকা। মুসলমান-কর্তৃক হিন্দুর নারীহরণ, মন্দির ধ্বংস. হত্যাকাণ্ড, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ইত্যাদি ছিল মধ্যযুগের নিত্যদিনের ঘটনা। উনিশ শতকে 'হিন্দু আইডেনটিটি' তথা 'রাজনৈতিক হিন্দুত্ব' গ'ড়ে ওঠার পেছনে এই চিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বামমোহনই এই চিন্তার জনক। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ও হিন্দুবাবুদের মননে তার প্রকাশ দেখা যায়।

মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে অতীত ও বর্তমানের হিন্দু-সাম্প্রদায়িকদের বক্তব্য রামমোহন তথা ব্রিটিশ-ঐতিহাসিকদের ইতিহাসচর্চার প্রতিধ্বনি। এঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের সমাজেই 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' বীজ উপ্ত ছিল। অর্থাৎ মধ্যযুগের ইতিহাস হিন্দুপ্রজার ওপর মুসলমান-রাজশক্তির স্থায়ী অত্যাচারের ইতিহাস। অপরদিকে মহম্মদ আলি জিন্না, 'জনৈক পাঞ্জাবী' (A Pubjabi) প্রমুখ পাকিস্তানওয়ালারাও দ্বি-জাতি তত্ত্বের উৎস খুঁজেছিলেন ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতে। কিছুদিন আগে 'আলট্রা সেকুলার' দেশভক্ত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মহাশয় 'রামমোহন এবং ইসলাম' প্রবন্ধে[১২] হিন্দু-সাম্প্রদায়িকদের বক্তব্যই প্রকারান্তরে হাজির করেছেন।

বর্তমান ক্ষেত্রে মধ্যযুগের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ নেই। সংক্ষেপে বলা যায়— হিন্দু নরপতি, সেনাপতি, সৈন্য ইত্যাদির সহযোগিতা ছাড়া মুসলমান-শাসকদের

পক্ষে হিন্দুর দেশে সাম্রাজ্যবিস্তার আর প্রশাসনের কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর 'India Divided' গ্রন্থে বহু তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানে কোনো বিরোধ ছিল না। 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' সম্পূর্ণভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতির সৃষ্টি। তাঁর মতে— কয়েকজন ধর্মোন্মাদ ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান-বিজয়ীরই হিন্দু [প্রজার] সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার প্রচেষ্টাই ছিল।[১৩]

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় রামমোহন রায় মধ্যযুগের যে ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন তা বিকৃত ইতিহাস, একপেশে ইতিহাস। এই ইতিহাস বাঙলার বহু বিজ্ঞাপিত 'রেনেসাঁস'কে প্রভাবিত করে। ফলে বাঙলার 'রেনেসাঁস' উচ্চবর্ণ হিন্দু-বঙ্গবাবুদের কৃষক-বিরোধী সামাজিক-অর্থনৈতিক (স্বার্থের) আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিই হয়ে থাকলো, সমানভাবে হিন্দু-মুসলমান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর 'রেনেসাঁস' হ'তে পারলো না— সমগ্র জাতির জাগরণ হওয়া তো দূরের কথা। আমরা আগেই বলেছি— প্রধানত ইংরেজ-বণিকের শোষণ-লুণ্ঠনের অংশীদারী ক'রে আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতেই ভুঁইফোড় ধনী হিন্দুরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাই শ্রেণীস্বার্থগত কারণেই হিন্দু-মুসলমান কৃষকের বিদ্রোহ বা আন্দোলনের প্রতি এঁরা ছিলেন খড়্গহস্ত, অশোক মিত্রের কথায় কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষার 'চরম শত্রু'।[১৪] কৃষক-বিরোধিতার ক্ষেত্রে এঁরা ছিলেন একেবারেই অসাম্প্রদায়িক! বাঙলাদেশের এই নতুন এলিটশ্রেণী প্রাণরস আহরণ করতেন ভূসম্পত্তি থেকে, এঁরা পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় কথা বলতেন, আর আমলাতন্ত্রের উঁচুপদগুলি দখল করার জন্য হাঁ ক'রে থাকতেন।[১৫] এঁরাই ছিলেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক।

আমলাতন্ত্রের উঁচুপদগুলি দখল করার প্রতিযোগিতায় মুসলমান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী পিছিয়ে পড়েন, কারণ ইংরেজি শিক্ষার অভাব আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামী। বাঙলার শোষিত-কৃষকশ্রেণীর এক বিপুল অংশ ছিলেন মুসলমান। তাই পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক মুসলমান-নেতারা হিন্দু-জমিদারের বিরুদ্ধে সহজেই মুসলমান-কৃষকদের দলে টানতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'আলোকপ্রাপ্ত' হিন্দু-বঙ্গবাবুদের মানসজগতে একদিকে ছিল হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে কৃষকশ্রেণীর প্রতি বিরূপ মনোভাব, রামমোহনের ইতিহাসচর্চার প্রভাবে ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের শাসকদের প্রতি তথা মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ, আর ইংরেজের প্রতি মোহমিশ্রিত শ্রদ্ধা। তাই এঁরা যে খণ্ডিত জাতীয় চেতনা গ'ড়ে তোলেন তাতে অনিবার্যভাবেই হিন্দুত্বের রঙ মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এর আর এক কারণ ছিল ঔপনিবেশিকতার পথে আমদানী করা 'খৃষ্টানিজম'-এর উৎকট বাড়াবাড়ি আর 'নেটিভদের' ওপর 'আধ্যাত্মিক প্রভুত্ব' স্থাপনের জন্য সরকারী সাহায্য পুষ্ট মিশনারী পাদ্রীদের নির্লজ্জ প্রয়াস। রামমোহন 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করলেও উচ্চবিত্ত-উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মদের 'শুষ্ক মস্তিষ্কচর্চা' বস্তুত মুষ্টিমেয় মানুষকেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উদ্ভূত বঙ্গসমাজের ব্যাপক হিন্দুর কাছে এর আবেদন পৌঁছোতে পারেনি। তাই হিন্দুবঙ্গবাবু-সম্প্রদায় জাতীয়-চেতনার উৎস খুঁজতে দৃষ্টি ফেরান মুসলমান-পূর্ব যুগে, প্রাচীন ভারতে, 'গৌরবময়' ভারতে। দেশের ব্যাপক ক্ষুধার্ত জনসাধারণ এই 'চেতনা'র অংশীদার ছিলেন না।

ইহজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য ইংরেজের প্রসাদ যে একান্তই অপরিহার্য একথা উচ্চ

ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানরা বোঝেন একটু দেরিতে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ নিষ্ঠুরভাবে ১৮৫৭-র স্বাধীনতার যুদ্ধ দমন করলেও স্বস্তি পায়নি। এই যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের দৃঢ় ঐক্য ইংরেজকে শঙ্কিত করে। ইংরেজও তাই 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতি প্রয়োগ করার জন্য অনেক বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। ইংরেজের প্রসাদেই উত্তর ভারতে আবির্ভূত হন সৈয়দ আহ্‌মদ খান। ১৮৬৭ সালে তিনি ঘোষণা করেন, "হিন্দু ও মুসলমানের 'একজাতি' হিসেবে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব।" ১৮৮২ সালে আরও স্পষ্টভাবে সৈয়দ তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, "ইসলাম-ধর্মাবলম্বী সমস্ত মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।" বাঙলাদেশে শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের প্রতিনিধি আবদুল লতিফ ধনী ও শিক্ষিত মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাঁদের উন্নতিকল্পে ১৮৬৩ সালে 'Muhammedan Literary and Scientific Society' প্রতিষ্ঠা করেন। আবদুল লতিফের আমন্ত্রণে স্যার সৈয়দ এই সোসাইটিতে বক্তৃতা ক'রে যান। এ প্রসঙ্গে আমীর আলি প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৭) 'National Mohammedan Association'-এর কথাও উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতকের ছয়ের দশক থেকে এক স্বতন্ত্র মুসলমান 'আইডেনটিটি' পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ এ সময় থেকে উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল 'হিন্দু আইডেনটিটি'র প্রতিপক্ষ হিসেবে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমান-সম্প্রদায়কে দাঁড় করানো। ইংরেজের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির পবিচয় পাওয়া যায় ১৮৭৯ সালে লর্ড মেয়োর নির্দেশে W.W. Hunter-এর 'The Indian Musalmans'[১৬] গ্রন্থের প্রকাশে। হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্ক কলুষিত করার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাণ্টার এই গ্রন্থে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত মুসলমান-সম্প্রদায়ের দুর্গতির জন্য বহু অশ্রু বিসর্জন করেন এবং মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে দাঁড়িয়ে হিন্দু-সম্প্রদায়কে 'ঘৃণিত হিন্দু' রূপে বর্ণনা করেন। উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক সম্পর্ক পরবর্তীকালে আর স্বাভাবিক হয়নি!

'আনন্দমঠ'

১৮৮২ সালে 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হবার সমসাময়িক যুগে হিন্দু-মুসলমান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মননে-চেতনায় ব্রিটিশের কৌশলেই সাম্প্রদায়িকতার জগদ্দল পাথরটি চেপে বসে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিৎ, উভয় সম্প্রদায়ের ভদ্রবাবুদের মধ্যে রেষারেষি থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতিই ছিল। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের আগে বাঙলা তথা ভারতের সমাজজীবনে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কল্পনা সম্ভবত বঙ্কিম-চিন্তাতেই প্রথম স্থান পায়।

উনিশ শতকে নবজাগরণের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এক প্রধান পুরুষ। পশ্চিমের রাজনীতি ও দর্শনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। প্রথম জীবনে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্যের চিন্তায় দীক্ষায়। জন্মগত বৈশিষ্ট্যের ফলেই উনিশ শতকের শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায়ের অন্যতম পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজকে 'পরমোকারী' ব'লে ভেবেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন— "ইংরাজেরা বাঙ্গালাদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" পরবর্তী জীবনে বঙ্কিম

আশ্রয় করেন 'গীতা' এবং 'মহাভারত'। একদিকে ইংরেজের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা, অপরদিকে 'গীতা'র নিষ্কাম কর্মবাদে আন্তরিক বিশ্বাস; একদিকে পরাধীনতার গ্লানি— যদিও স্বাধীনতার পাঠগ্রহণ করেছিলেন ইংরেজের 'চিত্তভাণ্ডার' থেকে, দেশের আপস-বিমুখ সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সশস্ত্র সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থেকে নয়, অপরদিকে 'দীক্ষাগুরু' ইংরেজের প্রতি প্রবল আনুগত্য; একদিকে ইউরোপীয় প্রেরণাপুষ্ট জাতীয় চেতনা— যদিও এই চেতনা বাস্তবিক অর্থে কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয়নি, অপরদিকে মুসলমান-বিদ্বেষপ্রসূত স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন; একদিকে শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী ইংল্যাণ্ডের সর্বস্তরে বিপুল সমারোহের প্রতি এক বিনম্র শ্রদ্ধা এবং মোহ, অন্যদিকে সমসাময়িক আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা অথচ দেশের লক্ষ কোটি কৃষক কারিগর তথা সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক সহজাত বিচ্ছিন্নতা; এই বিভিন্নতা, বিপরীতমুখী বিবিধ চেতনা, বিভ্রান্তি এবং দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তৎকালীন অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর চিত্তভূমিও আলোড়িত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে এর প্রাবল্য অধিকতর, কারণ সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে তাঁর যুগে তাঁর মতো তীক্ষ্ণ মেধা ব্যক্তিত্ব আর সৃজনপ্রতিভা বিরল দৃষ্ট।

'আনন্দমঠ'-এর মূল ভিত্তি সম্পর্কে ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত 'দেবী চৌধুরাণী'র ভূমিকায় বঙ্কিম লিখেছেন, "আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি-না। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সেকথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব।" বঙ্কিমের মতো আরও অনেকেই 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'-এর প্রকৃত ইতিহাস পাঠককে "জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব" বোধ করেছেন। আচার্য যদুনাথ বলেছেন, "সত্যকার সন্ন্যাসী-ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমের গিরিপুরীর দল একেবারে লুঠেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারীও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুযাশা মাত্র।"[১৭] 'আনন্দমঠ'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত বঙ্কিম স্বয়ং এই উপন্যাসের মূল ভিত্তি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট মন্তব্য করেননি। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছিলেন, "এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।" তৃতীয় সংস্করণে তিনি Gleig-এর 'Memoirs of Warren Hastings' এবং W. W. Hunter-এর 'Annals of Rural Bengal' থেকে কিছু অংশ 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'-এর প্রামাণ্য ইতিহাস হিসেবে জুড়ে দেন। তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হবার আগে 'দেবী চৌধুরানী'র বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছিলেন, "ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই।" আর "উপন্যাস উপন্যাসই— ইতিহাস নহে।" সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনার খাতিরে ব্রিটিশ-শাসনাধীন বিদ্রোহী-ভারতের প্রথম আত্মপ্রকাশের ইতিহাস বিকৃত ক'রে সাহিত্যজগতে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সামাজিক আন্দোলনের অনুমোদক' ছিলেন না, তাই স্বদেশী-বিদেশী অত্যাচারী লুণ্ঠনকারীর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান কৃষক-কারিগরের মিলিত সংগ্রামকে তাঁর আত্মপীড়ন ব'লে মনে হয়েছিল। আর এ ধারণার বশবর্তী হয়েই "ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে। নিষ্কণ্টকে

ধর্মাচরণ করিবে....'' এই বিশ্বাস নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীকে ত্রাণকর্তা রূপে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এ লড়াইয়ে দু'টি পরস্পরবিরোধী শিবিরের শ্রেণীগত পরিচয় গৌণ, শোষক আর শোষিতের শ্রেণীগত পরিচয় বড় না হয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত পরিচয়ই প্রধান হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সন্তান দল'-এর সদস্যরা সকলেই উচ্চবর্ণের হিন্দু, নবাব তথা শোষকের প্রধান পরিচয়, 'মুসলমান'— হিন্দু-জনসাধারণের ধর্মাচরণের যে বা যারা বাধা সৃষ্টি করেছে এবং এ বাধা অপসারণের জন্য লড়াই করেছেন শুধুমাত্র বর্ণহিন্দুরাই, ''চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, বুনো'' প্রভৃতিদের সাধারণ লুঠেরা হিসেবেই বর্ণনা করেছেন তিনি।

প্রকৃতপক্ষে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' ছিল কৃষক-কারিগর তথা সাধারণ মানুষের সংগ্রাম, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'সন্তান দল' লড়াই করেছেন মূলত 'নেশাখোর দেড়েদের' তাড়াবার জন্য। বিদ্রোহের নেতা সত্যানন্দ 'সন্তানদের' উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, ''আমরা রাজ্য চাহি না কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।'' বিদ্রোহের স্বরূপ চিত্রিত করতে গিয়ে বঙ্কিম লেখেন, ''তারপর তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিলো, চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দ্যাখে, বলে— 'ভাই বিষ্ণুপূজা করবি?' এই বলিয়া ২০/২৫ জন জড় করিয়া মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়....'' ইত্যাদি। অথবা, ''যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দগ্ধ করিয়া ভগ্নাবশেষ করে।'' সন্তানবিদ্রোহের 'গণসমর্থন' সম্পর্কে বঙ্কিম লেখেন, ''লোকে দেখিলো, সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ, মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। মুসলমানের 'অশাসন'-এর প্রতি হিন্দু-প্রজার এই বিদ্বেষ রামমোহনের ইতিহাসচর্চার উপন্যাসরূপ ব'লে মনে হয়।

বিশ শতকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে অনেক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণ ছিল, কিন্তু দূবদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিম বহু আগেই এই দাঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন, 'উপন্যাস' রচনার খাতিরে! ''....গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ.... দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিলো। অনেক যবন নিহত হইলো, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া, গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে লাগিলো। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিলো, 'মুই হেঁদু।'....''

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিৎ— মহান ইংরেজের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত অপর এক ভারতীয় প্রায় সমসাময়িককালেই স্বপ্ন দেখেছিলেন— ইংরেজের অনুপস্থিতিতে উত্তর সীমান্ত থেকে বাঙলা অবধি রক্তের নদী বয়ে যাবে— তাঁর নাম স্যার সৈয়দ আহ্মদ খান।[১৮] বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর 'স্বপ্নের' তফাৎ— মুসলমানের 'বীরত্ব' আর হিন্দুর 'ভীরুতা'। বঙ্কিমের 'স্বপ্নে'— ''ইংরেজ এক্ষণে বণিক— অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না....''। আর সৈয়দ আহ্মদের 'স্বপ্নে' ভবিষ্যতে মহান ইংরেজের অনুপস্থিতির আশঙ্কা। অর্থাৎ দু'জনের চিন্তাতেই ভারতীয় উপমহাদেশে কাল্পনিক সাম্প্রদায়িক অশান্তির প্রতিষেধক মহান ইংরেজের শাসন। আমরা সকলেই জানি, পরবর্তীকালে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছিল— কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভার রাজনীতি আর কম্যুনিস্ট পার্টির স্তালিনের তত্ত্বের বদহজম-জনিত প্রতিক্রিয়ার ফলে পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, এ সবই ছিল এর জন্য দায়ী; ইংরেজের শাসন তখন

বর্তমান। "ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে...." ঋষি বঙ্কিম এ স্বপ্ন দেখলেও এ যুগেও প্রজার সুখ জোটেনি।

'আনন্দমঠ'-এর 'সন্তান দল' দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালালেও তাঁদের চূড়ান্ত বাসনা হোলো "ভাই, এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িবো?" মাঝে মাঝে কখনো কখনো কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে সন্তানেরা যে যুদ্ধ করেননি, তা নয়— কিন্তু "ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্য আসিয়াছিল সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই....", সুতরাং অবুঝ 'সন্তানেরা' নিতান্তই ঘটনাচক্রে দু'একজন ইংরেজকে মেরে ফেলেছেন। উপন্যাসের পরিণতিপর্বে চূড়ান্ত যুদ্ধে জয়ী হবার পরও বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রোহীদের পাঠালেন তীর্থদর্শনে আর বিদ্রোহী নায়ককে টেনে নিয়ে গেলেন নিষ্কাম কর্ম আর শুদ্ধাভক্তির জগতে। সত্যানন্দ আর চিকিৎসকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রোহের কারণ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করলেন। বিদ্রোহী নায়ক সত্যানন্দকে চিকিৎসক বোঝালেন, "তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোনো কার্য নাই.... এখন ইংরাজ রাজা হইবে।" বিদ্রোহীদের সমস্ত কার্যকলাপ নস্যাত ক'রে চিকিৎসক বললেন, "সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছো, পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশউদ্ধার করিতে পারিবে না.... ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই.... যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ-রাজ্য অক্ষয় থাকিবে, ইংরেজ-রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে। নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে।" আত্মত্যাগ এবং রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যে বিদ্রোহের সূচনা এবং পরিণতি, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাপ্তিতে তার চরম সাফল্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর রাজ্য প্রতিষ্ঠায়; বিদ্রোহের সাফল্য সম্পর্কে মহাপুরুষের মন্তব্য— "ব্রত সফল হইয়াছে— মা'র মঙ্গল সাধন করিয়াছো— ইংরেজ-রাজ্য স্থাপন করিয়াছো।" স্বদেশ ইংরেজ-কবলিত হবে শুনে দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী ক্ষুব্ধ হয়েছেন, "শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিবো।" বঙ্কিম এবার সমস্ত সমস্যার এক চমৎকার সমাধান ক'রে দিলেন, "শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরাজ মিত্র রাজা...." এরপর "জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে" এবং শেষে "বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।" সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহের এমন করুণ পরিণতির চেয়ে প্রথম সংস্করণের সমাপ্তি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, "বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইলো, তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিলো। নিবিলো না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিলো না। পারি তো সেকথা পবে বলিবো।" 'আনন্দমঠ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এই অংশটুকু বর্জন করা হয়!

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আলোচ্য সৃষ্টিতে ব্রিটিশ-শাসনাধীন ভারতের প্রথম ব্যাপক গণবিদ্রোহের ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে, তার মূল আদর্শ ও লক্ষ্যকে বিকৃত রূপ দান ক'রে, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারীকে স্বদেশভূমির মিত্র সাজিয়ে 'উপন্যাস' শেষ করলেন। যে বিদ্রোহে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান— বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও তার ক্রীড়নক নবাবকে উৎখাত করার জন্য মরণপণ সংগ্রাম চালিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকে জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশপ্রেমের নামে ধর্মতত্ত্ব সাম্প্রদায়িকতা আর ইংরেজভক্তির মিশ্রিত চিন্তাধারা দিয়ে গেলেন।

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' প্রকৃত ইতিহাস আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। এ সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থটির কোনো বিকল্প নেই। এ সত্ত্বেও এখানে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' ছিল কৃষক-কারিগরশ্রেণীর বিদ্রোহ। সর্বপ্রথম ক্লাইভ এঁদের 'ফকির' নামে অভিহিত করেন। এরপর হেস্টিংস তথা অন্যান্য ইংরেজনন্দন আর আচার্য যদুনাথের মতো ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করেন যে, বিদ্রোহীরা আসলে বহিরাগত দস্যু, লুটেরা-সন্ন্যাসী-ফকির। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ব্যাপী এই 'দস্যুতার' প্রকৃত চরিত্র উদঘাটিত হয়েছে শাসকদের মন্তব্য থেকেই— এই দস্যুরা ইংল্যাণ্ডের দস্যুদের মতো নয় যারা অভাবের তাড়নায় এই পথে যায়, এরা পেশাগতভাবে এমন-কি জন্মগতভাবে দস্যু, এরা স্থায়ী বাহিনী রূপে সংগঠিত।[১৯] 'কোম্পানি সরকার'-এর 'Secret Department'-এর একটি চিঠি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়— সেদিন যাঁরা সন্ন্যাসী ও ফকির নামে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা উদ্দেশ্য নিয়েই এই বেশ ধারণ করেছিলেন— একদল আইনভঙ্গকারী দস্যু সন্ন্যাসী অথবা ফকিরের ছদ্মবেশে দীর্ঘকাল এই রাজ্যে উৎপাত করেছেন এবং তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে বাঙলার প্রধান প্রধান অংশে ঘুরে বেড়িয়েছেন।[২০] ইংরেজ-সৃষ্ট 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর[২১] পর তথাকথিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের সঙ্গে ক্ষুধার্ত কৃষকরা বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন।[২২]

অত্যাচারী হেস্টিংস বলেন— সন্ন্যাসী-ফকিরদের প্রতি গ্রাম্য জনসাধারণের ছিল মোহ এবং শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, সেই কারণেই জনসাধারণের 'ত্রাণকর্তা' 'কোম্পানি সরকার' বিদ্রোহ দমনের কাজে তাঁদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পায়নি.... কঠোর আদেশ জারি করা সত্ত্বেও [জনসাধারণের] এই মোহগ্রস্ততার জন্য বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে কোনো খবর বা তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো সাহায্য সরকার পাচ্ছে না....।[২৩] হেস্টিংস সাহেবের এই খেদোক্তি থেকেই বোঝা যায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহীরা ছিলেন দেশীয় কৃষক— এবং এঁদের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

তথাকথিত 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে' হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অটুট ছিল। হিন্দু ও মুসলমান 'লুণ্ঠনকারীদের' সঙ্ঘবদ্ধতায় আতঙ্কিত হয়ে মিস্টার লজ নামক এক ইংরেজনন্দন লেখেন, যেহেতু উভয় দলের উদ্দেশ্যই লুণ্ঠন তাই আমি এই ব্যাপারে তাদের ঐক্যের আশঙ্কা করছি।[২৪] এই বীরপুঙ্গবের দূরদৃষ্টি তারিফ ক'রে আমাদের দেশের এক লেখক বলেছেন— লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমান সন্ন্যাসীদের [অর্থাৎ ফকিরদের] ঐক্যের আশঙ্কা মিস্টার লজের পক্ষে খুবই সঠিক ছিল।[২৫]

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' অস্ফুট রাজনৈতিক বাসনার পরিচয় পাওয়া যায় কিংবদন্তীতে। কিংবদন্তী অনুসারে ঢাকার 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহীরা' 'ওঁ বন্দেমাতরম' রণধ্বনি করতেন।[২৬]

প্রচলিত ইতিহাসে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহীদের বহিরাগত দস্যু রূপে প্রচার করলেও জনমানসে এঁদের জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতা ছিল। বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার 'সন্ন্যাসী হাট' অঞ্চলে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' অন্যতম নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর মূর্তি ও মন্দির এই দেশপ্রেমিক বীরদের অম্লান স্মৃতি রক্ষা করছে[২৭] আর বিদ্রূপ করছে ইতিহাসের ইচ্ছাপ্রণোদিত

বিকৃতিকে। বঙ্কিমের উপন্যাসে 'দেবী চৌধুরাণী' বাস্তবের ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর বিকৃতি মাত্র। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' অন্যতম নেতা ভবানী পাঠক ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।[২৮]

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' বহুবিধ দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছর বিদ্রোহেব আগুন জ্বালিয়ে রাখেন। অবশেষে উন্নততর অস্ত্র, অসংখ্য সৈন্য, আর দেশীয় অনুচরদের সাহায্যে ইংরেজ এই বিদ্রোহ 'দমন' করতে সক্ষম হ'লেও অসংখ্য অজ্ঞাতপরিচয় শহিদ ভারতবর্ষে যে আগুন প্রজ্বলিত করেন সে আগুন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ কোনোদিন নেভাতে পারেনি; ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এমন কোনো সময় ছিল না যখন ভারতবর্ষের কোনো না কোনো অংশ [র জনসাধারণ] অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে স্বাধীনতা আঁকড়ে ধরেননি আর স্বাধীনতার জন্য [ইংরেজের বিরুদ্ধে] সংগ্রাম করেননি।[২৯] 'সন্ন্যাসী-ফকির' বিদ্রোহ এই অব্যাহত গণসংগ্রামেরই অগ্রদূত!

মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কথা ছেড়ে দিলে উনিশ শতকের অধিকাংশ বঙ্গবাবুই কৃষকবিদ্রোহ বা গণআন্দোলনের প্রতি বিরূপ ছিলেন। 'সাম্য'-এর লেখক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেণী-চরিত্রগত কারণেই 'নীলদর্পণ' নাটকটির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন, পরে অবশ্য তিনি মত পরিবর্তন করেন। পাবনার কৃষকবিদ্রোহ ও 'জমিদার দর্পণ' নাটকটির বিরুদ্ধ-প্রচারেও তিনি সরব হয়েছিলেন। সুতরাং 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' প্রতিও যে তিনি বঙ্কিমদৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর মুসলমান-বিদ্বেষ। এরই ফসল 'আনন্দমঠ'। এই উপন্যাসে বঙ্কিম তাঁর 'কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা'য় গণবিদ্রোহের ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে বাংলাসাহিত্যের জগতে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে গেলেন।

সমান্তরাল সংস্কৃতি

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমসাময়িক এবং পরবর্তী যুগে অনেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত-এর নাম অবশ্যউল্লেখ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সরব না হ'লেও রমেশচন্দ্র মধ্যযুগের হিন্দু-বীরচরিত্র অবলম্বনে কাহিনী রচনা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল— "আমাদের অতীতের গৌরব আর আমাদের জাতীয় বীরদের মহত্ত্ব অঙ্কিত করা।[৩০] রমেশচন্দ্র সংস্কৃত-শাস্ত্র অনুবাদের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। এই অনুবাদের ব্যাপারটিও তাঁর কাছে রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক কাজই ছিল; ধর্মীয় নয়। তিনি বিশেষভাবে হিন্দুছাত্রদের জন্য কিছু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের হিন্দু-ঘেঁষা মনোভাব তৈরি করা।[৩১]

অন্যদিকে সদাশয় ইংরেজ ১৮৭১ সালে মুসলমান ছাত্রদের জন্য এক পৃথক শিক্ষানীতি চালু করে। এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ছিল আরবী ও ফারসী ঘেঁষা পৃথক 'মুসলিম সাহিত্যের' বিকাশ সাধন। মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়, মুসলমান শিক্ষক, ও ধর্মশিক্ষা—শৈশব থেকেই মুসলমান ছাত্রদের মানসজগতে বিচ্ছিন্নতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ইংরেজের মহানুভবতায় মুসলমান-এলিটসম্প্রদায় তখন মুগ্ধ।

সমসাময়িককাল থেকে বাঙলা তথা ভারতে সমান্তরাল দুই সংস্কৃতির ধারা ক্রমশই ব্যাপ্তি

আর বিস্তার লাভ করতে শুরু করে এবং বিশ শতকে এসে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তিক্ততর রূপ ধারণ করে।

পরবর্তীকালে হিন্দু-বঙ্গবাবুদের বুদ্ধি এবং মনন সাম্প্রদায়িক চিন্তায় এতদূর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে বাঙলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়েও পরে স্থানভ্রষ্ট হয়। এর কারণ, তৎকালের হর্তাকর্তাবিধাতাদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "....'মহেশ' নামে আমার লেখা একটা ছোটগল্প আছে.... একদিন শুনতে পেলাম গল্পটি Matric-এর পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে; আবার একদিন কানে এলো সেটি স্থানভ্রষ্ট হয়েছে.... কিন্তু বহুদিন পরে.... কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে না-কি গো-হত্যা আছে! অহো! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের বহু টাকা মাইনের কর্তামশায় এ অনাচার সইবেন কী ক'রে?....

শুনেছি না-কি আমার 'রামের সুমতি' গল্পের খানিকটা দিয়েছেন। অত্যন্ত দয়া, বোধ করি এর থেকে রামেদের সুমতি হবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, দেশে রহিমরাও আছে।"[৩২] রামমোহন রায়ের 'রক্ষাকর্তা', 'ধর্মের রক্ষক' ইংরেজবাহাদুরের সৃষ্ট 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' উদ্ভুত বঙ্গসমাজের বিধাতারা কৃষক (মুসলমানও বটে) ক্ষ্যাপানো গল্প 'মহেশ' সইবেন কী ক'রে?

অন্যদিকে মহামহিম ইংরেজের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত মুসলমান-ভদ্রবাবুদের প্রচারে মুসলমানের দৃষ্টি অনুসরণ করলো ধর্মীয় গোঁড়ামী-মিশ্রিত ইসলামী সংস্কৃতির পথ। বাঙলার মুসলমানরা স্বদেশের শ্যামল সমতল নদী উপত্যকা পরিত্যাগ ক'রে উপস্থিত হলেন আরবের দুস্তর মরুভূমিতে। বাঙলা বা ভারতের প্রকৃতিও হিন্দুত্বের দোষে দুষ্ট হয়ে উঠলো। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন হলেন হিন্দু সংস্কৃতির প্রচারক; গজনীর মাহ্‌মুদ হলেন 'মুসলিম লীগার'। এমন-কি বকুল, জবা, শিউলি ফুল হোলো হিন্দু-ফুল; গঙ্গা-যমুনা হোলো বিজাতীয়।[৩৩]

হিন্দু-মুসলমান ভদ্রবাবুদের সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনায় এরকম বিকৃতির পেছনে বহু রাজনৈতিক কারণ ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ধর্মনিরপেক্ষতা বা 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি'র নীতি— যার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্মান্ধতায় উৎসাহ দেওয়া; ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ; ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ'-এর জন্ম; জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের হিন্দু-ঘেঁষা দেশপ্রেম ও রাজনীতি; বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন দমন করার জন্য উত্তর ভারতীয় মুসলমান পুলিশ অফিসার নিয়োগ; ১৯০৯ মর্লি-মিণ্টো রিফর্ম মারফৎ হিন্দু-মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা; ১৯১০ সালে হিন্দু মহাসভার জন্ম; কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গণসংগ্রামের প্রতি বিরূপতা; ১৯১৬ সালে লীগ-কংগ্রেস লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট; ১৯৩৫ সালে 'গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' মারফৎ সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী ব্যবস্থার সম্প্রসারণ (এ সময় থেকে শিখ সম্প্রদায়ের জন্যও পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা করা হয়) ইত্যাদি। হিন্দু-মুসলমান বিভেদের ষোলোকলা পূর্ণ হয় গান্ধী নেতৃত্বের আমলে— হিন্দু-মুসলমান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর পৃথক পৃথক 'আইডেনটিটি' বোধ— সমাজের নিচুতলার মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী।[৩৪]

বিবিধ কারণে, বিশেষত ১৯৩৫ সালের পর 'হিন্দু জাতীয়তা' আর 'মুসলমান জাতীয়তা'র

সম্পর্ক কদর্যরূপ ধারণ করে। '৪৬-এর কোলকাতার দাঙ্গা, সোহরাওয়ার্দির 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর আওয়াজ, মাউন্টব্যাটেনের 'মহানুভবতা', নেহরু প্যাটেল তথা কংগ্রেস, জিন্না তথা লীগ, আর শিখনেতা বলদেব সিংকে খুশি ক'রে উপমহাদেশে স্থায়ী অশান্তি সৃষ্টি ক'রে মাউন্টব্যাটেন সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেন। ছ'লক্ষ নরনারীশিশু প্রাণ হারালেন; ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এক ষোলো পাতার বিল মারফৎ ভারতবর্ষ স্বাধীন (!) হোলো।

ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ হিন্দুবাবুর সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা

বঙ্গসংস্কৃতির অভিভাবকরা আজও উনিশ শতকের 'নবজাগরণের' ধারা অনুসারী। মেকলের 'স্বপ্নসন্তানের' প্রপৌত্ররা আজও শাসক আর শাসিতের মধ্যবর্তী একটা সামাজিক স্তর— যাঁদের কাজ বর্তমানের বৈষম্যমূলক সমাজকাঠামোর পরিপূরক ভাবজগৎকে পরিচালিত করা, নিয়ন্ত্রণ করা, পুষ্ট করা— আর এসবই শাসক আর শাসনের পক্ষে দাঁড়িয়ে।

আমরা দেখেছি অবিভক্ত বাঙলা তথা ভারতে সাম্প্রদায়িক চিন্তার বীজ উপ্ত ছিল রামমোহনের চিন্তায়। এই চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যকর্মে বিস্তার লাভ করে। আমরা আলোচনার শুরুতেই বলেছি দেশবিভাগ তথা স্বাধীনতার পরেও বাঙলা বা ভারতবর্ষে 'হিন্দু আইডেনটিটি' আর 'মুসলমান আইডেনটিটি' অটুট রয়েছে। ব্রিটিশ আমলের হিন্দু-মুসলমানের সমান্তরাল সংস্কৃতির প্রভাব থেকে আজও আমরা মুক্ত হ'তে পারিনি। বর্তমানের হিন্দু বা মুসলমানের সাম্প্রদায়িক 'আইডেনটিটি' ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে এমন কোনো চিন্তাভাবনাকে বঙ্গসংস্কৃতির অভিভাবকরা খুব সঙ্গত কারণেই স্বাগত জানান না। এর কারণ সাম্প্রদায়িক 'আইডেনটিটি' ক্ষুণ্ণ হওয়া মানেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিকাশের পথ সুগম হওয়া। এর আরও একটা কারণ আছে, তা হোলো উনিশ শতকের 'নবজাগরণের' অসারতা প্রমাণ করার যে-কোনো প্রচেষ্টাই বর্তমান ভাবজগতের 'লজিক'কে খণ্ডন করে বা করবে।

ভারতের সমাজের মতো 'প্লুরাল সোসাইটিতে' হিন্দুত্বের আত্মঘোষণা আজও প্রবল। এই হিন্দুত্বের উৎস একদিকে যাবতীয় সংস্কার সমেত 'ট্র্যাডিশনাল হিন্দুইজম' নামক বিরাট অচলায়তন, অন্যদিকে উনিশ শতকের হিন্দু স্পিরিট, 'আধুনিক' হিন্দুর উচ্চমন্যতা। হিন্দুত্বের এই আত্মঘোষণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই 'আনন্দমঠ'-এর শতবার্ষিকী পালিত হয়। হতভাগ্য এক 'প্লুরাল সোসাইটিতে' 'আনন্দমঠ'-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যাবতীয় অতিশয়োক্তির প্রতিক্রিয়া কী হ'তে পারে তা হিন্দু-বঙ্গবাবুরা ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।

এ সত্ত্বেও 'আনন্দমঠ'-এর শতবার্ষিকীর বছরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, শাসক বামফ্রন্টের নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসে সাম্প্রদায়িকতার প্রচারের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করেন। আমরা জানি, বামফ্রন্টের প্রধান দলটি 'মার্ক্সীয় সেকুলারিজম'-এর পরিবর্তে 'মালটি রিলিজিয়াস কালচারাল পলিসি'ই অনুসরণ ক'রে থাকে। আমরা এও জানি, এই দল নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য 'মুসলিম আইডেনটিটি' এক্সপ্লয়েট ক'রে থাকে এবং এ জন্য কোনো নির্বাচনী কেন্দ্রে মুসলমান ভোটারের সংখ্যা বেশি থাকলে 'মুসলমান মার্ক্সবাদী' মাদ্রাসা শিক্ষককে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায় এবং কখনো কখনো মন্ত্রীত্ব বজায় রাখার জন্য 'মুসলিম লীগ'-এর সঙ্গে আঁতাত করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। সুতরাং বামফ্রন্ট নেতার 'আনন্দমঠ'-

এর সাম্প্রদায়িকতার সমালোচনা ছিল নিতান্তই অগভীর, 'ডি-কমিউনালাইজেশন'-এর সুস্পষ্ট সঠিক পদক্ষেপ নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু-পাঠকসমাজ সংবাদপত্র মারফৎ উষ্ণতা প্রকাশ করেন আর গর্জন ক'রে ওঠেন বঙ্গসংস্কৃতির অভিভাবকরা। ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সহিষ্ণুতার আবরণ উন্মুক্ত হয়ে ব্রিটিশ-ভারতের সাম্প্রদায়িক হিন্দুর চেহারা আত্মপ্রকাশ করে।

প্রখ্যাত পণ্ডিত অমলেশ ত্রিপাঠী লেখেন, "দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতি সমার্থক নয়, দুটো আলাদা ভাবনা.... ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করলে বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আখ্যা দেওয়া চলবে না।" 'আনন্দমঠ'-এ বর্ণিত কাল "১৭৬৯-'৭০ সাল থেকে বছর দুই তিন। তখনো বাঙলায় ইংরেজ-শাসন কায়েম হয়নি।" "পাঁচশ বছরের হিন্দু-মুসলিম বিরোধের তিক্ত স্মৃতি" হিন্দুর চিন্তায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। সত্যানন্দ— "আমরা রাজ্য চাহি না কেবল মুসলমানেরা ভগবান-বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের নিপাত করিতে চাই" বললেও ত্রিপাঠী মহাশয়ের মতে "তদানীন্তন হিন্দুদের বিরূপ মনোভাব ও তৎসঞ্জাত কটূক্তি কি একেবারেই অবাস্তব?" "সামন্ততান্ত্রিক লীগ নেতৃবৃন্দ মৌলবী মোল্লার মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানকে বিপন্ন ইসলামের জিগীর তুলে বন্দেমাতরম তথা 'আনন্দমঠ'-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলো। জাতীয় সংহতিতে চিড় ধরলো।"[৩৫]

প্রখ্যাত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত লেখেন, "ইংরেজ বাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াবার আগে 'আনন্দমঠ'-এব বিরুদ্ধে এদেশে কেউ সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তোলেননি।" তাঁর বক্তব্য— এক সময় 'আনন্দমঠ'-এর সমালোচক ছিল 'মুসলিম লীগ', আর এখন সি.পি.এম.।[৩৬]

অমলেশ ত্রিপাঠী সুবিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কিন্তু যখন তিনি বলেন, দেশপ্রেম আর জাতীয় সংহতি সমার্থক নয়, তখন বিস্মিত হ'তে হয়। এর অর্থ— এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংহতি বা সম্প্রীতি জাহান্নামে গেলেও ক্ষতি নেই! 'ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন' অথবা 'জাতীয় সংহতি' নামক শব্দযুগল ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আবহে হাল আমলের আমদানি। আজ তার প্রয়োজন শাসন-শোষণের জন্য; এর প্রবক্তাদের দেশপ্রেম সেখানে অনুপস্থিত। পরাধীন ভারতে নবগোপাল মিত্র থেকে শুরু ক'রে প্রত্যেক হিন্দুনেতাই হিন্দুত্বের ওপর নির্ভর ক'রে হিন্দুজাতি গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বঙ্কিম এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোতা। ভারতের মতো ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন বহু-ভাষাভাষী ও প্রাদেশিক সংস্কৃতির দেশে ধর্মের 'ইন্টিগ্রেটিভ ফাংশন' বা একীভূতকরণের ভূমিকার ওপর প্রত্যেকেই জোর দিয়েছিলেন। তিলক এই আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ সাহসী তাত্ত্বিক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু অধিবাসীদের একসূত্রে বাঁধার জন্য তিনি হিন্দুদের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের অনুসরণেই বাঙলাতে 'শিবাজী উৎসব'-এর প্রচলন হয়েছিল। উনিশ বা বিশ শতকের চিন্তানায়ক বা রাজনীতিকরা সমগ্র ভারতব্যাপী 'জাতি' গঠনের উপাদান হিসেবে হিন্দুত্ব বা হিন্দু-ধর্মাশ্রয়ী-সাংস্কৃতির কথাই ভেবেছিলেন। অ-হিন্দু সেখানে অনুপস্থিত। আজও ভারতবর্ষে শাসন-শোষণের প্রয়োজনে যে 'বাজনৈতিক ধর্ম' বা 'সিম্বলিক ফোর্স' ব্যবহার করা হয় তাব প্রধান উপাদান 'ট্র্যাডিশনাল হিন্দুইজম', 'প্রাচীন হিন্দু আদর্শ'!

অন্যদিকে উনিশ বা বিশ শতকে সাম্প্রদায়িক মুসলমাননেতারাও ইসলামের ডাকেই 'হিন্দু

জাতির' বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে 'মুসলমান জাতি' গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ কারণেই ব্রিটিশ-ভারতে ভারতীয় জাতি বা ভারতের জাতীয় সংহতি গ'ড়ে না উঠে আলাদা আলাদা ক'রে 'হিন্দু জাতির' আর 'মুসলমান জাতির' সংহতি গ'ড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ-ভারতে উত্তর ভারতের মুসলমান আর বাঙলাব হিন্দু, মোপালা মুসলমান আর পাঞ্জাবের শিখ, দক্ষিণের খৃষ্টান আর বিহারের উপজাতি, মারাঠা ব্রাহ্মণ আর গুজরাটের অস্পৃশ্য— ঐক্যবদ্ধ করার মতো কোনো চিন্তানায়ক আবির্ভূত হননি। এরকম কোনো বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আবির্ভাবের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমি প্রায় সমগ্র ব্রিটিশ যুগেই অনুপস্থিত ছিল।[৩৭]

ভারতের পুঁজিপতিদের প্রধান অংশটি ছিল ব্রিটিশ-পুঁজির বশংবদ তল্পীবাহক, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্বভাবতই এঁরা কোনো বলিষ্ঠ 'সেকুলার ইডিওলজি' গ'ড়ে তুলতে পারেননি। কংগ্রেসের প্রথম আমলের জাতীয় নেতারা কংগ্রেস আন্দোলনকে 'সেকুলার' আন্দোলন বললেও কংগ্রেসের উচ্চবর্ণ হিন্দুনেতারা 'সেকুলার' কথাটির অর্থ করেছিলেন, সংগঠনে বদরুদ্দীন তয়েবজীর মতো গুটিকতক এলিট মুসলিম-এর অবস্থান— সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও ধর্মাশ্রয়ী প্রগতিবিরোধী সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ নয়।[৩৮] প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরাই হিন্দুত্ব আর রাজনীতিকে সবাসরি মিলিয়ে দেন। এটাই ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি। ব্রিটিশ-ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানের আকাঙিক্ষত সংহতি গ'ড়ে ওঠার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল মুখ্যত নগরবাসী উচ্চবর্ণ ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু-ভদ্রলোক আব মুসলমান-ভদ্রলোকের পৃথক পৃথক 'নবজাগরণ'!

তিলক, বিপিন পাল প্রমুখের রাজনীতি যদি সেকুলার হোতো, যদি গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস শ্রেণীসংগ্রাম (অবশ্যই জাতীয় সংগ্রামের অধীন শ্রেণীসংগ্রাম) তথা বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা না করতো তাহলে ভারতের বাজনীতি হয়তো অন্যপথে প্রবাহিত হোতো। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান বিভেদের পরিবর্তে ঐক্য স্থাপিত হোতো, ত্রিপাঠী মহাশয় যাকে জাতীয় সংহতি বলেছেন। যদি ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতের ইতিহাস অসহায় হিন্দুপ্রজার ওপর মুসলমানের স্থায়ী অত্যাচারের ইতিহাসই হবে তাহলে তো ত্রিপাঠী-কথিত "জাতীয় সংহতিতে চিড় ধরলো"— এই কথাটিরই কোনো অর্থ হয় না।

১৮৫৭র স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ সিপাহীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি তুলেছেন, "দ্বিন দ্বিন! হর হর মহাদেও! মারো ফিরিঙ্গীকো!"— তখন দেশপ্রেম ছিল, তাই সংহতিও ছিল।[৩৯] ইংরেজরা এই ঐক্যে ভয় পেতো।

পরবর্তীকালে হিন্দুর দেশপ্রেম যে মুসলমান-বিরোধিতায় রূপান্তরিত করা যায় সে সম্পর্কে ব্রিটিশকে সচেতন করেন সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার নির্মাতারা। ব্রিটিশ যুগে মুসলমান দেশপ্রেমিকরা হিন্দু-মুসলমান সংহতি দৃঢ়তর করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, এ কারণে তাঁরা ভারতে গো-হত্যা বন্ধ করার জন্য ফতোয়া জারি করেছিলেন। অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীরাও 'Indian Revolutionary Committee'র পক্ষ থেকে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন।[৪০] তাঁরা অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক ছিলেন ব'লেই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংহতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এর অনেক আগেই— গ্রাম্য মুসলমানের ঘরে আগুন দিয়েছেন বঙ্কিম। সাম্প্রদায়িক মুসলমাননেতারা

দেশপ্রেমিক মুসলমানদের 'হিন্দুর ভাড়াটিয়া দালাল' আখ্যা দেন। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা 'আনন্দমঠ' বা বঙ্কিমচন্দ্রের সামান্য সমালোচনা শুনলেও স্থির থাকতে পারেন না অথচ অখণ্ড ভারতের পক্ষে দাঁড়ানো দেশপ্রেমিক-মুসলমানরা আজ বিস্মৃতির অতলে। আজকের এলিট-মুসলমানও দেশপ্রেমিক-মুসলমানদের আন্দোলনের ইতিহাস প্রচারে উৎসাহী নন ব'লেই মনে হয়। এ আমাদের ইতিহাসচর্চার ত্রুটি!

ত্রিপাঠী মহাশয় "পাঁচশ বছরের হিন্দু-মুসলিম বিরোধের তিক্ত স্মৃতি"র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এই 'ইতিহাস' ভারতপথিক রামমোহনের ইতিহাসচর্চার প্রতিধ্বনি। ত্রিপাঠী মহাশয় নিশ্চয়ই রাজেন্দ্রপ্রসাদের গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিত। এছাড়াও মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের সুস্থ সম্পর্কের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়; তাঁর তা অজানা থাকার কথা নয়। 'পাকিস্তানওয়ালা' এফ. কে. খান দুরানীও 'The Meaning of Pakistan' গ্রন্থে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা লিখেছেন। অমলেশ ত্রিপাঠী মহাশয় ইতিহাসের কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার ইতিহাসকেই মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রধান ধারা হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন, যেমন চেয়েছিলেন রামমোহন রায় বা বঙ্কিমচন্দ্র— 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর সময়— যখন 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' হেস্টিংসদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে— তখনো না-কি বাঙলায় ইংরেজ-শাসন কায়েম হয়নি— অমলেশ ত্রিপাঠী একথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস বলে, ১৭৬৫ সালে 'দেওয়ানী' লাভ করার পর ইংরেজ বণিক বাঙলা-বিহারের প্রকৃত অধীশ্বর হয়। বস্তুত তারা এই অঞ্চলের 'ডিক্টেটর'[৪১] হয়ে বসে। 'ডিক্টেটর' ইংরেজের প্রকাশ্য লুণ্ঠন মারফৎ আধুনিক ইংল্যাণ্ড গঠিত হয়, আর ভারত পরিণত হয় স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে। শ্রমজীবী হিন্দু-মুসলমান প্রকৃতপক্ষে এই বণিক-রাজকেই উৎখাত করতে চেয়েছিলেন।

ত্রিপাঠী মহাশয় বলেছেন— 'মৌলবী মোল্লার' মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক লীগনেতারা বিপন্ন ইসলামের জিগির তুলে সাধারণ মুসলমানদের 'আনন্দমঠ' তথা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। বরুণবাবুও প্রায় একই কথা বলতে চেয়েছেন। হিন্দু-সামন্ততান্ত্রিক-বঙ্কিমের বিরুদ্ধে মুসলমান-সামন্ততান্ত্রিকনেতারা গরিব-মুসলমান ক্ষ্যাপাবেন এতে আর অবাক হবার কী আছে! আর সাম্রাজ্যবাদও যে এর সুযোগ নেবে— এও তো স্বাভাবিক। তাই অমলেশ ত্রিপাঠী আর বরুণ সেনগুপ্তর কথা আংশিক সত্য হ'লেও শেষ কথা নয়। 'বন্দেমাতরম' পরবর্তীকালে 'আনন্দমঠ'-এ অন্তর্ভুক্ত হবার পরও বহু দেশপ্রেমিক-মুসলমান সদর্পে এই রণধ্বনি উচ্চারণ করেছেন বারবার। এ তাঁদের নিখাদ দেশপ্রেম আর মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।[৪২] কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এ সাম্প্রদায়িকতার প্রচারের কথা স্বতন্ত্র। বাঙলা বা ভারতবর্ষ দেশটা শুধুমাত্র বর্ণহিন্দুদের; ব্রিটিশের সুশাসনের আগে যবনরা রাজশক্তির সাহায্যে শুধুমাত্র উচ্চবর্ণ হিন্দুর ওপর অত্যাচার করতো; তারা অতি অবশ্যই বিদেশী; বর্ণহিন্দুর পৃথক সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের জন্য ইংরেজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন ইত্যাদি শিক্ষা 'ভারত পথিক'-এর, ঋষি বঙ্কিমের! বরুণবাবু বা ত্রিপাঠী মহাশয়ের চিন্তা অনুসারে হিন্দু-বঙ্কিম— হিন্দুর-দেশপ্রেম আর মুসলমান-বিদ্বেষের মিশ্রণ ঘটালেও তা দোষের নয়, কিন্তু ধর্মান্ধ ইংরেজপোষ্য মোল্লা-মৌলবীরা বঙ্কিম-বিদ্বেষ প্রচার করলে সেটা অবশ্যই দোষের।

শিক্ষিত হিন্দুমানসে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন—

বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্স মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুর বিদ্রোহের গৌরবোজ্জ্বল ছবি এঁকেছিল এবং এর তুলনায় মুসলমানদের হীনভাবে অঙ্কিত করেছিল। চট্টোপাধ্যায় তীব্রভাবে মুসলমান-বিরোধী ছিলেন। আমরা এইসব রোমান্সের আগ্রহী পাঠক ছিলাম এবং এদের 'স্পিরিট' অন্তরে গ্রহণ করতাম।[৪৩]

অনেক মুসলমান লেখক বা নেতা 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', বা 'রাজসিংহ'-এর বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন; এঁদের সকলেই সাম্প্রদায়িক। কিন্তু একদা জিন্না সাহেবের 'প্রাইভেট সেক্রেটারী', দেশবিভাগের বিরোধী, মুক্ত দৃষ্টির মানুষ এম. আর. এ. বেগ লিখেছেন— 'আনন্দমঠ' মুসলমান বিরোধী।[৪৪]

বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন— বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম 'প্রাদেশিক'; সমাজবিজ্ঞানী লুই দুমো— মজুমদার প্রদত্ত এই অভিধায় যুক্ত করেছেন তাঁর নিজের অভিমত— বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্প্রদায়িক।'[৪৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলমান-বিদ্বেষের প্রচারকে ব্যাঙ্গবিদ্রূপ ক'রে কোনো কোনো মুসলমান লেখক— কাহিনী রচনা করেন। শেখ মহম্মদ ইদ্রিস আলীর 'বঙ্কিমদুহিতা' বঙ্কিমের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন এমন একটি রচনা। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন— "মুসলমান ছেলেরা আমার কাছে একখানা বই রাখলে, উপরে লেখা 'শ্যালক বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী'। 'বললাম, অপমান করার জন্যই কি এসেছো? একজন মৃত ব্যক্তিকে অপমান করা ঠিক নয়।' বঙ্কিমবাবু অনেক জায়গায় অকারণ মুসলমানদের আক্রমণ করেছেন। তখন ওরা ছিল অত্যন্ত নির্জীব। কিন্তু সকল action-এরই reaction আছে। 'বঙ্কিমদুহিতা' ব'লে একখানা বই— অনেক নোংরা কথা তাতে আছে, এগুলো হ'তে বাধ্য।"[৪৬]

সুতরাং 'অ্যাকশন' বঙ্কিমচন্দ্রের— মোল্লা-মৌলবী বা মুসলিম লীগের কাজকর্ম তার 'রি-অ্যাকশন' মাত্র! আজকের হিন্দু-বঙ্গবাবুরা এতে ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হ'লে তা তাঁদের চিন্তার গলদ। এই চিন্তাই আজ হিন্দুর সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার অন্তঃসার। বরুণবাবু লিখেছেন— 'আনন্দমঠ'-এর সমালোচনা করেছিল লীগ, আর করলো সি.পি.এম.। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি— শরৎচন্দ্রও বঙ্কিমের অকারণ মুসলমান-বিদ্বেষের সমালোচনা করেছিলেন।

'আনন্দমঠ'-এর ভূমিকায় লেখক গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন— "আমার মতে বঙ্কিম যদি অতটা গভীর হিন্দুভাবাপন্ন না হতেন, তাহলে আজ তাঁকে আর মুসলমানের কাছে এত আক্রমণ সহ্য করতে হোতো না।" অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, "দেশজননীর বন্দনার মন্ত্র বন্দেমাতরম-এর স্রষ্টা, স্বদেশপ্রাণ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা— বঙ্কিমচন্দ্র.... দেশবাসীর অনেকের কাছেই শুধু সাহিত্যসম্রাটই নন, ঋষিও।"[৪৭]

উদ্ধৃত অংশ অবশ্যই আপত্তিজনক। 'আক্রমণ' শব্দটি অত্যন্ত অসহিষ্ণু। গোপালবাবুর কাছে সংযম প্রার্থনীয়। 'হিন্দু সাম্প্রদায়িক' বঙ্কিমের স্পষ্ট সমালোচনা যদি কোনো মুসলমান আজ করেন তাহলে ক্ষিপ্ত হবার কী আছে? গোপালবাবু উপনয়নবিশিষ্ট দ্বিজ কি-না জানি না, তবে নিশ্চয়ই "চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, বুনো" নন, তাই তাঁর মতো 'অনেকের' কাছে, অর্থাৎ নগরবাসী উচ্চশিক্ষিত বর্ণহিন্দুবাবুদের কাছেই বঙ্কিম ঋষি— অ-হিন্দুর কাছে নন। গোপালবাবুরা ভুলে যান আজকের ভারতবর্ষ 'মালটি রিলিজিয়াস'। আম্বেদকর 'আনন্দমঠ'

সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেছিলেন কি-না আমাদের তা জানা নেই। গোপালবাবুরা কি জানেন?

পশ্চিমবাঙলার মুসলমান-মধ্যশ্রেণীর একাংশ এসব ব্যাপারে নীরব। এঁরা নিজের সম্প্রদায়ে মুক্তচিন্তা প্রসারের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন না। অন্য এক অংশ অভিমানী। এঁরা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন। এঁরা সমস্ত ধর্মের মানুষের পৃথক পৃথক সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব সমর্থন করেন অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের 'মালটি রিলিজিয়াস কালচারাল পলিসি' অনুসরণ করেন। এমনই একজন লেখক লিখেছেন, বঙ্কিমের মহৎ চিন্তা হোলো "ভাইকে হত্যা ক'রে ইংরেজকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো.... আমাদের জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করার জন্য বাঙলাসাহিত্যের আর কোনো গ্রন্থই এমন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি....।"[৪৮]

হিন্দুর সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা আর এর মুসলমান প্রতিক্রিয়া কোথায় সুস্থভাবে শেষ হ'তে পারে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কথায়। রুশবিপ্লবের অল্প কিছুদিন পর তিনি লেখেন, "মোট কথা গণবৃন্দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিই আমাদের আদর্শ হইবে.... গণসমূহকে চিরকাল চাপিয়া রাখা যাইবে না, তাহাদের কালে শ্রেণীজ্ঞান লাভ হইবে.... দেশের মুক্তিকামীদের এখন ম্যাটসিনী, গ্যাবিবল্ডি ও আনন্দমঠের রোমাণ্টিক স্টোরি ছাড়িতে হইবে, এখন কার্ল মার্ক্স ও 'mass movement'-এর চর্চা করিতে হইবে।"[৪৯]

'নতুন ধর্ম'

ভারতের দুর্ভাগ্য, সাম্প্রদায়িক চিন্তা হিন্দু-মুসলমান 'গণসমূহের' শ্রেণীজ্ঞান লাভে বাধা দিয়েছে। আজকের কার্ল মার্ক্স চর্চাকারী লেখক-বুদ্ধিজীবী নেতারা বহুবছর এ কাজ করলেও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী শ্রমসাধ্য বিতর্ক চালাতে চান না, তাহলে 'আনন্দমঠ' বিতর্ক মাঝপথে থেমে যেতো না। সুতরাং দায়িত্ব বর্তাচ্ছে ভিন্নপন্থী বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপর। কিন্তু কখনো কখনো এঁদেরও এসব ব্যাপারে উদাসীন ব'লে মনে হয়। কোলকাতা শহরে যখন সাড়ম্বরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হিন্দু-সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধরা 'একাত্মতা যজ্ঞ' উদ্‌যাপন করছিলেন তখন বামপন্থী বা 'অতিবামদের' সংগঠনগুলির কর্মীরা নীরব ছিলেন। এই মধ্যযুগীয় ব্যাপারের বিরুদ্ধে এঁরা কোনো পাল্টা আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বঙ্গসংস্কৃতির 'রক্ষাকর্তাদের' কথা না বলাই ভালো। এই একাত্মতা যজ্ঞ' নিম্ন মধ্যবিত্ত বা শ্রমজীবী হিন্দু-সম্প্রদায়কে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই 'যজ্ঞস্থলে' 'হিন্দু-মিথীক্যাল' যুগচক্রের চিত্ররূপ প্রদর্শিত হয়। 'সত্যযুগের' অবতার সত্যনারায়ণ থেকে 'কলিযুগের' শ্রীযুক্ত সঞ্জীব রেড্ডি পর্যন্ত অবতার বা হিন্দুধর্মের ধারকদের চিত্রময় বর্ণনা-বিবরণ দেওয়া হয়। 'আনন্দমঠ'-এর রচয়িতা ঋষির জন্য ছিল বিশেষ স্থান। বাঙলার বিপ্লবী, যাঁরা পূর্ব বাঙলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ছবি ও জন্মস্থান মানচিত্রে বিশেষভাবে চিহ্নিত ক'রে দেখানো হয়, ইঙ্গিত স্পষ্ট, ঐ অঞ্চল অখণ্ড ভারতের অন্তর্গত ছিল তাই বর্তমান বিধর্মীদের দেশে হিন্দুরাজত্ব বা হিন্দুরাষ্ট্রের অধিকার স্থাপন করতে হবে। এই 'যজ্ঞের' পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'প্রচার রথ' জাতীয় সড়ক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের দরিদ্র মুসলমানদের কাছে শুনেছি 'যজ্ঞওয়ালাদের' শ্লোগান— "দুনিয়ার হিন্দু এক হও!" এ ধ্বনি দেশের শ্রমজীবী হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার বিরোধী, তাই সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের সহযোগী 'সেকুলার বাবুরা' নীরব থাকেন, উপেক্ষা

করেন। এ ধরনের ঘটনায় বামপন্থী ব্যক্তিদের হয়তো কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী মানুষের বিশেষ ক্ষতি হয়। কাগজে দেখেছি গ্রামাঞ্চলে 'R.S.S -এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।'[৫০] সুতরাং 'সেকুলার' হিন্দুবাবুদের আত্মতৃপ্তি ভোগ করার বিশেষ কোনো কারণ নেই। হিন্দু-ঐক্যের আহ্বান শুধু শ্রেণীসমন্বয়ের মতাদর্শই প্রচার করে না, সাম্প্রদায়িক মুসলমানদেরও সাহায্য করে।

শিক্ষিত মুসলমানদের একাংশ এ ধরনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু তাঁরাও 'ডি-কমিউনালাইজেশন'-এর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন না। তাঁরা কোমর বেঁধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ইসলামিক মতেই বিবাহ হয়েছিল নজরুলের, অথবা শরৎচন্দ্র কোথায় কখন 'মুসলমানী বাঙলার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন; যেন এটা প্রমাণ করতে পারলেই মস্ত লাভ হবে।

সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা মগ্ন আছেন ভারতে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার খোয়াবে। ভারত রাষ্ট্রের 'মালটি রিলিজিয়াস কালচারাল পলিসি'র দৌলতে এঁরা বহাল তবিয়তেই আছেন। এঁরা ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে কাঁচকলা প্রদর্শন করেন, কার্ল মার্ক্সকে নারীলোলুপ লম্পট হিসেবে প্রচার করেন, রবীন্দ্রনাথকেও 'পুতুল পূজারী' কাফের মনে করেন; আর নজরুলের অবস্থাই সবচেয়ে করুণ— এঁদের বিচারে নজরুল মুসলমান পরিবারের ছেলে ছিলেন কিন্তু খাঁটি মুসলমান ছিলেন না। বেচারা নজরুল!

আমাদের দেশে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচারের কাজে 'লাঙল'ই সম্ভবত প্রথম বাঙলা সাময়িক পত্র।[৫১] নজরুল পরিচালিত এই পত্রের এক সংখ্যায় লেখা হয়, "হিন্দু মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্যা— সব লাঙলের ফালের মুখে লোপ পাবে।" একথা আজও সমানভাবেই সত্যি। কিন্তু ভারতে শ্রেণী-শাসনের সঙ্গে ধর্ম কীভাবে জড়িয়ে রয়েছে এ ব্যাপারে ঠিকমতো ভাবাই হয়নি। এ সম্পর্কে চিন্তার পরিধি বিস্তৃত করা দরকার। প্রগতিশীল ব্যক্তি বা সংগঠনগুলি যাকে ব্যাপক অর্থে অপসংস্কৃতি বলেন তার প্রধান অংশটাই যে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অনেকে একমত হবেন। আমরা একে বলবো 'ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতি'। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যে পৃথক পৃথক সংস্কৃতির ধারা বহমান তাকে যথাক্রমে হিন্দুধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতি আর ইসলামআশ্রয়ী-সংস্কৃতি বললে বোধহয় ভুল বলা হবে না। হিন্দুধর্মাশ্রয়ী-সংস্কৃতি আর ইসলামআশ্রয়ী-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই শ্রেণীচেতনার বিকাশে বাধা দিচ্ছে এবং দেবে। এজন্য 'লাঙলের ফাল' তীক্ষ্ণতর করা দরকার। এর সাহায্যকারী প্রক্রিয়া হিসেবে সেকুলারিজম-এর পক্ষে, সেকুলার সংস্কৃতির বিকাশের জন্য আমাদের কাজ করা উচিৎ। পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, যে সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা ভক্তি বা শ্রদ্ধামিশ্রিত-ভীতির ওপর নির্ভর না ক'রে উপযোগিতা ও র‍্যাশনাল চিন্তার ওপর নির্ভর করে— তাকেই সেকুলার সংস্কৃতি বলা যায়। হিন্দু-মুসলমানের কোনো ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত-ভীতি 'নন-সেকুলার' সংস্কৃতির ফল। 'সেকুলার' সংস্কৃতি বা ইতিহাস-দৃষ্টির ফলে আমরা ব্রিটিশ-আমলের কোনো ধর্মগুরুকে শ্রদ্ধা না ক'রে কোনো বিপ্লবী বিদ্রোহী দেশপ্রেমিককে শ্রদ্ধা করতে শিখবো; কারণ বিপ্লবী-বিদ্রোহীরা লাঙলের ফাল তীক্ষ্ণতর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

আজকের হিন্দু-সাম্প্রদায়িকদের হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হুঙ্কার, মুসলমান-সাম্প্রদায়িকদের ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিগির আর হিন্দু-মুসলমানদের পৃথক পৃথক 'ইতিহাস' 'সংস্কৃতি'র

অভিমান সবই দূর হবে তীক্ষ্ণতর লাঙলের ফালের মুখে। সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মান্ধতা দূর হোক নতুন ধর্মের প্লাবনে! চিরকালই সাম্প্রদায়িকতার লালনকর্তারা সংখ্যায় কম, শোষিত মানুষই অগণন— "Ye are many, they are few!"

টীকা ও তথ্যসূত্র

১। শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় ঃ 'সেকুলার' ভারতে ধর্মীয় নীতি; 'লোকায়তিক' দ্বিতীয় প্রকাশ, মাঘ ১৩৮৯

২। আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৬.১১.১৯৮২

৩। Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. New Delhi 1980. pp. 354-355.

৪। 'Carnaticus' (A British Officer), Asiatic Review. May 1821. উদ্ধৃতি— শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'গরু নিয়ে রাজনীতি', 'অবহি', নভেম্বর ১৯৮২

৫। Jawaharlal Nehru, The Discovery of India. Calcutta 1956. pp. 312-315.

৬। Rammohan Roy. Appeal to the King in Council. অজিতকুমার ঘোষ (প্রধান সম্পাদক), রামমোহন রচনাবলী, কোলকাতা ১৯৭৩; পৃ. ৫০৮-৫০৯

৭। তুলনীয়— David Kopf British Orientalism and the Bengal Renaissance Calcutta 1969. p. 3.

৮। তদেব— p 1.

৯। প্রমোদ সেনগুপ্ত; নীলবিদ্রোহ ও বাঙালি সমাজ; উদ্ধৃতি— শুভঙ্কর মখোপাধ্যায়, 'নীলবিদ্রোহ এবং গ্রাম্য সাহিত্য'; 'পদাতিক', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০

১০। এই বাবুসম্প্রদায়ের ইংরেজ-ভক্তি আর মসলমান-বিদ্বেষেব পরিচয় পাওয়া যায় ৭.১২.১২৬৫ সনের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের কটু সমালোচনায়, "নেড়ে চরিত্র বিচিত্র, ইহারা অদ্য জুতা গড়িতে গড়িতে কল্য 'শাহ্জাদা' 'পিরজাদা' 'খানজাদা' 'নবাবজাদা' হইয়া উঠে, রাতারাতি আর হইয়া বসে, যাহা হউক বাবাজীদের মুখের মতন হইয়াছে, জঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া অন্তরঙ্গভাবে গদগদ হইয়াছিলেন, এদিগে জানেন না যে 'বাঙ্গাল বড় হেঁয়াল'।" উদ্ধৃতি— নাজমা জেসমিন চৌধুরী; বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি; কোলকাতা ১৯৮৩; পৃ. ৩২

১১। তুলনীয়— Mohammad Ghouse. Secularism Society and Law in India. Delhi 1973, p. 26.

১২। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ; 'রামমোহন এবং ইসলাম'; দেশ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

১৩। Rajendra Prasad. India Divided. Bombay 1946. p. 35.

১৪। A Mitra. Census of India, 1951. Volume VI, Part 1A. Report. Delhi 1953. pp. 450-451.

১৫। Nirmal Chandra Sinha. Indo British Economy, Hundred Years Ago. Calcutta 1946. p. 39.

১৬। W.W. Hunter. The Indian Musalmans. Calcutta 1945 (Reprint).

১৭। যদুনাথ সরকার, 'আনন্দমঠের ঐতিহাসিক ভূমিকা' গোপাল চন্দ্র রায় (সম্পাদক), আনন্দমঠ; কোলকাতা ১৯৮৩; পৃ. ৪

১৮। Sir Syed Ahmed Khan. Vide A.M. Zaidi. Evolution of Muslim Political Thought in India : From Syed to the Emergence of Jinnah. New Delhi 1975. Vol. I/ p. 52.

১৯। O'Malley. History of Bengal Bihar and Orissa Under British Rule. p. 208. উদ্ধৃতি— শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'আনন্দমঠ' ও 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'; কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকা, ১৯৭২

২০। W.W. Hunter. Annals of Rural Bengal p. 71, উদ্ধৃতি— উপরোক্ত প্রবন্ধ।

২১। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের (১৭৬৯-১৯৭০ খৃষ্টাব্দের) কালান্তর দুর্ভিক্ষ।

২২। W.W. Hunter. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

২৩। হেস্টিংসের চিঠি; তুলনীয়— Brajendranath Bandopadhyay. Dawn of New India. p. 66. উদ্ধৃতি— উপরোক্ত প্রবন্ধ।

২৪। তুলনীয়— Jamini Mohan Ghose. Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal. p. 84. উদ্ধৃতি— পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

২৫। উদ্ধৃতি— উপরোক্ত প্রবন্ধ।

২৬। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, কোলকাতা ১৯৮৩; পৃ. ৯৭

২৭। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; 'দেশ', ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭১

২৮। E.G. Glazier, Report on the District of Rungpore. শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'আনন্দমঠ ঃ দেবী চৌধুরাণী ঃ ইতিহাস' 'আজ', সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭২

২৯। K.S. Shelvankar. The Problem of India. p. 107. উদ্ধৃতি— শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ১৯ নম্বর সূত্র দ্রষ্টব্য।

৩০। তুলনীয়— Leonard A. Gordon. Bengal . The Nationalist Movement, 1876-1940 New York 1974. p. 46.

৩১। তদেব— p. 47.

৩২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ শরৎ সাহিত্য সমগ্র, কোলকাতা; সুকুমার সেন, সম্পাদক, ১৩৯২; পৃ. ২১৭১

৩৩। বদরুদ্দীন উমর; সাম্প্রদায়িকতা; ঢাকা ১৯৮০; পৃ. ৩৯

৩৪। M.R.A. Baig. The Muslim Dilemma in India. p. 60. শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, (১৯৮২)

৩৫। অমলেশ ত্রিপাঠী; আনন্দমঠ ও বঙ্কিমের দেশপ্রেম; আনন্দবাজার পত্রিকা ১.১.১৯৮৩

৩৬। বরুণ সেনগুপ্ত ঃ এক সময় আনন্দমঠ-এর সমালোচক ছিল মুসলিম লীগ, এখন সি.পি.এম.। আনন্দবাজার পত্রিকা ৩০.১২.১৯৮২

৩৭। ভারতীয় উপমহাদেশে বিপুল বৈচিত্র্য থাকলেও এক অতি ক্ষীণ (সর্বভারতীয়) দেশাত্মবোধ বিভিন্ন অঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষের চেতনায় দানা বাঁধতে শুরু করে ১৮৫৭-র স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে থেকেই। ক্রমশ তা দুর্বার হয়ে ওঠে। অসংখ্য গণসংগ্রামের পাশাপাশি এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা উচিৎ। ১৯৩০ সালে পেশোয়ারের গণজাগরণে 'রয়্যাল গাড়োয়ালি রাইফেলস্'-এর হিন্দু সৈনিকরা নিরস্ত্র মুসলমান জনসাধারণের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃত হন (সৈনিকরা আজও দরিদ্র কৃষক পরিবার থেকে আসেন)। মহাত্মা গান্ধী এই সৈনিকদের শপথভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রে তীব্র নিন্দা করলেও এই মহান দেশপ্রেমিক সৈনিকরা তাঁদের বিচারের সময় বলেন, "আমরা আমাদের নিরস্ত্র

ভাইদের ওপর গুলি চালাবো না।" এঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হুকুম অমান্য ক'রে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না; (Sumit Sarkar. Modern India 1885-1947. Madras 1986)। জনসাধারণের ভারতবর্ষ অগ্নিগর্ভ হ'লেও কংগ্রেসী নেতারা এই পরিস্থিতি সঠিকভাবে কাজে লাগানোর কোনো চেষ্টাই করেননি। (A. R Desai. Recent Trends in India, Nationalism Bombay 1973 p. 49)।

৩৮। কোনো কোনো ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত অবশ্য পাওয়া যায়, যেমন— বাঙালি মহিলা সরলা রায়ের গঞ্জনাতে 'মডারেট' নেতা গোখেল তাঁর উপবীত ছিঁড়ে খামে ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জাতিভেদে তাঁর অবিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে। (নিত্যপ্রিয় ঘোষ, 'লড়াই শুধু নীতির জন্য'; আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯/৮/১৯৯০)। একথা অবশ্য উল্লেখ্য যে, বাঙলার 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'ডিরোজিয়ানরাই' ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রথম মূর্তিমান প্রতিবাদী।

৩৯। এরও পরবর্তীকালে কয়েকজন ধার্মিক মুসলমান হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য দৃঢ়তর করার জন্য এক 'ফতোয়া' জারি করেন; এই ফতোয়ায় বলা হয়, 'গো-হত্যা ইসলামের অবশ্যপালনীয় বিধি নয়'; সুতরাং মুসলমানদের এই কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ। Moin Shakir. Secularisation of Muslim Behaviour Calcutta 1973 pp. 55-56

৪০। তুলনীয়— Sedition Committee Report Annexture (2) (Reprint 1919) p 226.

৪১। O'Malley, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় (১৯৭২)

৪২। "সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই একমাত্র হিন্দু চিন্তাবিদ যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' যে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার অনুপযুক্ত— এ মত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ ক'রে হিন্দুসমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।" আবুল ফজল, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ; ঢাকা ১৯৮৫, পৃ ৩৬

৪৩। তুলনীয়— Leonard A Gordon op cit. p 46

৪৪। M R A Baig The Muslim Dilemma in India Delhi 1974 p 36

৪৫। Louis Dumont. 'Nationalism and Communalism'. 'Contribution to Indian Sociology' No VII, March 1964 p. 60

৪৬। আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য; কোলকাতা ১৯৭১, পৃ ৩৫৭

৪৭। গোপাল চন্দ্র রায়; পূর্বোক্ত, ভূমিকা

৪৮। ইবনে অসিমদ্দিন; 'জিব্রাইল শেখ', 'কাফেলা', মাঘ ১৩৮৯

৪৯। উদ্ধৃতি— সুশোভন সরকার ঃ প্রসঙ্গ ইতিহাস; কোলকাতা ১৯৮৩; পৃ. ১২৩

৫০। 'বীরভূমে যে-কোনো কারণেই হোক— আর.এস.এস.-এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে', আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯.৯.১৯৮৪

৫১। বলা বাহুল্য 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার কথা আমরা বিস্মৃত হচ্ছি না।

[মধ্যাহ্ন, ১৯৮৬]

জাতীয়তা ও জাতীয় সঙ্গীত

সম্প্রতি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক'কে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভারতের 'জাতীয় সংহতি'ব প্রাণপুরুষ বাজীব গান্ধী অবশ্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'জনগণমন অধিনায়ক'ই জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পাবে। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে রবীন্দ্রনাথের এই গানটির পরিবর্তে ইকবালের 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতের সম্মানে ভূষিত করার কথা উঠছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'সিওল এশিয়ান গেম্‌স্‌'-এর আসরে সরকারি বাদকেরা 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর পরিবর্তে কবি ইকবালের 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা' গানটির সুর ভারতের 'ন্যাশনাল এনথেম' হিসেবে পবিবেশন করেন।

রাম সিং-এর বদলে শ্যাম ভার্গব অথবা যদু রেড্ডী মন্ত্রী হ'লে সাধারণ মানুষ যেমন মাথা ঘামান না, তেমনি 'জনগণমন' অথবা 'সাবে জাঁহা সে আচ্ছা' নিয়েও মাথা ঘামানোর বিশেষ প্রয়োজন থাকতো না— যদি না এর সঙ্গে একটা গভীর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক প্রশ্ন জড়িয়ে থাকতো।

কিছুদিন আগে বিহারের লোকদলনেতা বাম অবধেশ সিংহ মহাশয় 'জনগণমন অধিনায়ক' সম্পর্কে এক বস্তাপচা অভিযোগ তুলেছেন, তিনি বলেছেন, "এই সঙ্গীতটি রচিত হয়েছিল ব্রিটিশরাজকে স্বাগত জানানোর জন্য। তাই এটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে মানায় না। এটির বদল হওয়া দরকার।" ভারতের বিভিন্ন গোত্রেব বাজনৈতিক নেতাদেব মূঢ়তা আর অজ্ঞতার পরিচয় আমরা মাঝেমাঝেই পেয়ে থাকি। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৫ই আগস্টকে 'গণতন্ত্র দিবস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন এই বছরের স্বাধীনতা দিবসেই। কিছুদিন আগে কোলকাতা (সুবেন্দ্রনগর) অধিবেশনে জনৈক কংগ্রেসনেতা— সাংবাদিককে প্রশ্ন করেন, "সুরেন্দ্রনাথ কৌন থা?" এই অধিবেশনেই যুবরাজ রাজীব সাংবাদিকের কাছে জানতে চান— পূর্ণ স্বাধীনতা আর 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' বিতর্কে পিতা মতিলাল আর পুত্র জহরলালের মতপার্থক্য হয়েছিল কোন্‌ অধিবেশনে? এবকম ফিরিস্তি আরও দেওযা যায়— কিন্তু বাবু অবধেশ যা বলেছেন, তা সমস্ত অজ্ঞতাকে ছাড়িযে গেছে।

'জনগণমন অধিনায়ক' সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথের বক্তব্য বহুপঠিত, কিন্তু আলোচনার স্বার্থে আমবা তা আবাবো উদ্ধৃত করছি, "সে বৎসর ভাবতসম্রাটেব আগমনেব আয়োজন চলছিল। রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান বচনার জন্য আমাকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি 'জনগণমন অধিনায়ক' গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা কবেছি, পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথী, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচাযক; সেই যুগ-যুগান্তরের মানবভাগ্য রথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ কোনো জর্জই কোনোক্রমে হ'তে পারেন না সেকথা রাজভক্ত বন্ধুও

অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না।" শ্রীমতি সুধারাণী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগ যুগ ধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথী ব'লে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মঅবমাননা।"

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী আর রাজভক্ত মডারেটদের জুতো ছোড়াছুড়ি মারফৎ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯১১ সালে ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমন ঘটে। এ উপলক্ষ্যে দিল্লিতে দরবার বসানো হয়, আর এ দরবার থেকেই বঙ্গবিভাগ বাতিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস করা আর মুসলমান উষ্মার মূল্যেও হিন্দুনেতাদের খুশি করা। রাজভক্ত কংগ্রেসীরা এ বছরের কোলকাতা অধিবেশনে 'জনগণমন অধিনায়ক' পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন।

১৯৪২ সালে জার্মানীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর সুর 'আজাদ হিন্দ্'-এর জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বাজানো হয়। এরপর ১৯৪৭ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'জনগণমন অধিনায়ক' পরিবেশিত হয়। অবশেষে ১৯৫০ সালে সংসদে 'জনগণমন অধিনায়ক' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর সঙ্গে বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্'কেও সমান সম্মানীয় স্থান দেওয়া হয়।

'জনগণমন অধিনায়ক' সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিযোগটি ওঠে কেরলের একটি স্কুলের তিনটি শিশুর 'প্রতিবাদে'। জাতীয় সঙ্গীতে কণ্ঠ না মেলানোয় স্কুলকর্তৃপক্ষ এদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করেন। এ ঘটনা নিয়ে মামলা হয় এবং সে মামলা সুপ্রীম কোর্ট অবধি গড়ায়। জাতীয় সঙ্গীতে কণ্ঠদানে বিরত তিনটি শিশু 'য়েহোভা' সম্প্রদায়ের, 'জনগণমন অধিনায়ক' এদের ধর্মীয় বিশ্বাস বিরোধী। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয়, "জাতীয় সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলাতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না, এটা করলে তা হবে সংবিধানের ১৯ (১) ক) এবং ২৫ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারকে খর্ব করা।"

ভারতের দারিদ্র্য-ভারাক্রান্ত স্বাধীনতা— বয়সে বর্তমান-প্রধানমন্ত্রীর মতোই যুবক। ঠিক এই মুহূর্তে— অনাহারে, সরকারি ভাষায় অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে, যে শিশুটি অন্ধ হয়ে গেল— তার কাছে ভারতের জাতীয়তা বা জাতীয় সঙ্গীতের কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস-সঞ্জাত কোনো প্রশ্ন অন্য-একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে; আর তা হোলো— অতীত ও বর্তমানের জাতীয়তাবাদ বস্তুটা তাহলে কী? সুপ্রীম কোর্টের রায় বর্তমানের জাতীয়তার ধারণার অন্তঃসারশূন্যতার কথাই কি প্রমাণ করে না?

রামমোহন রায়ের ভাবগত উত্তরাধিকারী মডারেট কংগ্রেসীরা ছিলেন রাজানুগত। জাতীয়তাবাদ এঁদের অবদান নয়। জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের আমলে। এঁরা জাতীয়তাবোধ বা জাতীয়ঐক্যের ভিত্তি সন্ধান করেছিলেন উনিশ শতকের হিন্দুত্বের নবজাগরণের জোয়ারে— যার প্রেরণা এসেছিল মিথিক্যাল (mythical) ভারত থেকে, কল্পনায় গড়া প্রাচীন ভারত থেকে।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের যুগে রথী-মহারথীদের মানসভূমিতে কল্পনায়-গড়া অতীত ভারতের এক মহিমান্বিত চিত্র স্থান পায়। রাজনারায়ণ বসু ১৮৬০ সালে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। নবগোপাল মিত্র বা 'ন্যাশনাল নবগোপাল' 'চৈত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৭ সালে। এসময় হিন্দু-ভদ্রলোকশ্রেণীর মননে ও চিন্তায় ভবিষ্যতের এক বলিষ্ঠ ও স্বাধীন হিন্দুজাতির আকাঙক্ষা জাগ্রত হয়। স্বাজাত্য অভিমান আর স্বদেশগর্ব— পরাধীন মানুষের কাছে অপরিহার্য। তাই বিশ শতকের রাজনৈতিক নেতারাও তাঁদের পূর্বসূরীর পথই অনুসরণ করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'গীতা' আর 'আনন্দমঠ' তাঁদের প্রেরণাস্থল হয়ে ওঠে। তাই উনিশ শতকের ধারা অনুসারী বিশ শতকের জাতীয়তাবাদ হিন্দুত্বের প্রেরণপুষ্ট হয়ে ওঠে। বেদ-বেদান্ত, শক্তির দেবতা কালী, গঙ্গা, জবা, শিবাজী, গো-মাতা ইত্যাদি সবই দেশাত্মবোধের প্রতীক রূপে পরিগণিত হয়। 'হিন্দুত্ব' আর 'ভারতবোধ' প্রায় সমার্থক হয়ে পড়ে। 'নেশন' সম্পর্কে 'ফরাসী ভাবুক' রেনাঁর মত প্রসঙ্গে আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে।" ভারত বা বাঙলার উচ্চবর্ণ হিন্দুর কাছে ভারতের চিত্র, দেশপ্রেমের মন্ত্র, বা জাতীয়তার ধারণা খুব সহজেই রূপ পায় এক 'সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত' অনুভূতির মধ্যে, তার নাম হিন্দুত্ব!

রাজ্য হারানোর নিষ্ফলা ক্রোধ আর হতাশা, ধর্মীয় গোঁড়ামী আর নির্বোধ বিলাসে উচ্চশ্রেণীর মুসলমান যখন মগ্ন, হিন্দুরা তখন নতুন রাজার ছত্রছায়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠায় তৎপর। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের প্রতি ইংরেজের কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হয় অনেক পরে। ইহজগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার 'দৌড় প্রতিযোগিতায়' মুসলমানরা তাই রাজভক্তি আর চাটুকারিতার পথ ধরেন। তাঁরা এক স্বতন্ত্র মুসলিম রেনেসাঁস আর 'এক সমান্তরাল সংস্কৃতি' গ'ড়ে তোলেন। বাঙলাদেশে আব্দুল লতিফ— ধনী ও শিক্ষিত মুসলমানদের উন্নতিকল্পে 'মুহামেডান লিটার‍্যারী এ্যাণ্ড সাইণ্টিফিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৩ সালে। আব্দুল লতিফের আমন্ত্রণে মুসলিম জাতীয়তার হোতা স্যার সৈয়দ এই সোসাইটির সভায় বক্তৃতা ক'রে যান। আব্দুল লতিফের উদ্যোগেই জৌনপুরের মৌলনা কেবামত আলি এই সভায় এসে ঘোষণা করেন ইংরেজের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' যুক্তিপূর্ণ নয়, ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষ 'দার-উল-হারব্' (ইসলামের শত্রুর দেশ) নয়, তা 'দার-উল-ইসলাম' (ইসলামের দেশ); কারণ— মুসলমানের ধর্মীয় বিষয়ে ইংরেজ হস্তক্ষেপ করে না। প্রায় একই উদ্দেশ্য নিয়ে আমীর আলি ১৮৭৭ সালে 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় রামমোহনের মতোই তিনি ইংরেজ-শাসনের দীর্ঘতা আর স্থায়িত্ব কামনা করেন। ইংরেজভক্ত অভিজাত এই মুসলমান ভদ্রলোকটি গণতান্ত্রিক সভ্যতার মূল উপাদান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে মুসলমান-সম্প্রদায়ের পক্ষে অভিশাপরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির ওপর জোর দেন; এবং হিন্দু-ভদ্রসম্প্রদায়কে 'অধিকতর তৎপর প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসেবে বর্ণনা করেন।

প্রধানত হিন্দু-মুসলমান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর অসমান বিকাশের জন্য মুসলমানরা 'ঐতিহাসিক মন্থনজাত' 'মানসিক পরিবার' হিন্দুর 'নেশন'-এর শরীক হ'তে পারেননি। তাঁরা পূর্বপুরুষ ও নিজ ধমনীতে প্রবাহিত বিশুদ্ধ ইসলামিক রক্তের সন্ধানে কল্পনার পথ বেয়ে উপস্থিত হলেন

আরব-ইরানের দুস্তর মরুভূমিতে। যদি হিন্দু-মুসলমান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী শিক্ষায়দীক্ষায় আর সরকারি কর্মপ্রাপ্তিতে সমানভাবে এগিয়ে যেতেন তাহলে বঙ্গসমাজের বা প্রায় একইভাবে ভারতের সমাজে সামাজিক বিভাজনটা সহজ আর স্পষ্ট হোতো— একদিকে উচ্চবিত্ত শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান, অন্যদিকে দরিদ্র অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই এই সামাজিক বিন্যাস সম্পন্ন হ'তে পারেনি। উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দ্বন্দ্ববিহীন 'হোমোজিনিয়াস কমিউনিটি' হিসেবেই ভাবেন ও প্রচার করেন। ব্রিটিশের ইন্ধনের ফলে উনিশ শতকের 'মুসলিম আইডেনটিটি' বিশ শতকে এসে 'মুসলিম নেশন'-এ পরিণত হয়।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী-আন্দোলনেব পূর্ব পর্যন্ত কেতাদুরস্ত বাবুরা রাজনীতির আসরে জাঁকিয়ে বসেছিলেন, "কংগ্রেস কনফারেন্সের মাঝখানে খুব যখন বিলাতী বক্তৃতার ধুম ও চটপটা করতালি; সেখানেও— সেই ঘোরতর সভাস্থলেও, আমাদের যিনি মাতা, তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটুখানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্ত রচিত একটুখানি মিষ্টান্ন, সকলকে ভাগুিয়া বাঁটিয়া খাওয়াইয়া চলিয়া যান, আর যে কী করা হইতেছে তাহা তিনি ভালো বুঝিতেই পারেন না। মাতার মুখের হাসি আরো একটুখানি ফুটিতো, যদি তিনি দেখিতেন, পুরাতন যজ্ঞের ন্যায় এই সকল আধুনিক যজ্ঞে কেবল বই পড়া লোক নয়, কেবল ঘড়ি-চেনধারী লোক নয়— আহূত-অনাহূত আপামর সাধারণ— সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইতো, আড়ম্বরেও কম পড়িতো— কিন্তু আনন্দে মঙ্গলে ও মাতার আশীর্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতো।'

ব্রিটিশ-ভারতের উচ্চবিত্ত বাঙালির প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স্ এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৩৮)-এর আমল থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী-আন্দোলন পর্যন্ত বাঙলা বা ভারতের রাজনীতি ছিল 'কেবল বইপড়া' 'কেবল ঘড়ি-চেনধারী' লোকের। বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথ আপামর জনসাধারণকে রাজনীতিতে টেনে আনার কথা বললেও আজও আপামর জনসাধারণ রাজনীতির কামানের খাদ্য। এই আপামর— হিন্দু-মুসলমান-কৃষক, কারখানার মজুর, গ্রামের কামার, ধোপা, নাপিত, ডোম, হাড়ি, মুচি, বাগদী, সাঁওতাল, মুণ্ডা।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী-আন্দোলনের সময় ভদ্রলোক-রাজনীতিকদের 'মাস'-এর কথা মনে পড়ে, তাই শুরু হয় দেবী প্রতিমার সামনে ব্রিটিশ-পণ্য বর্জনের শপথগ্রহণের পালা। এতে লাভ যত হয়, ক্ষতি হয় তার চেয়ে বেশি। স্বদেশী আমলের প্রথম পর্যায়েও কোনো কোনো মুসলমান-কর্মী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম সঞ্জাত রণধ্বনি 'বন্দে মাতরম্' সদর্পে উচ্চারণ করতেন। কিন্তু হিন্দু-ভদ্রশ্রেণীর ঐতিহ্য-গর্ব, স্বাজাত্য অভিমান, আর ধর্মীয় মূঢ়তা— মুসলমানদের ইংরেজবিরোধী-আন্দোলনের প্রতি ধীরে ধীরে বিমুখ ক'রে তোলে; কারণ তাঁদের পক্ষেও ধর্মীয় মূঢ়তা থেকে মুক্তিলাভের বিশেষ উপায় ছিল না। মুসলমান নেতারাও স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য রাজনীতির আসরে ফুরফুরার পীর আব বকর-এর মতো প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতাদের আমদানি করতে শুরু করেন। তাই বাঙালি বা ভারতের জাতীয়তাবোধের উন্মেষকালেই তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। উভয় সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক জাতীয়-চেতনা শেষপর্যন্ত দেশবিভাগ আর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় পরিণতি লাভ করে।

১৯৩৫ সালে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থাকে বিস্তৃত করা হয়। এসময় থেকে মুসলমান ছাড়া শিখ, খৃষ্টান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্যও পৃথক পৃথক 'রাজনৈতিক কম্পার্টমেন্ট' তৈরি ক'রে দেওয়া হয়। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দেশবিভাগের অব্যবহিত-পূর্বে (১৯৪৬) পাঞ্জাবের আকালি দল ব্রিটিশ-সরকারের কাছে দাবি জানায় মুসলমান-সম্প্রদায়কে পাকিস্তান উপহার দিলে শিখ-সম্প্রদায়ের জন্যও একই সঙ্গে স্বাধীন সার্বভৌম শিখরাষ্ট্র গঠন করতে হবে। সেসময় সার্বভৌম শিখরাষ্ট্র গঠিত না হ'লেও ব্রিটিশ-আমলের শিখ-মুসলমান দ্বন্দ্ব দেশবিভাগের পর শিখ-হিন্দু দ্বন্দ্বে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ-ভারতের 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি অথবা 'রামরাজ্য'-এর কল্পনার সঙ্গে খৃষ্টানরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাত্ম হ'তে পারেননি। বাজার ধর্ম আর তাঁদেব ধর্ম এক, এই বোধ বরং অনেক ক্ষেত্রে খৃষ্টানদের ইংরেজবিরোধী হ'তে বাধা দেয়। স্বাধীন 'সেকুলার' ভারতে হিন্দু খৃষ্টান দাঙ্গা হ'লেও সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকার জন্য 'খৃষ্টান আইডেনটিটি' 'মুসলিম আইডেনটিটি'র মতো সুসংবদ্ধ নয়। তবে স্বাধীন ভারতে ডান-বাম-নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলি ক্যাথলিক ভোট সংগ্রহের জন্য পাদ্রীদের ব্যবহার ক'বে থাকে। সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে 'Propagate' বা ধর্মপ্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে প্রধানত ক্যাথলিক পাদ্রীদের কথা মনে রেখেই। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকরা এতে অসন্তুষ্ট, আর সাধারণ হিন্দু ও খৃষ্টানদের মধ্যে রয়েছে শতবর্ষ-সঞ্চিত দুস্তর মানসিক ও সামাজিক দূরত্ব আর বিচ্ছিন্নতা।

দেশবিভাগেব পর রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অনুসৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র জন্য— যা প্রকৃতপক্ষে "একটা পোশাকি ধর্ম— সাম্প্রদায়িকতার আর একটি নূতন নাম,"[১] —বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক 'আইডেনটিটি' বজায় রয়েছে; তাই 'সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত' 'মানসিক পরিবার'-এ একাধিক সদস্য জোটেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বাভাবিক সুবিধার জন্য হিন্দুরা সহজেই 'সেকুলার'[২] হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন, কিন্তু প্রাচীন 'সনাতন' ভারতীয় আদর্শে মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় সশ্রদ্ধ আস্থা স্থাপন ক'রে হিন্দু-ধর্মাশ্রয়ী ভারতীয় জাতীয়তার শরিক হ'তে পারলেন না।

ধর্মীয় স্বাধীনতার সাংবিধানিক সুবিধার জন্য হিন্দু-সাম্প্রদায়িকরা ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হুঙ্কার ছাড়েন; আর সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা সংসদীয় গণতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেন, জাতীয় পতাকা পোড়ান, আর ভারতে 'ইসলামিক রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার খোয়াবে মশগুল থাকেন। শিখ সমস্যা তো তুঙ্গে! এহেন অবস্থায়, যে দেশে জাতীয়তাই দানা বাঁধেনি, যে দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ 'সাম্প্রদায়িক আইডেনটিটি' আর জাতীয়তাকে প্রায় সমার্থক ব'লে মনে করেন, সে দেশের জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক অবশ্যম্ভাবী।

সংবিধানের ১৯ (১) (ক) ধারা হোলো বাক্‌স্বাধীনতার স্বীকৃতি। এদেশে মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো কবির কণ্ঠরোধ করা হয়, কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতাব সুযোগে প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করলে তা দূষণীয় হয় না। সংবিধানের ২৫ (১) ধারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মপালন ও প্রচারের অধিকারের স্বীকৃতি, অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে। এর অর্থ— ভারতে নিষ্ক্রিয়-সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণভাবে সংবিধানসম্মত।

আমরা মনে কবি ভারতে ধর্মপালন সংক্রান্ত সাংবিধানিক অধিকার এক 'মানসিক পরিবাব'

গঠনের পথে প্রধান অন্তরায়। ভারতের প্রচলিত ইতিহাসে এমন কোনো অধ্যায় নেই যার সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-পার্শী একইভাবে গৌরববোধ করতে পারেন। তাই প্রয়োজন রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের। জাতীয়তার চিন্তা ধর্মান্ধতার সঙ্গে যুক্ত থাকলে কোনোদিনই ভারতের জাতীয়তা গ'ড়ে উঠবে না। ব্রিটিশ-ভারতে নিচুতলার মানুষদের সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য অটুট ছিল; সেই ঐতিহ্যের পথ ধ'রে আজকের ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-সংগ্রাম পরিচালনা করলে প্রাদেশিক চিন্তা আর ধর্মান্ধতা হ্রাস পাবে। তখন 'বদ্না-গাড়ুতে ঠোকাঠুকির' সম্ভাবনা আর থাকবে না। তখনই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী-জাতীয়তাবোধ বিকাশ লাভ করবে; 'ঘড়ি-চেনধারী' শাসকদের প্রচারিত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপষমূলক কৃত্রিম জাতীয়তা নয়, প্রকৃত জাতীয় চেতনা, যা সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের পরাভূত ক'রে, 'সাম্প্রদায়িক আইডেনটিটি' লুপ্ত ক'রে শ্রমজীবীকে মুক্তির পথ দেখাবে; ভারতের মানুষ তখন 'বন্দে মাতরম্' বা 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা' প্রশ্নে অনর্থক বিতর্ক জলাঞ্জলি দিয়ে গেয়ে উঠবেন, স্বদেশী যুগের নাম-না-জানা এক কবির সুরে "কোটি প্রাণ খুলে কোটি তান তুলে কাঁপায়ে ভুবন/জয় জন্মভূমি জয় জয় রবে/শিখ মুসলমান হিন্দুর সন্তান কোটি কোটি ভাই এক হয়ে যাই/কী ভয় কী ভয় আর এ ভবে।"

আজকে এই উজ্জ্বল ধারাবাহিকতা বলিষ্ঠতর রূপে প্রকাশ পায় ওপার বাঙলার শ্রবজীবী মানুষের কবি আল মাহ্মুদের কণ্ঠে, "আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন/পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ....!"

টীকা ও তথ্যসূত্র

১। আবুল ফজল; 'মানবতন্ত্র'; অরুণ সেন আবুল হাসনাত (সম্পাদনা) 'বাঙালি ও বাংলাদেশ', কোলকাতা ১৯৯৯; পৃষ্ঠা ৩৪

২। "এটা আমাদের সম্যকভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ যে, শতকরা আশিজন হিন্দুর মধ্যে উনআশিজন সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী নন। যদি তাঁরা সাম্প্রদায়িক ভাবনায় ভাবিত হতেন তাহলে কোনো আইন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা মুসলমানদের গণনিধন থেকে বাঁচাতে পারতো না।" S.K. Ghosh; Communal Riots in India : Meet the Challenge Unitedly. New Delhi 1987. pp. 50-51.
কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন আছে?

[অনীক; নভেম্বর ১৯৮৬]

বিবেকানন্দের রাজনীতি

['উৎস মানুষ' পত্রিকার এপ্রিল ১৯৮৪ সংখ্যায় নিরঞ্জন ধর মহাশয়ের 'বিবেকানন্দের স্বদেশ ভাবনা' নামের লেখাটি পড়ার সুযোগ হয়েছিল। ধর মহাশয়ের বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করায় আমরা একটি চিঠি 'উৎস মানুষ'-এর দপ্তরে পাঠাই. 'উৎস মানুষ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী সে চিঠি প্রকাশ করেননি। এরপর 'বর্তমান লোকায়তিক' পত্রিকায় (দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৯২ সন) সে চিঠি প্রকাশিত হয়। তাঁরা ধন্যবাদার্হ। বর্তমানে আমরা আমাদের সেই চিঠির মূল বক্তব্যকেই পরিমার্জন, পরিবর্দ্ধন ক'রে সঙ্কলিত করলাম।]

সম্পাদক 'উৎস মানুষ'—

আপনাদের পত্রিকায় গত এপ্রিল, ১৯৮৪ সংখ্যায় নিরঞ্জন ধর মহাশয়ের 'বিবেকানন্দের স্বদেশ ভাবনা' লেখাটি পড়ার সুযোগ হয়েছে, কিছু কথা নিবেদন করছি।

নিরঞ্জনবাবুর বক্তব্যকে সংক্ষেপে এভাবে সাজানো যেতে পারে ঃ

ক) "বিবেকানন্দ যখন চিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন তখন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এক ভয়াবহ অর্থনীতিক মন্দার ভেতর দিয়ে চলেছিল যার ফলে সেদেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। মূলত তাদের ধূমায়িত অসন্তোষবহ্নির উপর জল নিষেক করার উদ্দেশ্যেই সেখানকার শাসক-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট ধর্মসভার আয়োজন.... বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় যোগ দিয়ে আমেরিকার শাসক-শোষকশ্রেণীর প্রচেষ্টার সামিল হয়েছিলেন।"

খ) "স্বদেশের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তাঁর পরিকল্পিত 'দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মপন্থা' রূপায়িত করতে বিদেশী শক্তির অবসান ঘটিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের কোনো কথা উল্লেখ করেননি।...."

গ) "পরাধীন দেশের অধিবাসীদের পক্ষে রাজনীতি তাদের নিশ্বাসবায়ুর মতনই অপরিহার্য....", অথচ "রাজনীতিক আন্দোলনকে তিনি 'বাঁদরামি' ব'লেও নিন্দাও করেছেন....

ঘ) "বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বিবেকানন্দকে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি...."

ঙ) "স্বামীজী ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন...."

চ) "বিবেকানন্দের প্রভাবে কোনো গণআন্দোলন গ'ড়ে উঠতে আমরা দেখিনি। মাত্র মুষ্টিমেয় বিপথে-পরিচালিত-সন্ত্রাসবাদীরাই তাঁর বক্তৃতা ও রচনা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন....।"

ছ) বিবেকানন্দই "হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা...." এবং "পাকিস্তান সৃষ্টির দায়িত্ব নিঃসন্দেহে অনেকটা বিবেকানন্দের ওপর বর্তায়.... বিবেকানন্দই হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙেঘর আদি জনক।"

ব্রিটিশ-অধীন ভারতবর্ষে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা— সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান ছাড়া সম্ভব ছিল না; প্রয়োজন ছিল এক সশস্ত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের। কিন্তু পরাধীন ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' ও তার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নেতা মহাত্মা গান্ধী এই সশস্ত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে চাননি। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, ভারত অনির্দিষ্টকাল পরাধীন থাকলেও সশস্ত্র বিপ্লবের পথে তিনি স্বাধীনতা অর্জন করতে চান না। [Edward McNall Burns; Ideas in Conflict. London 1963, p. 533]।

অধ্যাপক এ. আর. দেশাই বলেন, যুদ্ধ ঘটিত হিংসায় শর্তসাপেক্ষে অংশগ্রহণে আপত্তি না থাকলেও ভাবতেব জাতীয় কংগ্রেস কেন ক্রমবর্দ্ধমান গণসংগ্রামে, যেমন— শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষক-সংগ্রাম, মধ্যবিত্তের জঙ্গী লড়াই, সেনাবাহিনীতে ধূমায়িত অসন্তোষ, ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহ ইত্যাদিতে নেতৃত্বদানে বিরত থাকে? কেন কংগ্রেস এই লড়াইগুলি ঐক্যবদ্ধ করে, উন্নত ক'রে সারা দেশব্যাপী এক প্রচণ্ড বৈপ্লবিক লড়াই মারফৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসন উচ্ছেদ ক'রে স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়নি? [A. R. Desai; Recent Trends in Indian Nationalism. Bombay 1973 p. 49]।

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়— নিরঞ্জনবাবুর মন্তব্য মান্য করলে ইতিহাস অমান্য করা হয়।

বস্তুত, বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল এক শক্তিশালী ভারত গঠন— আর এর পথ কংগ্রেসের মতো আবেদন-নিবেদনের পথ নয়; তাঁর পথ দেশীয় ঐতিহ্যের সদর্প ঘোষণা। চিন্তার অস্পষ্টতা থাকলেও তিনি তাঁর যুগের তুলনায় প্রগতিবাদী কথাই চিন্তা করেন, "সর্বশেষ শূদ্রযুগের আবির্ভাব ঘটবে...." এ যুগে বিবিধ "অসুবিধা" থাকলেও, "....এটুকু বুঝতে পারি যে, সোনার ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে.... অন্তত জিনিসটির অভিনবত্বের জন্যও শূদ্রযুগকে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে।" [বিবেকানন্দ রচনাবলী ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯]— ইত্যাদি। অথবা "যতদিন কোটি কোটি লোক বুভুক্ষা ও অজ্ঞানতার মধ্যে বাস করবে ততদিন প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষকে আমি বলবো বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী— কারণ এই দরিদ্রসাধারণের স্বার্থের বিনিময়েই এরা প্রত্যেকে লেখাপড়া শিখছে.... ভাইসব, আমরা দরিদ্র, আমরা তুচ্ছ নগণ্য, কিন্তু সর্বোত্তমের হাতে সর্বকালে এইরকম নগণ্যরাই তো হাতিয়ার হয়ে এসেছে।"

আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দু'চারজন ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিই সে যুগে এত স্পষ্টভাবে সমাজবিপ্লবের কথা বলেননি।

বিবেকানন্দ নিজেই বলেছিলেন তিনি রাজনীতিক নন। কিন্তু শুধু ঔপনিবেশিক সমাজেই নয়, সর্বদেশে সর্বকালে প্রতিটি মানুষই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে রাজনীতি করেন; যেমন বিবেকানন্দ করেছিলেন বা নিরঞ্জনবাবু করছেন।

বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য ছিল 'man making religion'-এর প্রচাব। তিনি বলেন, "গীতা প'ড়ে স্বর্গের যত কাছাকাছি যাওয়া যায়, তার বেশি যেতে পারবেন ফুটবল খেলে।" [বিবেকানন্দ বচনাবলী ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮] বিবেকানন্দ মানুষ গড়ার উদ্দেশ্য নিয়েই কুসংস্কারের পবিবর্তে

পক্ষে কথা বলেন, যখন না-কি— নিছক কোনো ধর্মবেত্তা ভুলেও এমন কথা উচ্চারণ করবেন না।

বিবেকানন্দ বলেন, ''আর একবার ভারতকে পৃথিবী জয় করতে হবে।'' এই 'পৃথিবী জয়' করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি চিকাগোর ধর্মসভায় গেছিলেন। ভারতীয় জনসাধারণের ওপর ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ হিন্দুঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থনে খৃষ্টান পাদ্রীদের খৃষ্টানিজম প্রচারের উৎকট বাড়াবাড়ি আর মেকলে সাহেবের ঔদ্ধত্যপূর্ণ 'অ্যাংলিসিস্ট পলিসি'র প্রতিবাদ হলেন বিবেকানন্দ। ভারত সম্পর্কে তখন আমেরিকানদের ধারণা ছিল, ভারতবর্ষ মানে অনাচার কুসংস্কার আর অন্ধকারের একটা স্তূপ; আর ইংরেজদের দাবি ছিল, সেখানে তারা জ্ঞান প্রজ্ঞা আর আধুনিকতার দীপ জ্বালিয়েছে। ডেট্রয়েটে বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করা হয়, ''ভারতের লোক কি শিশুদের কুমীরের মুখে ফেলে দেয়?'' ''তারা কি জগন্নাথের রথের তলায় নিজেদের জীবনপাত করে?'' ''তারা কি বিধবাদের তাদের স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারে?'' এ ধরনের প্রশ্ন থেকেই তৎকালের ভারত সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি অনুমান করা যায়। বিবেকানন্দের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'-এ লেখা হয়, ''তাঁর বক্তৃতা শুনে বোঝা গেল যে [ভারতের মতো] জ্ঞানী দেশে মিশনারী পাঠানো কত বড় মূর্খামী!''

নিরঞ্জনবাবু একটি সত্য গোপন করেছেন, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি-বক্তা হিসেবে বিবেকানন্দ চিকাগোতে আমন্ত্রিত হননি; তিনি কিছু ধনী ব্যক্তির সহায়তায় নিজস্ব উদ্যোগে সেখানে গেছিলেন। সুতরাং বিবেকানন্দ সি.আই.এ.-র এজেন্ট-এর পূর্বসূরী, একথা বলা যায় না, নিরঞ্জনবাবু যা বলতে চেয়েছেন।

বিবেকানন্দ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিলেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি তাঁর ইংরেজ শিষ্যদের বলেন, ''....যেদিন হিন্দুদের মোহ কেটে যাবে এবং ভিতরকার সুষুপ্ত শক্তি জাগ্রত হবে, সেদিন লেবু নিংড়ানোর মতো তোমাদের [ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের] সব চেপটে ফেলবে, will squeez you like lemon....।'' বিবেকানন্দের এই তীব্র দেশপ্রেম আর আক্রমণাত্মক হিন্দুত্বের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই আত্মঘোষণা, এই আত্মপ্রত্যয়ের বিশেষ অভাব ছিল। তাই এই ধর্মাশ্রয়ী আত্মঘোষণাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মতবাদ রূপেই গণ্য করা উচিৎ, ধর্মাশ্রয়ী রূপ তাঁর ভাবনার আবরণ মাত্র। তিনি অন্যত্র বলেন, ''এটা পরিষ্কার যে ধর্মের সঙ্গে সমতা রেখে আধুনিক বস্তুবাদী বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিকে বেদান্তবাদী অর্থাৎ হিন্দুরাই গ্রহণ করতে সক্ষম।'' আমাদের ধারণা, বিবেকানন্দ সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেন, ধর্মের আবরণ না থাকলে তাঁর সমসাময়িককালের ভারতবর্ষ জড়বাদ অর্থাৎ নাস্তিকতা তথা সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণে বিমুখ হবে। এ কারণেই বঙ্গসমাজ ডিরোজিও ও তাঁর ভাবশিষ্যদের বা অক্ষয় দত্তের নাস্তিকতার বার্তা গ্রহণ করেনি।

নিরঞ্জনবাবু বিবেকানন্দকে 'আসামীর কাঠগড়ায়' দাঁড় করিয়েছেন; তাঁর অভিযোগ নরেন দত্ত— ''রাজনীতিক আন্দোলনকে 'বাঁদরামি' ব'লে নিন্দাও করেছেন....।'' 'মডারেট' রাজনীতির সমালোচনা ক'রে বিবেকানন্দ বলেন, বণিকের জগতে ভিক্ষাপাত্রের কোনো স্থান নেই। তিনি বলেন, ''ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস ক'রে মিছিমিছি হৈচৈ করছে কেন? কতকগুলো

হাউড়ে লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়? চেপে বসুক, নিজেদের independent ব'লে declare করুক, হেঁকে বলুক 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম.... বিধিমতে কাজ ক'রে যাবো, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক.... কংগ্রেস জোর গলায় নিজেদের স্বাধীনতা declare করুক, শুধু মাগীদের মতন ব'সে ব'সে কাঁদুনি গাইলে কি হবে?"

ব্রিটিশের অনুগ্রহপ্রার্থী পুঁজিবাদী আর সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি 'মডারেট' কংগ্রেসীদের এত স্পষ্ট সমালোচনা 'অরাজনৈতিক' বিবেকানন্দের রাজনৈতিক বাসনার প্রতিচ্ছবি।

নিরঞ্জনবাবু লিখেছেন, "... কংগ্রেসের মধ্যে তিলকের নেতৃত্বে একটা চরমপন্থী অহিংসা ধারাও সক্রিয় ছিল। স্বামীজী তাঁর কাজকর্ম ও বক্তৃতাদির দ্বারা উক্ত ধারাটিকে পুষ্ট ক'রে তুলতে পারতেন....।" একথা ঠিক— তিলক 'চরমপন্থীদের' (প্রকৃতপক্ষে এঁদের বলা উচিৎ জাতীয়তাবাদী) নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু তিলক ছিলেন 'কৌশলগতভাবে সাম্প্রদায়িক'। ১৮৯০ সালের পরে তিনি 'গো-রক্ষা সমিতি' স্থাপন করেন। এই আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। *বিবেকানন্দ গো-রক্ষা আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে তিলককে সমর্থন না ক'রে সুস্থ রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই* পরিচয় দেন। নবহিন্দুবাদ আন্দোলনের অন্যতম জ্ঞানবান ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও বিবেকানন্দ জাতপাত-ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার অনেক উর্দ্ধে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মুসলমানদরদী। নরেন দত্ত সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় পরিচয়ের উর্দ্ধে উঠে বলেন, "ভারতবর্ষের গরিবদের মধ্যে মুসলমান এত বেশি কেন? তরবারির সাহায্যে এদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে বলাটা বাজে কথা। তারা মুসলমান হয়েছে সেই সব জমিদার এবং সেই সব.... পুরোহিতদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য। তাই দেখতে পাবেন, ভারতবর্ষে যেহেতু অনেক জমিদার সেই কারণে চাষিদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বেশি। অধঃপতিত দলিত এই সব কোটি কোটি মানুষকে উন্নত ক'রে তোলবার কথা কে ভাবে? হাজার কয়েক স্নাতক দিয়ে কিংবা কতিপয় ধনী দিয়ে একটি জাতি তৈরি হয় না.... আমি ভালোবাসি দীন দরিদ্রদের, সেই অজ্ঞ পদদলিতদের।" —এমত চিন্তা আজও দুর্লভ বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

ভারতের রাজনীতিতে 'মডারেট' আর জাতীয়তাবাদীদের দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাত বিস্তার লাভ করে— বঙ্গভঙ্গবিরোধী (১৯০৫) আন্দোলনের সমসাময়িককাল থেকে। এ সময়েই জাতীয়তাবাদীরা অধিকতর সংগঠিত হয়ে ওঠেন। বিবেকানন্দ তখন মৃত। নরমপন্থী বা 'মডারেট' রাজনীতিকদের রাজনীতি— ভারতের শোষিত জনসাধারণের কাছে 'নিঃশ্বাসবায়ুর' মতো অপরিহার্য ছিল না, কংগ্রেস "সেফটি ভালভ" হ'লে তা শোষিতের কাছে অপরিহার্য হয় কী ক'রে? প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭) উত্তর অগ্নিগর্ভ ভারতে গণ-অসন্তোষ অবরুদ্ধ করার প্রয়াসেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৮৮৫ সালে এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম-এর উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম দেয়।

নিরঞ্জনবাবু হয়তো ১৮৫৭-র স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'ভাড়াটে' লেখকদের মতো "সামন্ততান্ত্রিক ভারতের অন্তিম আর্তনাদ" ব'লেই মনে করেন। বিবেকানন্দ প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইলে কোনো অন্যায় করেননি। কোনো ব্যক্তি রাজনীতি এড়িয়ে চলতে চাইলে ১৮৫৭-

র পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইবেন কেন? নিরঞ্জনবাবু স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ও শ্রেণীগত অবস্থানের জন্য বিবেকানন্দ ১৮৫৭-র স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারেননি। কিন্তু বাঙলার তারুণ্যকে তিনি রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর আদর্শ অনুসরণ করতে বলেছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক না হ'লে তিনি একথা বলতেন না।

নিরঞ্জনবাবুর মতে বিবেকানন্দের প্রভাবে কোনো গণআন্দোলন গ'ড়ে ওঠেনি; মাত্র মুষ্টিমেয় বিপথে-পরিচালিত সন্ত্রাসবাদীরাই তাঁর রচনা ও বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পান। নিরঞ্জনবাবু যথেষ্ট পণ্ডিত তাই ইতিহাস বিকৃতির কাজে তিনি অত্যন্ত দক্ষ!

১৯০১ সালে পূর্ববাঙলার "সন্ত্রাসবাদী" হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর কয়েকজন 'কমরেড' (এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মৌলবী আলিমুদ্দিন) বিবেকানন্দের আশীর্বাদ নিতে যান। হেমচন্দ্র ঘোষের চিঠি বিবেকানন্দের রাজনৈতিক চিন্তার এক অনবদ্য দলিল। বিবেকানন্দ বিপ্লবী তরুণদের বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বারবার পাঠ করতে বলেন এবং বঙ্কিমের দেশভক্তি অনুসরণ করতে বলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, সর্বাগ্রে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ সশস্ত্র সংগ্রামকেই ভারতের মুক্তির একমাত্র পথ ব'লে বিশ্বাস করতেন, "বিপ্লবোদ্দেশ্যে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিবো। Sir Hiram Maxim-এর সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি— কিন্তু ভারত গলিত হইয়াছে....।"

বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, "তিনি দেখিয়া যাইবেন ভারত একটি বারুদের স্তূপ হইয়া আছে। তিনি জীবদ্দশায়ই বিপ্লব দেখিয়া যাইবেন বলিযা আশা রাখিতেন।" [ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতাব সংগ্রাম; কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৯৯]।

শোনা যায় কামাখ্যা মিত্রকে বিবেকানন্দ বলেন, আজ ভারতের প্রয়োজন হোলো বোমা। "বিপথগামী" যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন— বিপ্লবী পুস্তকাদির অভাবে তাঁরা স্বামীজীর রচনা পড়তেন, যা তাঁদের হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতো। এই দেশপ্রেমিক সাধুর কাছে তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। বিপ্লবীদের কাছে বিবেকানন্দ — ধর্মনেতা অপেক্ষা রাজনৈতিক 'প্রফেট' হিসেবেই বেশি শ্রদ্ধা পেতেন। রম্যাঁ রলাঁ বলেছেন, "ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বহুদিন ধ'রেই ধূমায়িত হচ্ছিল, বিবেকানন্দের শিক্ষায় (Vivekananda's breath) ভস্মকে বহ্নিতে রূপান্তরিত করে যা তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পরে প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করে।" প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দ-প্রচারিত 'মানুষ গঠনের ধর্ম' এবং 'মাদার কাল্ট' বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পূর্ণতর রূপ লাভ করে। অধ্যাপক বিনয় সরকারের মতে ১৯০৫-এর ঘটনাবলীর পথ প্রস্তুত করেন বিবেকানন্দ এবং [এক অর্থে] তিনি বাঙলার বিপ্লবের রুশো। 'সিডিশন কমিটি'র রিপোর্টেও বিবেকানন্দের বিপ্লবী ভূমিকার কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিবেকানন্দ বলেন— ভীরুতার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। স্বাধীনতা বীর এবং সাহসীর জন্য।

নিরঞ্জনবাবুর মতে বিপ্লবীরা বিপথগামী সন্ত্রাসবাদী। হেমচন্দ্র ঘোষ, যাদুগোপাল, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতা ও তাঁদের অনুগামীদের 'সন্ত্রাসবাদী' ও তাঁদের আদর্শকে 'সন্ত্রাসবাদ' ব'লে চিহ্নিত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। নিরঞ্জনবাবুর উক্তি ব্রিটিশের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র!

নিরঞ্জনবাবু বিবেকানন্দকে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা এবং পাকিস্তান সৃষ্টির অনেকখানি দায়িত্বের ভাগী করেছেন। তাঁর মতে বিবেকানন্দ আর এস.এস.-এর আদি জনক। নিরঞ্জনবাবুর মতো অলোকসামান্য প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্য না থাকলেও দেশের লোক কিন্তু কিছু কিছু খবর রাখেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে বহু অর্থনৈতিক রাজনৈতিক তথা সামাজিক কারণ বর্তমান। এর জন্য দায়ী ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতি— হিন্দু-মুসলমান উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর অসম বিকাশ, 'জাতীয় কংগ্রেস', 'হিন্দু মহাসভা', 'মুসলিম লীগ' ইত্যাদিকে দায়ী করা যায়। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ বিবেকানন্দের জন্মের বহু আগে থেকেই বিভেদ নীতি চালু করে। প্রকৃতপক্ষে এর সূত্রপাত ঘটে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলেই। ১৮২১ সালে 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতি প্রয়োগ করার ঘোষিত নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৮৭১ সালে হাণ্টারের 'দী ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই অভিসন্ধিমূলক পুস্তকে হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। খুব সঙ্গত কারণেই এই পুস্তকের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তা জাতীয়-সমাজজীবন ও রাজনৈতিক-জীবনকে কলুষিত করে।

নরেন্দ্র যে ইসলাম ও 'প্রফেট'কে শ্রদ্ধা করতেন তা বোঝা যায় তাঁর উক্তি থেকেই, "হজরত মহম্মদ দেখিতেন যে, দেবদূত সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেক কথা বলিয়া যাইতেছেন এবং তিনি তাহাই শুনিতেছেন। পরে সেই সকল বিষয় তাঁহাব শিষ্যমণ্ডলীকে বলিতেন. .. তাঁহার অধ্যাস অনুযায়ী সত্য দর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রবণ করিযাছিলেন।" তিনি বলেন, দেশমাতার জন্য— হিন্দুবাদ আর ইসলামের মিলন প্রয়োজন।

নরেন দত্তের জন্মের আগে থেকেই ভেদনীতি চালিয়ে আসছিল ব্রিটিশ, আমরা যা আগেই উল্লেখ করেছি। অন্তত বাঙলাদেশ ভাগ হবার প্রধানতম কারণ ছিল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তখন বিবেকানন্দের বাবাও জন্মগ্রহণ কবেননি।

ভারতবর্ষে সেকুলার জাতীয়তাবাদ কোনোদিনই ছিল না, আজও নেই। ভারত বিভাগের জন্য বিবেকানন্দ "অনেকটা" দাযী, এমত 'মূল্যবান' ও 'সারগর্ভ' মন্তব্য ইতিহাসসিদ্ধ কি-না তা আমাদের জানা নেই। সম্ভবত, ধর মহাশয় 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'-এর 'একাত্মতা যজ্ঞ'-ওয়ালাদের প্রচারপত্রে বিবেকানন্দের ছবি দেখে বেচারা নবেন দত্তের 'মহামূল্যবান' 'সারগর্ভ' মূল্যায়ন করেছেন!

বিবেকানন্দের বেদান্ত, বা তাঁর 'রামকৃষ্ণ মিশন' ইত্যাদি নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই, আমাদের ধারণা— তিনি ঠগবাজ বা ধান্দাবাজ ছিলেন না। তাঁব ধার্মিকতা নয়, তাঁর রাজনীতিটাই আমাদের কাছে প্রধান বিষয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং শ্রেণীগত অবস্থানের জন্য তিনি অনেক সময় বিজ্ঞানবিরোধী বা স্ববিরোধী উক্তি করেছেন, তাও ঠিক, কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর ইতিবাচক দিকটাই প্রধান হয়ে ওঠে। তাঁর স্বদেশপ্রেম, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ধর্ম-বাক্যের আবরণে। তিনি গঙ্গার শোভা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "হিন্দু বিদেশে যায় সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা.... এবার তোমরাও পাঠিয়েছো দেখছি মাকে মান্দ্রাজের জন্য. . সে দেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন.. ঐ যে চকচকে কামানো টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল তো ওর কাছে মাখম, যত পারো

ভেঙো.... উঁহু; মা কি শোনে। তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, মা দেখ, ঐ যে পাগড়ি মাথায় জামা গায়ে চাকরগুলি ... ওরা হচ্ছে নেড়ে— আসল গরুখেকো নেড়ে, আব ঐ যারা ঘরদোর সাফ ক'রে ফিরছে, ওরা হচ্ছে— আসল মেথর.... যদি কথা না শোনো তো ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইছি আর কি.... শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা— ভক্ত পেলেই— ঘাড়ে চ'ড়ে বসেন।"

এত লঘুচ্ছলে যিনি যুক্তিবাদ ও কুসংস্কারবিরোধী প্রচার করতে পারেন, তাঁকে আর.এস.এস.-এর "আদি জনক" বলতে আমাদের আপত্তি আছে। বর্তমানের "হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি"রা অবশ্য নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে একমত হবেন।

কার্ল মার্ক্স প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতকে বুর্জোয়া যুগের উপযুক্ত ধর্ম বলেছিলেন। আমরা একথার অনুকরণে বলতে পারি বিবেকানন্দের "হিন্দুত্ব" তাঁর রাজনৈতিক বাসনা প্রচারের প্রয়াস। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুসংস্কার-মুক্ত 'man making religion'-এর প্রচারক বিবেকানন্দের বাজনীতি, অতি অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধামিশ্রিত আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেছেন, "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মাব মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষেব ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকাব কবিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কাবের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহাব জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ কবিবাব. মিলন করিবার, সৃজন করিবাব প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভাবতবর্ষে দিবার ও লইবাব পথ বচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" ধৃষ্টতাব সীমা ছাড়িয়ে আমরা বলতে পারি— পশ্চিমের যুক্তিবাদ সমাজতন্ত্রবাদ আর ভারতীয়ত্বেব তথা স্বাজাত্যেব গর্বিত অভিমানের মিশ্রণের দৃপ্তরূপের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ দত্ত। উপসংহারে সাহসী দেশপ্রেমিক 'গোরা'ব স্রষ্টার ভাষায় বলি— "গোরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল— আনন্দময়ী তাঁহাব ঘবের সম্মুখে বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন।

গোরা আসিযাই তাঁহার দুই পা টানিযা লইয়া পাযেব উপর মাথা রাখিলো। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তাহাব মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।

গোরা কহিলো, 'মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘবেব মধ্যে এসে ব'সে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই— শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।' "

ভাষা নিয়ে রাজনীতি ঃ সেকালে ও একালে

স্বাধীন, সেকুলার, গণতান্ত্রিক, মহান ভারতে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হোলো বাবরি মসজিদের ধ্বংস সাধন। কেন্দ্রের নরসীমা রাও সরকারের চোখের সামনে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবার পর মুসলমান সম্প্রদায়ের মননে-চিন্তনে ক্ষতের ওপর প্রলেপ লাগাবার জন্য সরকার দূরদর্শনে উর্দু খবর সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে; এবং হায়, এ নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয়। এর কারণ, এদেশের দুর্ভাগ্য, নেতৃবর্গ এবং অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমান মনে করেন— উর্দু হচ্ছে মুসলিম ভাষা এবং মুসলমানের ভাষা। এ কারণে উর্দুভাষা নিয়ে রাজনীতি করা হয়। এর সূচনা ইংরেজ আমলেই। ইংরেজ রাজারা বহুবিধ কৌশল অবলম্বন ক'রে জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে উর্দু 'মুসলিম ভাষা' এবং দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দি ও সংস্কৃত হোলো 'হিন্দুভাষা'। ভাষা নিয়ে এই রাজনীতি করার ক্ষেত্রে ইংরেজকে সাহায্য করে তার এদেশীয় অনুচরেরা। নরসীমা রাও ভাষা নিয়ে রাজনীতি করার পাঠ পেয়েছেন ইংরেজের কাছেই।

ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়— "শক হূন দল পাঠান মোগল" একদেহে লীন হয়েছে এই ভারতের মাটিতে। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনেই ভারতের সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মুসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহিরে তাহার মূল ছিল না। এইজন্য মুসলমান ও হিন্দুসভ্যতা পরস্পর জড়িত হইয়াছিল; পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক আদানপ্রদানের সহস্র পথ ছিল। এইজন্য মুসলমানের সংস্রবে আমাদের সঙ্গীত সাহিত্য শিল্পকলা বেশভূষা আচারব্যবহার, দুই পক্ষের যোগে নির্মিত হইয়া উঠিতেছিল.... সমস্ত শিল্পকলা হিন্দু ও মুসলমান কারিকরের রুচি ও নৈপুণ্যে রচিত....।"

হিন্দু-মুসলমান "ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে" আবদ্ধ হবার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার এক অত্যুৎকৃষ্ট ফসল হোলো উর্দুভাষা! রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "উর্দুভাষায় যতই পারসী এবং আরবী শব্দ থাক্ না তবু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন তাহা ভারতবর্ষীয় গৌড়ীয় ভাষারই এক শ্রেণী. ..". আবার রবীন্দ্রনাথের শরণ নিয়ে বলা যায়, "উর্দুভাষার ব্যাকরণগত ভিত্তি ভারতবর্ষীয়, তাহার অভিধান বহুল পরিমাণে পারসিক ও আরবী.... উর্দুভাষা হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত" ভাষা। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক পণ্ডিত এ. আবদুল হাসান আলি নাদভী বলেছেন— চারটি 'ক্ল্যাসিকাল' ভাষার সংমিশ্রণে উর্দুভাষার সৃষ্টি হয়েছে; এই চারটি ভাষা হোলো আরবী, ফার্সী, তুর্কী, ও সংস্কৃত।[১] এম. আর. এ. বেগ্ বলেছেন— উর্দুভাষার উদ্ভবের ক্ষেত্রে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরই অবদান বেশি। তিনি বলেছেন, কোনো বিশেষ অর্থে উর্দু কখনোই— "মুসলিম ভাষা" বা "মুসলমানের ভাষা" ছিল না এবং [এখনও] নয়! উর্দু কখনোই মুসলমান সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠাংশের মাতৃভাষা ছিল না এবং [এখনও] নয়! উর্দুর কোনো হরফলিপি নেই; ফার্সী হরফে উর্দু লেখা হয়ে থাকে,

এ কারণে উর্দুভাষাকে "মুসলিম ভাষা" হিসেবে প্রচার করা হয় এবং প্রচারের ফলে অধিকাংশ মানুষই বিভ্রান্ত হন।

ব্রিটিশ আমলে উত্তরপ্রদেশ বা দিল্লি অঞ্চলে সাধারণের মুখের ভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও, বাঙলার মানুষের কাছে উর্দু ছিল এক বিজাতীয় ভাষা। কিন্তু অবিভক্ত বাঙলায় ব্রিটিশ-শাসকরা উর্দুকে মুসলিম ভাষায় রূপান্তরিত করার সর্ববিধ উদ্যোগই গ্রহণ করে। এই কাজে ব্রিটিশের সহায়তা করেন মুসলমান-এলিট সম্প্রদায়। শুরু হয় বিভ্রান্তি সৃষ্টির পালা।

মধ্যযুগের বাঙলায় ধর্মাশ্রয়ী সমাজে শাস্ত্রচর্চা বা বিদ্যাচর্চা ছিল ধর্মজ্ঞদের কুক্ষিগত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। কোনো কোনো নবাব-বাদশা বাঙলাভাষায় সাহিত্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সে যুগের সমাজে ভাষা নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল। 'রামচরিত' অথবা 'অষ্টাদশ পুরাণ' বাঙলাভাষায় অনুবাদ করলে 'রৌরব-নরক' বাস অনিবার্য, একথা প্রচার করতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা। কিন্তু পনেরো শতকের কবি কৃত্তিবাস অথবা মালাধর বসু[২]— শাস্ত্রজ্ঞদের এই অপপ্রচার গ্রাহ্য করেননি। অপরদিকে 'কিতাব'-এর কথা অনুবাদ করলে দোষী (গুনাহ্) হ'তে হবে একথা প্রচার করতেন 'ধর্মজ্ঞ' মোল্লা-মৌলবীরা। এই পটভূমিতে ষোলো শতকের কবি সৈয়দ সুলতান বলেন, "যারে যেই ভাষে প্রভু করিলো সৃজন/সেই ভাষে হয় তার অমূল্য রতন।" মাতৃভাষার অনুরাগী আবদুল হাকিম (সতেরো শতক) লেখেন, "যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সে সব কাহার জন্ম নির্ণয়ে না জানি/দেসি ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়াএ/নিজ দেশত্যাগী কেন বিদেস না জাএ॥"

সৈয়দ সুলতান মাতৃভাষাকে "অমূল্য রতন" বললেও ধর্মীয় কারণে উচ্চকোটির হিন্দু-বাঙালির শ্রদ্ধাভক্তি-অনুরাগ ছিল সংস্কৃতভাষার প্রতি; আর মুসলমানের শ্রদ্ধাভক্তি-অনুরাগ ছিল আরবী-ফারসী ভাষার প্রতি। সেইসময় সরকারি কাজকর্ম হোতো ফার্সীভাষায়; কিন্তু এ নিয়ে 'নিচুতলা'র মানুষ মাথা ঘামাতেন না। ভাষা নিয়ে রাজনীতি শুরু হয় আরও পরে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) সৃষ্টিকারী ওয়ারেন হেস্টিংস-এর 'রাজত্বকালেই' শুরু হয় 'হিন্দুকরণ' (Hinduisation) ও 'ইসলামীকরণ' (Islamaisation)-এর প্রক্রিয়া।

১৮২৯ সালে ফার্সীভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ও বাংলাভাষায় সরকারি কাজকর্ম নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই পদক্ষেপ ছিল উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানদের প্রতি এক আঘাত; কিন্তু এতে লাভবান হন হিন্দু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিতশ্রেণী। 'সমাচার দর্পণ' কোম্পানি-সরকারের এই সিদ্ধান্তে সোল্লাসে লেখে (নভেম্বর ১৮৩১)— "যবনদের ঔদ্ধত্য ধূলিসাৎ করিবার সুযোগ এইবার আসিয়াছে.... বাঙলাভাষার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরা লুপ্ত হইয়া যাইবে, কেননা তাহারা বাঙলা পড়িতে বা লিখিতে এখনো সক্ষম নয়, কোনোদিন হইবেও না।"[৩]

হিন্দু-ভদ্রবাবুদের এমত মনোভাবের বিপরীতে সম্ভ্রান্ত মুসলমানশ্রেণী উর্দুকরণ ও ইসলামীকরণ-এ তৎপর হয়ে ওঠেন। অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান আদিতে ছিলেন নিম্নবর্ণ হিন্দু।[৪] ইংরেজের কৌশলে ইসলামীকরণের জন্য আরবী ফার্সী ও উর্দুচর্চাকারী অভিজাত বাঙালি সম্প্রদায় সাধারণ দরিদ্র মুসলমানদের ওপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন। এঁরা সাধারণ

মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তাঁদের মাতৃভাষা হোলো উর্দু। ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হবার পর এর উচ্চবিত্ত বাঙালি সদস্যরা ইসলামীকরণে সচেষ্ট হন। এঁরা বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করতেন[৫] এবং উর্দু ও আরবী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। ১৮৮২ সালে শিক্ষা কমিশনের সামনে আবদুল লতিফ বলেন, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মাতৃভাষা হোলো বাংলা, আর উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা হোলো উর্দু। তাঁর মতে, নিম্নশ্রেণীর বাঙালি-মুসলমানের জন্য 'সংস্কৃতগন্ধী' বাঙলাভাষাকে বর্জন ক'রে আরবী-ফার্সীভাষার মিশ্রণে পরিশুদ্ধ ক'রে 'মুসলমানী ভাষা'র প্রচলন করতে হবে।[৬] সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ভাষা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "তাঁরা [অর্থাৎ আমীর আলী, আবদুল লতিফ প্রমুখ] বাঙলার মুসলমান ছিলেন; কিন্তু বাঙালি-মুসলমান ছিলেন ব'লে মনে হয় না.... অতীতের দিল্লি-লক্ষ্ণৌর মোগলাই ভাবটাই তাঁদের কাছে মনে হচ্ছিল মুসলমানী; মনে আসেনি যে সারা উত্তর ভারতের অই অঞ্চলে অই সংস্কৃতি [অর্থাৎ উর্দুভাষা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি] সম্পৃক্ত হিন্দু বা অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা কম ছিল না, বরং ছিল বেশি। সেখানকার উর্দুভাষাটাও তাঁদের কাছে মনে হচ্ছিল মুসলমানী ভাষা ব'লে। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ স্বীয় মাতৃভাষা উর্দুর উন্নতির জন্য যে প্রয়াস চালান, বাঙলার এই দুই নেতার কাছে আসলে সেটাই মনে হয় ভারতীয় মুসলমানদের ভাষা।"[৬]

উচ্চশ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের এমত প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাঙলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাঙলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাঙলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠাসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে নাকি! বাঙলা যদি বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা হয়, তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানীও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে।"

'ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা' পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তা'র মতো বর্বরতা আর হ'তে পারে না.... আজ পর্যন্ত নিজের দেশভাষাকে পীড়িত করবার উদ্যোগ কোনো সভ্য দেশে দেখা যায়নি.... বাঙলাদেশের মুসলমানকে যদি বাঙালি ব'লে গণ্য না করতুম তবে সাহিত্যিক এই কদাচার সম্বন্ধে তাঁদের কঠিন নিন্দা ক'রে সান্ত্বনা পেতে পারতুম। কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র বাঙলাদেশ-প্রসূত এই মূঢ়তার গ্লানি নিজে স্বীকার না ক'রে উপায় কী?"

বাঙলাভাষাকে মুসলমানী করার এই প্রচেষ্টা জোরদার হয় হিন্দুবাবু-প্রচারিত নবহিন্দুবাদ ও আর্যত্ববোধের প্রতিক্রিয়ায়। ১৮৯৫ সালে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খন্দকার ফাজলে রাব্বি ফার্সীভাষায় 'হকিকত-ই-মুসলমান-ই বাঙ্গালা' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। পরে তিনি এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করেন। তাঁর এই পুস্তকের নাম— 'The Origin of the Muhamadans of Bengal'। এই গ্রন্থে রাব্বি বলেন— অধিকাংশ বাঙালি-মুসলমানের পূর্বপুরুষ হলেন আরব, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশ থেকে

আগত [খাঁটি] মুসলমানেরা।[৭] তিনি আরও বলেন, হিন্দু ও মুসলমানের কথ্যবাঙলায়ও পার্থক্য আছে।

ব্রিটিশের অনুচরদের এবম্বিধ প্রচারের ফলেই উর্দু— "মুসলমানী ভাষায়" পরিণত হয়। উচ্চশ্রেণীর বাঙালি-মুসলমানও নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র ভাষা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং পশ্চিম এশিয়ার দুস্তর মরুভূমিতে পূর্বপুরুষ আবিষ্কার ক'রে পুলকিত হয়ে ওঠেন।

নবাব আবদুল লতিফের 'ঐতিহাসিক' ঘোষণার প্রায় দশ বছর আগে 'বঙ্গদর্শন'-এ জনৈক লেখক লেখেন (পৌষ, ১২৮০)— "যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের এমত গর্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙলা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙলা লিখিবেন না বা বাঙলা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে [হিন্দু-মুসলমানের] ঐক্য জন্মিবে না, কেননা, জাতীয় ঐক্যের মূল [হইলো]— ভাষাব একতা।" এই দূরদর্শীর সতর্কবাণীতে সেদিন হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গ সচেতন হননি। সচেতন হ'লে, বোধ হয়, বাঙালির এই মহা সর্বনাশ হোতো না।

পরবর্তীকালে বাঙালি-মুসলমানের উর্দু-প্রীতি বৃদ্ধি পায়। সমাজ ও রাজনীতি— সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠার ফলে আরবী-ফার্সী-উর্দুভাষার প্রতি অনুরাগ এবং 'প্যান-ইসলামবাদ'-এ দৃঢ় বিশ্বাস মুসলমানত্বের পবিচয় হয়ে ওঠে। এক উর্দুপ্রেমী বাঙালি-মুসলমান ১৯১৭ সালে লেখেন, "আরবী এবং উর্দুকে বাদ দিয়া বাঙলায় বাঙালি-মুসলমানেব জাতীয়জীবনেব প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যাইবে না। মুসলমানের মনে 'নেশন' শব্দ জাগিয়া উঠিলে, সে কখনো আপনাকে বাঙলার অধিবাসী বলিয়া মনে করিতে পারে না, এমন-কি মাত্র ভারতের অধিবাসী বলিয়াও মনে করিতে পারে না, সমগ্র বিশ্বের সহিত তাহার যোগ সাধিত হইয়া যায়.... বাঙলা.... কখনো [মুসলমানের] জাতীয় ভাষা হইতে পারে না....।"

একশ্রেণীর বাঙালি-মুসলমানের উর্দু-প্রীতির আধিক্যে ও ইসলামীকরণের ফলে তাঁদের আত্মবিস্মৃতি ঘটে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় খিলাফৎ আন্দোলনের সময়। গান্ধীজী তখন সমগ্র ভারতীয় জাতির পথপ্রদর্শক; হিন্দুর দৃষ্টিতে অবতার, আর মুসলমানের ধর্মীয় আবেগে মুক্ত কচ্ছ প্রশ্রয়দাতা! হিন্দু-ধর্মান্ধতা আর মুসলমান-ধর্মান্ধতার বিচিত্র এক ঐক্য গ'ড়ে ওঠে; মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমানের অবিসংবাদী নেতা— ধর্মান্ধতার কেন্দ্রবিন্দু! ১৯২১ সালে আলী ভাইদের (মহম্মদ আলী, শৌকত আলী) গ্রেপ্তারের পর মহাত্মাজী মুসলমানদের প্রতি এক আবেদনে বলেন, "এই বীর ভ্রাতৃদ্বয় খাঁটি দেশপ্রেমিক, কিন্তু তাঁরা প্রথমে মুসলমান, পরে অন্যকিছু, এবং প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষের পক্ষে এমতই হওয়া উচিৎ।"[৮]

খিলাফৎ আন্দোলনের হুজুগে বাঙালি-মুসলমান প্রথমে 'মুসলমান' হয়ে ওঠেন, কারণ বাঙালি-হিন্দুরাও তখন প্রথমে 'হিন্দু'। এই সময় 'প্যান ইসলামী' দৃষ্টি ও মনোভঙ্গি অচিরেই 'আত্মবিস্মৃত বাঙালি-মুসলমানের চিত্ত উদ্বেলিত করে। প্রাণের আবেগে ভেসে গিয়ে 'বাঙালি কবি' গেয়ে ওঠেন, "তুর্কীর মাটি তুর্কীর জল / তুর্কীর বায়ু তুর্কীর ফল / পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে খোদাওয়ান্দ্.... তুর্কীর আশা তুর্কীর খেদ তুর্কী জাতির মহান জেদ / জয় হউক জয় হউক জয় হউক হে খোদাওয়ান্দ্।"

খিলাফৎ হুজুগ কেটে যাবার পর দুই ধর্মান্ধ সম্প্রদায়েব বিচিত্র ঐক্য ভেঙে পড়ে, সাবা

দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯২৭ সালে এক সুপরিচিত লেখক লেখেন, "উর্দুভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মুসলমানগণ জাতীয়তাবিহীন ও কীরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইতো, তাহা চিন্তার বিষয়। বাঙলাদেশের মুসলমানগণের মাতৃভাষা বাঙলা হওয়াতে, বঙ্গীয় মুসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এ কাবণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন নিস্তেজ, দুর্বল, ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।"

১৯৩৬ সালে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' বা 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' অর্থাৎ পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পর বাঙালি-উর্দুপ্রেমীদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পায়, এঁদের এই অপচেষ্টার সমালোচনা ক'রে শরৎচন্দ্র লেখেন, "বাংলাসাহিত্যকে বিকৃত করবার একটা হীন প্রচেষ্টা চলেছে। কেউ বলছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি `আরবী' কথা ব্যবহার করো; কেউ বলছেন, এতগুলি 'পারসী' কথা ব্যবহার করো; আবার কেউ-বা বলছেন, এতগুলি 'উর্‌দু' কথা ব্যবহার করো। এটা একেবারে অকারণ, যেমন ছোটোছেলে হাতে ছুরি পেলে বাড়ির সমস্ত জিনিষ কেটে বেড়ায়, এ-ও সেইরূপ।"

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' শীর্ষক আলোচনায় শরৎচন্দ্র লেখেন, "ওয়াজেদ আলী সাহেব একটি চমৎকার ভরসার কথা বলেছেন— সেটি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মনে রাখা উচিৎ। বলেছেন, 'মুসলিম সাহিত্য-সেবক আরবী-ফারসী শব্দ বাঙলাভাষার অঙ্গে জুড়তে চাইছেন, এতে আপত্তি অনাপত্তি অতি তুচ্ছ কথা, কেননা শুধু কলম চালিয়ে ওটি হ'তে পারে না; তার জন্য চাই প্রচুর সাহিত্যিক-শক্তি, চাই সৃষ্টিশীল প্রতিভা। ও দু'টি যেখানে নেই, ভাষা সেখানে ভূষণ পরতে গিয়ে অতি সহজেই সং সাজতে পারে।'..."

বাঙলাদেশে উর্দুকরণ-এর এই ব্যাপক আয়োজনের পাশাপাশি এক সুস্থ ধারাও বর্তমান ছিল। ১৯২৮ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য উর্দুকে বাধ্যতামূলক করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়, কিন্তু প্রতিবাদের ফলে সে চেষ্টা সফল হয়নি। বাঙলাদেশে উর্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে আলোড়ন-আলোচনা-প্রতিবাদ শুরু হয় বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। সচেতন মাতৃভাষা-অনুরাগী বাঙালি-মুসলমান উর্দুপ্রেমের বিরুদ্ধে জনমত গ'ড়ে তুলতে সচেষ্ট হন শতাব্দীর গোড়া থেকে। ১৯০৩ সালে 'নবনুর' লেখে, "যাহারা জোর করিয়া উর্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।" উর্দুকরণেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় 'আল-এসলাম' পত্রিকায় ১৯১৬ সালে। লেখক লেখেন, "এমন অনেক 'রওশন খেলায়' মুসলমান আছেন, তাঁহারা বাঙলা তথা শ্রীহট্টের বাঁশবন ও আম্রকানন-মধ্যস্থিত পর্ণকুটিরে নিদ্রা যাইয়া এখনও বাগদাদ, বোখরা, কাবুল, কান্দাহার ও ইরান-তুরানের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন.... 'বাঙলাভাসা হিন্দুর ভাষা, সুতরাং অশ্রদ্ধেয় এই ভাষায় কোরাণ-হাদিছের ন্যায় পবিত্র গ্রন্থাদি অনুদিত হইতে পারে না। ধর্মকর্মাদি এই ভাষায় আলোচিত হইতে পারে না, উর্দুই মুসলমানের 'মাতৃভাষা'। উর্দুতেই পরস্পরকে কথাবার্তা বলিতে এমন-কি স্বপ্ন দেখিতে হইবে।' —এইরূপ 'ফতওয়া' চতুর্দিকে ঘোষিত হইয়াছিল.... তাহারই ফলে বাঙলার মৃত্তিকায় উর্দুবীজ বপন করিবার অস্বাভাবিক ও অলৌকিক খেয়াল অনেকেই আঁটিয়া থাকেন।" আর ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে মোজফ্‌ফর আহ্‌মদ ১৯১৭ সালে লেখেন, "....উর্দুভাষীরা যে বাঙলাদেশের মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙলার পরিবর্তে উর্দুভাষা চালাইবার চেষ্টা করেন এটাই তাঁহাদেব বড় অন্যায়.... তাঁহাদের সঙ্গে আবার একদল

'ফেউ' আছেন। এই 'ফেউ'রা প্রায়ই খাঁটি বাঙালি। ইহারা কলিকাতায় পশ্চিমা নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্ত্রীর খাতিরে মাকে ছাড়িয়া শাশুড়িকে মা বলিয়া ডাকেন। আর একদল আছেন যাঁহারা বক্রাক্ষর দেখিলেই আত্মহারা হইয়া যান.... যাঁহারা.... উর্দুভাষী.... কলিকাতার খিচুড়ি মুসলমানগুলিকে দেখিয়াই মনে করেন যে, বাঙলাদেশের মুসলমানগণের মাতৃভাষার কোনো ঠিকানা নাই.... [ইত্যাদি] বাঙলাদেশে আমরা উর্দুকে কখনও প্রশ্রয় দিতে পারি না।"

উর্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাঙালি-মুসলমানের সমালোচনা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও উর্দুকরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। আরও পরবর্তীকালে বাঙালি-মুসলমানের স্বার্থ পাকিস্তানওয়ালাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বলি দেওয়া হয়। ইংরেজের কৌশলে সমগ্র বাঙালিজাতি বিভক্ত হয়ে যায়। দেশ ভাগ হয়!

বাঙলার মতো বহির্বঙ্গেও উর্দুভাষী মানুষের অঞ্চলে ব্রিটিশের ভেদনীতি সক্রিয় ছিল। উনিশ শতকের প্রথমভাগে সমগ্র উত্তর ভারতে উর্দু ছিল সাধারণের ভাষা এবং এ কারণে আদালতের ভাষা। এই ভাষার ওপর তখনও কোনো সাম্প্রদায়িক অভিধা যুক্ত করা হয়নি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উর্দুভাষায় কথা বলতেন, ভাবতেন, সাহিত্য সৃষ্টি ও সংস্কৃতি চর্চা করতেন।[৯] সমৃদ্ধ উর্দুসাহিত্য ছিল উভয় সম্প্রদায়ের সম্পদ।

হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি, পারস্পরিক আদানপ্রদান, ও বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ-স্বার্থের পরিপন্থী। এ কারণে দু'টি সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য বিনষ্ট করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ তার দেশীয় অনুচরদের নিয়োগ করে। ১৮৭০ সালে একদল হিন্দু— অফিসকাছারি ও আদালত থেকে উর্দুভাষার অপসারণ ও হিন্দির প্রচলন দাবি করে। সূত্রপাত হয় ভাষা নিয়ে রাজনীতির। এই প্রশ্নে কিছু বাগবিতণ্ডার পর ১৯০০ সালে উত্তর প্রদেশের 'ছোটলাট' অ্যান্টনী ম্যাকডোনাল্ড 'মুসলমানী ভাষা উর্দু'র প্রতিপক্ষে— 'হিন্দুভাষা হিন্দি'র প্রচলনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্যোগে হিন্দিকে— আদালত ও অফিসকাছারিতে উর্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চালু করা হয়। বাঙলার মতো উত্তরপ্রদেশেও ভাষার প্রশ্নে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানকে বিভক্ত করা হয়। বিশ শতকে ভাষা নিয়ে রাজনীতি জোরদার হয়ে ওঠে 'হিন্দু মহাসভা' ও 'মুসলীম লীগ'-এর সাম্প্রদায়িক-রাজনীতি ও কংগ্রেসের দুর্বলতার জন্য। বিশ শতকের তিন ও চারের দশকে হিন্দি ও উর্দুর বিবাদ কুশ্রী রূপ ধারণ করে। ভবিষ্যতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতের জাতীয় ভাষা কী হবে, এই প্রশ্নে হিন্দি-উর্দুর দ্বন্দ্বের বিষবৃক্ষটি নধরকান্তি হয়ে ওঠে।

১৯৩৭ সালে সীমিত ক্ষমতা লাভ করার পর কংগ্রেসদল ভাষার প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। গান্ধীজীর পক্ষপাতিত্ব ছিল হিন্দিভাষার প্রতি। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দিভাষার চর্চা করবেন। গান্ধীজী ল্যাটিন হরফে 'বিতর্কিত ভাষা' চর্চারও বিরোধিতা করেন। পরে অবশ্য এ সম্পর্কে তাঁর মতামতের পরিবর্তন হয়— কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব ঘ'টে গেছে।

পরবর্তীকালে উর্দুকে 'মুসলমান'-এর ভাষা বানানো হয়। কংগ্রেস, লীগ, আর হিন্দু মহাসভার রাজনীতিকরাই ছিলেন এর জন্য দায়ী। জিন্না তাঁর সাধের 'মুসলমানী ভাষা'য় তাঁর নিজের নামও লিখতে পারতেন না অথচ তিনি মুসলমানের পৃথক জাতীয়তার 'স্বত্বা' ঘোষণা করার জন্য উর্দুকে তাঁর 'চোদ্দ দফা' দাবির (যা পরবর্তীকালে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে খ্যাত হয়)

অন্তর্ভুক্ত করেন। জিন্নার অভিমত ছিল— ভারতীয় উপমহাদেশের 'মুসলমান জাতি'র ভাষা হোলো উর্দুভাষা। দেশবিভাগের সমকালে অনেক বাঙালিও উর্দুর আহ্বানে প্রভাবিত হন। 'স্বপ্নরাজ্য' পাকিস্তানের চিন্তায় মুসলমানের হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

ক্ষমতা ভোগের জন্য লোলুপ নেহেরু-প্যাটেল-রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং অন্যদিকে জিন্না এবং এঁদের ভাগ্যবিধাতা বিদায়ী ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে তিন টুকরো করার পর জিন্নাসাহেব পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু চাপিয়ে দেন আর খণ্ডিত ভারতে বহুভাষাভাষী মানুষ থাকা সত্ত্বেও দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা রূপে বরণ করা হয়। কিন্তু বহু বৎসরের ভাষাকেন্দ্রিক রাজনীতির ফলে গণতান্ত্রিক ভারতে ভোটপ্রার্থী রাজনীতিকরা ও বহু সাধারণ মানুষ মনে করেন উর্দু হচ্ছে মুসলমানের ভাষা। জিন্নাসাহেবের অনুসরণে আজকের কংগ্রেসদল ও মার্ক্সবাদীরা তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমালায় উর্দুর উন্নতির সাধুসঙ্কল্প প্রচার ক'রে থাকেন।

অদূর অতীতের উত্তরপ্রদেশে এক হিসেবে দেখা গেছে সমগ্র জনসংখ্যার চোদ্দ শতাংশ মানুষ উর্দু বলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ হলেন হিন্দু।

উর্দুভাষা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে এ ভাষার প্রতি মুসলমান-সম্প্রদায়ের দুর্বলতা আছে। এ কারণে রাজনৈতিক দলগুলি 'মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক'-এর 'সম্পদ' লাভ করার জন্য 'উর্দু ভাবাবেগ' বজায় রাখে, তাকে লালিত করে। এম.আর.বেগ. সাহেব বলেছেন, যাঁরা মুসলিম ভোট পাবার আশায় 'মুসলিম ভাষা' উর্দুর পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাঁরা মুসলমানের কোনো উপকারই করেন না। মুসলমানরা কেবলমাত্র ভোটারই নন, [তাঁরাও এ দেশের মানুষ।]।[১০] এক বিদেশী লেখকের মতে, উর্দু বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্ররা শুধুমাত্র স্বধর্মী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেই মেলামেশার সুযোগ পায়, বৃহত্তর জগতে মেশার সুযোগ পায় না। ফলে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকে— বৃদ্ধি পায়। আমরা বলতে পারি, মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের সামাজিক দূরত্বের সুযোগ নিয়ে রাজনীতিকরা নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেন। দেশে 'মালটি রিলিজিয়াস কালচারাল পলিসি' প্রচারিত হবার জন্য ভাষা নিয়ে রাজনীতি অব্যাহত রয়েছে।

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সমাজ ও রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক করার (communalise) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেন। ইংরেজ যার সূচনা ঘটায়— দেশভাগের পরেও নীতিহীন স্বার্থসর্বস্ব-রাজনীতিকরা তা দূরীভূত না ক'রে তাকে প্রশ্রয় দেন, ব্যবহার করেন। বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের একচ্ছত্র নেত্রী যে অসাধু প্রক্রিয়া জোরদার করেন, সেই সাম্প্রদায়িকতার প্রেতনৃত্য আজ বীভৎস রূপ ধারণ করেছে; কোনো সভ্য দেশে, কোনো গণতন্ত্রে যা ঘটে না।

দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে বাঙালি-মুসলমানের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন শুরু হয় ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিরা গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেন উর্দুর আধিপত্যবাদ। পূর্ব পাকিস্তানের 'মুসলমান' ধীরে ধীরে বাঙালি হয়ে ওঠেন; আর খণ্ডিত বাঙলায় ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িকতার সরকারি নীতি মুসলমান-বাঙালিকে আরও অধিক মাত্রায় 'মুসলমান' ক'রে

তোলে (একথার অর্থ এমন নয় যে বাঙালি-হিন্দুরা সেকুলার বা ধর্মহীন)। ওপার বাঙলায় ধর্মান্ধতার বিকট উল্লাসে ব্যথিত বাঙালির কবি লেখেন, "উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।" আর এপার বাঙলায় হিন্দুত্বের অট্টহাসে শঙ্কিত বাঙালি-সাহিত্যসেবী লেখেন, 'কাবার পথে!' এ যেন 'মহাপ্রস্থানের পথে'র 'মুসলমানী' প্রতিরূপ। এঁরা ভুলে যান— দুঃখী মানুষ ও প্রতিবাদী মানুষের কান্না-ঘাম-রক্তে ভেজা স্বদেশের মাটি যে সবচেয়ে পবিত্র তীর্থ। একথা ভুলবেন কেন অমল স্রষ্টা, তাঁর দায়িত্ব যে অসীম!

টীকা ও তথ্যসূত্র

১। A Abul Hassan Ali Nadwai, Muslim in India (Translated from Urdu by Mohammad Asif Kidwai). Lucknow 1980. p 131

২। শোনা যায়— রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ্ ভাগবত রচনা করার জন্য মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। চট্টগ্রামের শাসক পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ সভাকবিদের দিয়ে 'মহাভারত' 'রচনা' করিয়েছিলেন। এই 'মহাভারত' 'পরাগলী মহাভারত' নামে খ্যাত।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাঙলাসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কোলকাতা ১৩৭৮; পৃ. ৫০-৫১

৩। উদ্ধৃতি, তাজুল ইসলাম হাশমী, ইতিহাসের আলোকে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি; ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ; সুকান্ত একাডেমি (সম্পাদিত); ইতিহাসের আলোকে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি; ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৬৬

৪। এ প্রসঙ্গে আহ্মদ শরীফ বলেছেন, "হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর-বাগদিরাই আমাদের স্বগোত্র, স্বজাতি, আমাদের ভাই.... আমাদের দেহে শেখ-সৈয়দ-কোরেশীর রক্ত নেই, তুর্কী-মোগল-পাঠানের রক্তও নেই, আর্য রক্তও নেই— আমরা এই দেশের এই মাটিরই সন্তান....।" উপরোক্ত, পৃ. ৪২

৫। মীর মোশাররফ হোসেনের পিতা, গ্রাম্যশিক্ষক মুনশীসাহেব বাঙলাভাষাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন; এ প্রসঙ্গে মোশাররফ সাহেব বলেন, "মুন্সীসাহেব বাঙলায় অক্ষর লিখিতে জানিতেন না.... বাঙলাবিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখিতেন।" অনেক ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু-বাঙালিও বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করতেন। বঙ্গজননীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন মধু কবি বাঙলাভাষা সম্পর্কে বলেন, "It is the language of fishermen, unless you import largely from Sanskrit " পরে তিনিই লেখেন, "মাতৃভাষা রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে!"

৬। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম; ইতিহাস সন্ধান ঢাকা, ১৯৮৮; পৃ. ১৩৬-১৩৭

৭। ফাজলে বাব্বির এই অভিমত নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিচারে সত্য নয়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।"

৮। Quoted in R C Majumder History of Freedom Movement in India Calcutta 1977 Vol III. p 684
রমেশচন্দ্র মজুমদার এই উদ্ধৃত অংশের পর মন্তব্য করেছেন, "আজকের গান্ধীর অনুগামীরা

যাঁরা জাতীয় সংহতির [বাণী প্রচারে] অতিশয় ব্যগ্র, তাঁরা কি [এক্ষেত্রে] গান্ধীর সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারবেন?"

ধর্মান্ধতার রাজনৈতিক ব্যবহারের নিয়তি এমনই করুণ হয়, আজও যা ভারতীয় জাতিকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

৯। Donald Eugene Smith. India as a Secular State. Princeton 1963. p. 398. অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলি কোলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকায় তাঁর নির্বাসিত জীবন কাটান। তিনি 'রাধাকৃষ্ণ কা কিস্সা' নামে এক গীতিনাট্য লিখে স্বয়ং কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কোলকাতার বোদ্ধা মানুষের নিমন্ত্রণ থাকতো তাঁর গানের আসরে। বলা বাহুল্য, 'ওয়াজেদ আলির কৃষ্ণ' উর্দুভাষাতেই রাধাকে প্রেম নিবেদন করতেন। আবদুর রউফ, স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে পশ্চিমবাঙলার মুসলমান; কোলকাতা ১৯৯২; পৃ. ৮৩-৮৪

উর্দুসাহিত্যে একটি উজ্জ্বল নাম— কৃষণ চন্দর। উর্দু কি কেবল মুসলমানের ভাষা?

১০। M.R.A. Baig. The Muslim Dilemma in India. Delhi, 1974, p. 111.

[অনীক, জুলাই, ১৯৯৫

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি

১৯৪৭ সাল, ১৫ই আগস্ট। দিল্লির রাজপথে যখন আনন্দে উদ্বেল মিছিলে ধ্বনি উঠছে 'মাউন্টব্যাটেন কি জয়!' অথবা 'নেহরু মাউন্টব্যাটেন এক হো!'— তখন সদ্য-বিভাজিত ভারতীয় উপমহাদেশের শহরে-গ্রামে ঘ'টে চলেছে আধুনিক এশিয়ার বৃহত্তম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যখন হিন্দু-শ্রমিক, মুসলমান-কৃষক, অথবা শিখ-শিশুর রক্ত একাকার হয়ে যাচ্ছে, অহিংসার উদগাতারা তখন ইংরেজের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে নবলব্ধ সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার আনন্দে দিশেহারা। ভারত স্বাধীন হোলো, অর্থাৎ দেশ ভাগ হোলো। জাতির পিতা, যিনি এর কিছুদিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি জীবিত থাকতে দেশভাগের প্রস্তাবে রাজি হবেন না, তিনিই স্বাধীনতার পূর্বাহ্নে জাতির কাছে প্রশ্ন রাখলেন "ইস্‌সে ডর গয়ী? কিতনে লোক মর গ্যায়ে হ্যাঁয়, এক লাখ, দো লাখ? হিন্দুস্তান-কি আজাদী-কে লিয়ে দো, চার, দশ লাখ নহী মরেঙ্গে আউর আজাদী আ যায়েগী?"

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের এই পরিণতির জন্য প্রধানত তিনটি কারণ দায়ী— ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' বা 'ভাগ করো শাসন করো নীতি'; হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা; মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা। ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনায় জিন্না তথা মুসলিম লীগ নিন্দিত, ধিকৃত; কখনো কখনো দয়ানন্দ, তিলক, মদনমোহন মালব্য, হিন্দু মহাসভা তথা সাভারকার সমালোচিত হন— কিন্তু কংগ্রেস বা গান্ধী অধিকাংশক্ষেত্রেই সমালোচনার উর্দ্ধে থেকে যান। গান্ধী পূজিত হন হিন্দু-মুসলমান মিলনাকাঙ্খার প্রতীক রূপে। কিন্তু রাজনৈতিক-সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেস-রাজনীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে— প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার না করলেও ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলটি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, যার চরম প্রকাশ ঘটে গান্ধী-নেতৃত্বের আমলে।

ভারতে এলিট সমাজ পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়— ১৮৭০-১৮৯০ 'মডারেট' বা 'নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির কাল; ১৮৯০-১৯১৪ 'নরমপন্থী' বনাম জাতীয়তাবাদীদের[ক] দ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদীদের প্রাধান্যের কাল; এবং ১৯১৪-১৯৪৭ গণআন্দোলন (সীমিত অর্থে হ'লেও) ও গান্ধী নেতৃত্বের কাল। এলিট সমাজ পরিচালিত আন্দোলনের এই তিনটি স্তরে প্রথম পর্যায়ের রাজনীতির উৎস রামমোহনের চিন্তাভাবনা। রামমোহনের মতোই কংগ্রেসের প্রথম আমলের নেতারা ব্রিটিশের মহত্ব, দয়া, আর করুণার ওপর আস্থাশীল ছিলেন। 'ভারতপথিক'-এর মতো এঁরাও 'প্রেয়ার' আর 'পিটিশন'-এর রাজনীতিই করেছিলেন। পরবর্তীকালের কংগ্রেসী কর্মীরাই এঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— "বিটিশ-রাজমুকুটের প্রতি অটল আনুগত্যই ছিল [তৎকালীন] কংগ্রেসের পবিত্র মন্ত্র!" 'মডারেট' কংগ্রেসীদের রাজানুগত্য এত প্রবল ছিল যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

শাসনকালের শেষদিকে তিনি ইংল্যাণ্ডের থেকে ভারতেই বেশি শ্রদ্ধা পেতেন। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতি 'পিটিশনওয়ালা' রাজনীতিকদের এই গভীর ইংরেজ-মুগ্ধতাব ফলে এঁরা ব্রিটিশের ভেদনীতি সম্পর্কেও নীরব ছিলেন যদিও এঁদের আমলে রাজনীতি আর ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায়নি, যা ঘটেছিল জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে।

ব্রিটিশ-সাম্প্রাজ্যবাদের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতি এবং 'হিন্দু জাতীয়তা' আর 'মুসলিম জাতীয়তা'র উন্মেষ ও বিকাশ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। তাই বর্তমান ক্ষেত্রে এই আলোচনার পুনরুক্তি না ঘটিয়ে একথা বলা যায় যে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় দু'দশক আগে থেকেই ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান-এলিট-সমাজে 'হিন্দু আইডেনটিটি' আর 'মুসলিম আইডেনটিটি' বোধ তথা পৃথক জাতীয় চেতনা সংহত হ'তে শুরু করে। জমিদারী, ব্যবসাবাণিজ্য, ইংরেজি-শিক্ষা তথা সরকাবি উচ্চপদে চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দু-এলিট-সমাজ-— মুসলমান-এলিট-সমাজের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। মুসলমান-এলিট-সমাজের ছিল হীনমন্যতা আর ক্ষোভ। পণ্ডিত নেহরুর মতে-— "ঐতিহাসিক অথবা মতাদর্শগতভাবে মুসলমানরা বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী-আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না কারণ তাঁদের মধ্যে কোনো বুর্জোয়াশ্রেণীই তৈরি হয়নি যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল।" কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পব এর পৃষ্ঠপোষক হন টাটার মতো মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা; অথবা দ্বারভাঙা, বরোদা, বা কোলাপুরেব রাজাদের মতো সামন্ত প্রভুরা তাই স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস দল গ'ড়ে উঠেছিল হিন্দু এলিট সমাজের নেতৃত্বে।

অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষিত রাজানুগত মুসলমান-এলিট-সমাজের প্রতিনিধি সৈয়দ আহ্মদ খান-এব রাজনীতির প্রভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার সমসাময়িককাল থেকেই মুসলমান-এলিট-সমাজের অনেকে কংগ্রেসকে 'হিন্দু কংগ্রেস' নামে অভিহিত করেন। কোনো কোনো মুসলমান ভদ্রলোক অবশ্য এই অভিধার সমালোচনাও করেছিলেন। কংগ্রেসের হিন্দুনেতাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান এলিট সমাজের সাম্প্রদায়িক-স্বাতন্ত্র্য পুরোমাত্রায় বজার রেখে শুধুমাত্র তোষামোদ ক'রে তাঁদেব কংগ্রেস আন্দোলনে যুক্ত করা। কিন্তু এই তোষামোদেও বিশেষ কোনো ফল হয়নি। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের রিপোর্টে ঘোষণা করা হয়— দেশের হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান, এবং পার্শী সম্প্রদায়ের স্বার্থ অভিন্ন— সুতরাং জনগণের 'সেকুলার' ব্যাপারে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষই অংশ নিতে পারেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন কংগ্রেস অনুমোদন করে না। কিন্তু এ ঘোষণা সত্ত্বেও কংগ্রেস আন্দোলনে খুব স্বল্পসংখ্যক মুসলমানই অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে প্রথম অধিবেশনে ৭২ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন মুসলমান; ১৮৮৬-র দ্বিতীয় অধিবেশনে ৪৩১ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩৩ জন মুসলমান ছিলেন; ১৮৮৯ সালের অধিবেশনে ১৮৮৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২৫৮ জন ছিলেন মুসলমান। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস-অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ ছিলেন মুসলমান। ১৮৮৭ সালের অধিবেশনে বদরুদ্দীন তৈয়বজীকে কংগ্রেসের সভাপতির পদে নির্বাচিত করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস দলকে 'সেকুলার' সংগঠন হিসেবে প্রচার করা, এবং মুসলমানদের কংগ্রেস-আন্দোলনে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা। কিন্তু সৈয়দ আহ্মদ হিন্দু

ও মুসলমান পৃথক জাতীয়তার দোহাই দিয়ে তৈয়বজীকে সমালোচনা করেন। তৈয়বজী এই সমালোচনায় প্রভাবিত হন এবং ১৮৮৮ সালে তিনি হিউম সাহেবের কাছে প্রস্তাব দেন যে, কংগ্রেস-আন্দোলনকে পাঁচ বছরের জন্য স্থগিত রাখা দরকার এবং যদি মুসলমান সম্প্রদায় এই আন্দোলনকে সমর্থন না করেন তাহলে কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করা উচিৎ।

বাঙলাদেশেও বিপুল সংখ্যক মুসলমান কংগ্রেস-আন্দোলন বা এর পূর্ববর্তী ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান-এর বাইরে ছিলেন। ১৮৮৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকার এক জনসভায় দাবি করেন যে, কংগ্রেস-আন্দোলন হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা এ কথাতেও আকৃষ্ট হ'তে পারেননি। অন্যদিকে এলিট সমাজের এই রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান কৃষক বা শ্রমজীবী মানুষের কোনো আগ্রহই ছিল না। 'বাবু সম্প্রদায়ের রাজনীতি' নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতেন না। অন্তত বাঙলাদেশে শ্রমজীবী মানুষ শ্রেণীস্বার্থের জন্যই সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

আমরা আগেই ব্রিটিশের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতির কথা উল্লেখ করেছি।[খ] 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতির পোষাকী রূপটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা বা 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি'। এই ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতায় ইন্ধন জোগানো। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়— গভর্নর জেনারেল ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-১৮৯৪) জনসাধারণের ধর্মাচারণের অবাধ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন। তিনি মুসলমানদের যথেষ্ট সাবধানতাপূর্বক গো-হত্যা করতে নির্দেশ দেন এবং হিন্দুদের পরামর্শ দেন গো-রক্ষা আন্দোলন চালিয়ে যেতে।[গ]

যে বলিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় পার্থক্যকে মুছে দিতে পারে, কংগ্রেস-আন্দোলনে তার অভাব ছিল। অধ্যাপক এ. আর. দেশাই নগরকেন্দ্রিক এলিট সমাজের সংস্কৃতিকে বলেছেন 'হাইব্রিড কালচার' বা 'সঙ্কর সংস্কৃতি'। বর্তমান এই এলিট সমাজের পূর্বপুরুষ মেকলের স্বপ্নসন্তান কোলকাতা-বোম্বাইয়ের তৎকালীন এলিট সমাজের সংস্কৃতিও অবশ্যই ছিল 'হাইব্রিড', মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া টাটা অথবা বরোদার মহারাজার প্রতিনিধি ডব্লিউ. সি বোনার্জীর দল সামন্ততন্ত্রের সাংস্কৃতিক 'উপরিকাঠামো' অর্থাৎ ধর্ম বা ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে পারেননি। ভারতের পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্র আর এর সমর্থনকারী আধ্যাত্মিক শক্তি সামন্তধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-মারফৎ গ'ড়ে ওঠেনি। 'ভারতের পুঁজিবাদ' ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক পুঁজিবাদের 'বাইপ্রোডাক্ট'।[১] সুতরাং তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য ভারতের পুঁজিবাদ— প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শ অপসারণের জন্য প্রচেষ্টা নেয়নি। বিকৃত উৎপত্তি, ঐতিহাসিক কারণে দুর্বল অবস্থান, এবং বিলম্বে বিকাশের জন্য ভারতের পুঁজিবাদ কখনোই 'সেকুলার' যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের প্রচার করেনি, ব্রিটিশ যুগেও না, স্বাধীনতার পরেও না।[২খ] ব্রিটিশ-সাম্রাজিক-পুঁজিবাদের 'বাইপ্রোডাক্ট' ভারতের পুঁজিবাদ ও সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি নবজাত কংগ্রেস 'সেকুলার' মতাদর্শ প্রচারে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসনেতারা প্রায় প্রত্যেকেই পুরোদস্তুর সাহেব ছিলেন। এঁদের কথাবার্তা, আবেদন-নিবেদন ইত্যাদি সবই ছিল ইংরেজি ভাষায়। এঁরা বিশ্বাস করতেন কংগ্রেস— ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সৌধের আর একটি ভিত্তিপ্রস্তর। সুতবাং সাম্রাজ্যবাদের

'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি' অর্থাৎ ভেদনীতির বিরুদ্ধে এঁরা কোনো কথা বলেননি। কংগ্রেসনেতারা দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'আর্য সমাজ' (১৮৭৫), বোম্বাইয়ের 'হিন্দুধর্ম ব্যবস্থাপক মণ্ডলী' (১৮৬০), বা মাদ্রাজের 'থিয়সফিকাল সোসাইটি' (১৮৭৯)-এর বিরুদ্ধেও কোনো উল্লেখযোগ্য প্রচার রাখেননি। অন্যদিকে আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত 'মহামেডান লিটেরারি এ্যাণ্ড সাইন্টিফিক সোসাইটি' (১৮৬৩) অথবা আমীর আলি প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৭)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কেও কংগ্রেস নীরব ছিল।[ঙ] হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের অগ্রণী ব্যক্তি বা সংগঠন হিন্দু-মুসলমানের পৃথক জাতীয়তা বা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক স্বার্থে বিশ্বাসী ছিলেন। তৎকালীন ভারতে প্রয়োজন ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যযুগীয় ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী 'সেকুলার ইডিয়োলজি' গ'ড়ে তোলা— এক 'সেকুলার' জাতীয়তাবাদের প্রচার। কিন্তু শ্রেণীভিত্তির জন্যই কংগ্রেস দল এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। দলের উচ্চপদে দু'চার জন এলিট মুসলমানকে নিয়োগ করাকেই এঁরা 'সেকুলারিজম-এর পরাকাষ্ঠা' ব'লে মনে করেছিলেন। অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিলেন, বাঙালি রমণী সরলা রায়ের গঞ্জনাতে গোখেল উপবীত ছিঁড়ে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, গোখেল বর্ণভেদে বিশ্বাস করেন না প্রমাণ করার জন্য।— আনন্দবাজার পত্রিকা (২৯.৮.১৯৯০)।

ব্রিটিশ-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হোলো জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতীয়তাবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের অনুপ্রবেশ। এই যুগকে আমরা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া— সামন্ত জোটের সঙ্গে উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়া— আর মধ্যশ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাতের কাল হিসেবে বর্ণনা করতে পারি। স্তালিন দেখিয়েছেন, নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়াশ্রেণী চারদিক থেকে উৎপীড়িত হয়ে আন্দোলনে চঞ্চল হয়ে ওঠে। "তারা তাদের 'স্বদেশী ভাইদের' ডাক দেয়, 'মাতৃভূমি' ব'লে সোরগোল তোলে.... তারা 'স্বদেশবাসীদের' ভিতর থেকে এক বাহিনী সংগ্রহ ক'রে নিজেদের পিছনে দাঁড় করায়.... 'মাতৃভূমি'র খাতিরে 'দেশবাসীরাও' যে সবসময় তাদের ডাক শুনে চুপ ক'রে থাকে তা নয়— বুর্জোয়াশ্রেণীর পতাকার নিচে তারা একত্রিত হয়।" জাতীয়তার বিকাশের ক্ষেত্রে 'সাইকোলজিকাল মেক আপ' বা 'মানসিক গড়ন' এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তৎকালীন ভারতের মতো বহু-ভাষাভাষী ও প্রাদেশিক সংস্কৃতির দেশে বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণকে রাজনৈতিক আন্দোলনে টেনে আনার জন্য এক 'সাইকোলজিকাল মেক আপ' গ'ড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল এক সাংস্কৃতিক ঐক্য গ'ড়ে তোলা। এই প্রয়োজন সাধিত করার জন্যই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরা নবউত্থিত হিন্দুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এটাই ভারতবর্ষের ট্র্যাজেডি।

ভারতের উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এমন শক্তিধর এবং সংহত ছিল না— যার ফলে তারা সারা দেশ ব্যাপী এক সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রাম গ'ড়ে তুলতে পারতো। পাশ্চাত্য জগতের বুর্জোয়াশ্রেণীর মতো সামন্তবাদ ও সামন্তবাদের সমর্থনকারী আধ্যাত্মিক শক্তিকে ধ্বংস ক'রে বা খর্ব ক'রে ব্যাপক জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে শামিল করতে পারতো। তাহলে ভারতের ইতিহাস অন্যরকমভাবে রচিত হোতো। কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণ সঞ্জাত দুর্বলতার জন্য ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী তার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক

দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়নি। তাই বিপিন পাল প্রমুখ নেতারা প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িককালে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রত্যাহার ক'রে নেন এবং তিলক স্বয়ং এ্যানি বেসান্তের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে প্রভাবিত হন। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে, 'মডারেটবা' রাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও রক্ষণশীল ছিলেন কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়ে তুলনামূলক বিচারে জাতীয়তাবাদীদের থেকে এগিয়ে ছিলেন। অথচ জাতীয়তাবাদীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে।

কংগ্রেস আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হোলো আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির পরিবর্তে এক সুগভীর জাতীয় চেতনায় উত্তরণের কাল, স্বরাজ, বিদেশী পণ্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট, আর— অন্তত কথায় হ'লেও— কালা সাহেবদের 'কাঁদুনির'[৮] পরিবর্তে জনসাধারণের দাবির উত্থান হোলো এই পর্যায়ের আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক। কিন্তু আমরা আগে যেমন বলেছি, ঐতিহাসিক কারণেই এই জাতীয়চেতনা হিন্দুত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ে, এক হিন্দুধর্মাশ্রয়ী ভারতবোধ গ'ড়ে ওঠে। এই ভ্রান্ত ইতিহাস-বোধের ফলে নবউত্থিত জাতীয়চেতনা বা ভারতবোধ হিন্দুত্ব অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে ওঠে। দ্বি-জাতি তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটে এই ভ্রান্ত ইতিহাস-চেতনার ফলশ্রুতি রূপে। জাতীয়তাবোধের প্রবক্তারা তাই অনিবার্যভাবেই প্রাক্-মধ্যযুগের 'গৌববময়' ভারত, 'প্রাচীন' ভারত, 'মিথিক্যাল' ভারতেব দিকে দৃষ্টি ফেরান। অতীতেব 'গৌরব গাথা' দেশপ্রেমের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

নবজাত হিন্দুত্বের অন্যতম বলিষ্ঠ প্রবক্তা নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম 'অ-ভদ্রলোক' বা জনসাধারণের শক্তির কথা অনুধাবন করেন। বাজনীতিতে নিচুতলার মানুষদের টেনে আনার কথাও তিনিই সর্বপ্রথম বলেন। সম্ভবত বিবেকানন্দের প্রভাবেই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 'প্রোলেটারিয়েট' কথাটি সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয় অরবিন্দের কণ্ঠে, যদিও এই কথাটির প্রকৃত অর্থ বোধহয় তাঁর অজ্ঞাত ছিল। বিপিন পাল ও পরবর্তী কংগ্রেস কর্মীরা যে 'মাস' বা জনসাধারণের কথা উল্লেখ কবেন তাও সম্ভবত বিবেকানন্দের প্রভাবে।

জাতীয়তাবাদীদের এই প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তা ধর্মাশ্রয়ী হয়ে পড়ার জন্য জাতীয় আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হয়। তাঁরা জনসাধারণকে আন্দোলনে টেনে আনার জন্য ধর্মের 'ইন্টিগ্রেটিভ ফাংশন'-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। মহারাষ্ট্র, বাঙলা, বা পাঞ্জাবের আন্দোলনকে একই সূত্রে গ্রথিত কবার জন্য মাতৃভূমির ওপর দেবত্ব আরোপ করা হয়। বঙ্কিমেব ভাবনায় ভাবিত হয়ে অরবিন্দ ও বিপিন পাল 'মাদার কাল্ট' গ'ড়ে তোলেন আর তিলক সমগ্র হিন্দু-ভারত ব্যাপী এক জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের ধর্মীয় একাত্মবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, "ভারতের সমাজে 'কমন ফ্যাক্টর' হোলো হিন্দুত্ব বোধ। আমি বর্তমানে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের কথা বলছি না কারণ প্রত্যেক জায়গাতেই হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু। আমরা বলি যে পাঞ্জাব, বাঙলা, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, এবং দ্রাবিড়ের হিন্দুরা এক এবং এই একত্বের একমাত্র কাবণ হোলো হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু কতগুলি সাধারণ বিশ্বাসও [হিন্দুদের মধ্যে] পাওয়া যায় এবং এ কারণেই [ভারতেব মতো] একটি বিশাল দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে 'আমরা একই ধর্মাবলম্বী' এই বোধ জাগ্রত আছে।"

বিপিল পাল প্রচার করেন— রাজনীতি ধর্মের অধীন, আর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয়, আধ্যাত্মিক আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণাস্থল হোলো বেদান্তবাদ। তাঁর মতে ভারতে বিভিন্ন জাতি [race] থাকলেও হিন্দুরাই হলেন ভিত্তি এবং কেন্দ্র।

অরবিন্দ প্রচার কবেন, ভাবতের রাজনীতি আর ভারতের আধ্যাত্মিকতার মিলন হোলো রাজনৈতিক নবজাগরণেব অপরিহার্য শর্ত। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ হোলো ধর্ম, যা ঈশ্বব প্রেরিত। হিন্দুদের কাছে 'সনাতন ধর্মই' হোলো জাতীয়তাবাদ।

বলা বাহুল্য, রাজনীতির আর ধর্মেব [বা আধ্যাত্মিকতাব] সমীকরণের ফলে সারা ভারতবর্ষে 'সেকুলার' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদ প্রচাবিত হয়; সুবিধে হয় ইংরেজের।

এর আগেই ১৯০৫ সালে বাঙলা তথা ভারতের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রশাসনিক সুবিধার দোহাই দিয়ে বাঙলাপ্রদেশকে দুই অংশে ভাগ করেন লর্ড কার্জন (১৬ অক্টোবব, ১৯০৫)। এর উদ্দেশ্য ছিল বাঙলার জাতীয়তাবাদকে আঘাত কবা; 'হিন্দু আইডেনটিটির' প্রতিপক্ষ হিসেবে 'মুসলমান আইডেনটিটিকে' জোবদার কবা। 'নতুন' প্রদেশের লেফট্‌ন্যান্ট গভর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলার এসময় এক প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেন, তাঁর দু'টি স্ত্রী— হিন্দু আর মুসলমান, তার মধ্যে মুসলমান তাঁর প্রিয়তমা।

১৯০৬ সালে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের কৌশলে 'মুসলিম লীগ' জন্ম নেবাব পর সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা তাঁদের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন খুঁজে পান। কংগ্রেসের প্রথম আমলেব মতো ইংরেজ-ভজনা আর সাম্প্রদায়িকতার প্রচার 'মুসলিম লীগ'-এব একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ হিন্দু-মুসলমান-দ্বন্দ্বকে সঙঘাতে পরিণত করার জন্য ১৯০৯ সালের 'মর্লে-মিন্টো রিফর্ম' মাবফৎ পৃথক নির্বাচনীব্যবস্থা চালু করে। ভারতের রাজনীতি আবও জটিল হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়কতা আর ভেদবুদ্ধি প্রসারে এই ছিল সাম্রাজ্যবাদেব সবচেয়ে বড় কৌশল, ভারতবর্ষেব ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিকারক।

আমরা আগেই বলেছি, কংগ্রেস— ব্রিটিশেব 'বিলিজিয়াস নিউট্রালিটি' বা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে আস্থাশীল ছিল— সুতরাং সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচনীব্যবস্থা সম্পর্কেও কংগ্রেস কোনো কথা বলেনি। ছিটেফোঁটা ক্ষমতার লোভ কংগ্রেসনেতারা সম্বরণ করতে পারেননি। অথচ এই সংস্কার ছিল সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের রাজনীতির বিজয়, সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা এই সংস্কারে বিগলিত হন এবং এতে ক'রে 'হিন্দু স্বরাজ'-এর স্বপ্ন ব্যর্থ হবে এই আনন্দে মশগুল হয়ে পড়েন। কেবলমাত্র সুবেন্দ্রনাথ পৃথক নির্বাচনীব্যবস্থাব বিরুদ্ধে কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মডাবেট নেতা গোখেল-এর সমর্থনের অভাবে এ বিষয়ে অগ্রসব হ'তে পারেননি। ১৯০৯ সালের পৃথক নির্বাচনীব্যবস্থা মারফৎ সাম্প্রদায়িক চিন্তা প্রচাবেব আইনসম্মত রাস্তা তৈরি ক'রে দেওয়া হয়— যার চরম পরিণতি ঘটে ১৯৩৫ সালে।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী-আন্দোলনের সমসাময়িককাল থেকে 'মডারেট' আর 'জাতীয়তাবাদীদের' দ্বন্দ্ব বিস্তারলাভ করতে থাকে। ১৯০৬ সালে কোলকাতা কংগ্রেসে কোনোক্রমে 'শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ' দাদাভাই নওরোজীকে সভাপতি ক'রে সাংগঠনিক ঐক্য বজায় রাখা হয়। কিন্তু এর পরের বছর সুরাট কংগ্রেসে 'জাতীয়তাবাদী' আর 'মডারেটদেব' বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। কংগ্রেসেব এই

অধিবেশনে তিলককে লক্ষ ক'রে কোনো এক 'মডারেট' জুতো ছোড়েন। সেই 'ঐতিহাসিক জুতো' লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে 'মডারেট' সুরেন্দ্রনাথকে আঘাত করে। অনিবার্যভাবেই কংগ্রেস ভাগ হয়ে যায়, অর্থাৎ— সংগঠন থেকে জাতীয়তাবাদীদের বিতাড়িত করা হয়। বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র 'বন্দেমাতরম'-এ 'মডারেটদের' "দেশপ্রেমিকের ছদ্মবেশে বিদেশী আমলাতন্ত্রের ভৃত্য" "ভারতের স্বাধীনতার শত্রু" ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। এর পরের বছর-ক'টিতে কংগ্রেস কিছু দুর্বল প্রস্তাব পাশ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি।[৮]

১৯১৪ সালে এ্যানি বেশান্ত ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মডারেট ও জাতীয়তাবাদীদের ঐক্য স্থাপন। সাম্রাজ্যের স্নেহচ্ছায়ার অধীনে থেকে 'স্বায়ত্ত শাসন'-এর প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর 'হোম রুল' আন্দোলনের লক্ষ্য। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে কংগ্রেসে তিলক ও তাঁর অনুগামীদের পুনঃপ্রবেশের আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে তিলক ও তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেসে যোগ দেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার পথ পরিত্যাগ ক'রে শাসনক্ষমতার গৌণ অংশীদার হবার আকাঙ্খায় সাংবিধানিক পথ ধরেন। তিলক 'ভারত সম্রাটকে' 'ব্রহ্মের' সঙ্গে তুলনা করেন, যার লয় নেই ক্ষয় নেই; আর ভারতের আমলাতন্ত্রকে বলেন 'মায়া', যা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের পথ হবে আনুগত্যপূর্ণ। রাজদ্রোহ নয়।

ইতিমধ্যে ইংরেজের প্রতি সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের মোহভঙ্গ ঘটে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের বিপক্ষ শিবিরে যোগ দেয় তুরস্ক। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা মুসলমান সম্প্রদায়কে ইংরেজদের প্রতি বিরূপ ক'রে তোলে কারণ তুরস্কের খলিফার প্রতি তাঁদের ছিল ধর্মীয় আনুগত্য। প্রধানত মুসলমানদের 'প্যান ইসলামিক' দৃষ্টিভঙ্গির জন্য লীগ ও অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলমান নেতারা কংগ্রেসের কাছাকাছি আসেন। ফলে ১৯১৬ সালে কংগ্রেস আর লীগের মধ্যে ঐতিহাসিক 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে কংগ্রেস পৃথক নির্বাচনীব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ মেনে নেয়, অর্থাৎ— অ-মুসলমান নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিকে কার্যত 'হিন্দু কেন্দ্র' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তিলক-জিন্নার 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' শেষাবধি 'সাম্প্রদায়িক ত্রিভুজকে' সম্পূর্ণ করে! ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট যে ঘটনা ঘটেছিল, তার প্রাক্-অভিনয় ঘ'টে গেল ১৯১৬ সালে 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' মারফৎ। পরবর্তীকালে এই 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট'ই পাকিস্তানওয়ালাদের অন্যতম প্রধান যুক্তি হয়ে দাঁড়ায় দেশকে খণ্ডিত করার জন্য।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জনৈক প্রতীচ্যবাসী মন্তব্য করেছিলেন, ভারতবর্ষ একটি ধর্মীয় মহাদেশ, রাজনৈতিক নয়! গান্ধী তাঁর অসামান্য ধীশক্তির ফলে এই সত্যটি অনুধাবন ক'রে ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ভারতের রাজনীতিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আবির্ভাব 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট'-এর এক বছর আগে। ১৯১৫ সালে কোলকাতায় ছাত্রদের এক সভায় তিনি ঘোষণা করেন, "রাজনীতিকে ধর্মের থেকে পৃথক করা যায় না।" পরবর্তীকালে তিনি বলেন, "ধর্মের থেকে পৃথকীকৃত রাজনীতি হোলো মৃত্যুফাঁদ— কারণ তা আত্মাকে নিহত করে।"

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমাজ-জীবনের ধমনী হোলো ধর্মান্ধতা বা ধর্মশ্রয়ী

সংস্কৃতি। তিলক জনসমর্থন আদায় করার জন্য 'গো-রক্ষা' আন্দোলনেব পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন; আর ভাবীকালের 'জাতির পিতা' সাজলেন সাধু। বাংলার শাক্ত মতে নয়, জৈন ধর্মের বিশ্বাস থেকে আহরণ করলেন তাঁর 'সাফল্যের' চাবিকাঠি 'অহিংসা'![জ]

সাম্রাজ্যবাদের দমনমূলক 'রাউলাট বিল' এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯) কংগ্রেস তথা ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর নেতৃত্বের পটভূমি তৈরি ক'রে দেয়। সাম্রাজ্যবাদের দমনপীড়নের প্রতি তাঁর উত্তর ছিল অসহযোগ। ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট বোম্বাইতে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। ঠিক ওইদিনই তিলকের মৃত্যু ঘটে। ফলে আন্দোলন এক মাসের জন্য স্থগিত থাকে। এর পরে কোলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে। পণ্ডিত নেহরুর মতে কোলকাতার এই বিশেষ অধিবেশন থেকেই কংগ্রেস-রাজনীতিতে গান্ধীযুগের সূচনা।

রাজনীতিতে গান্ধী ছিলেন 'মডারেট' গোখেল আর 'জাতীয়তাবাদী' তিলকের মধ্যবর্তী স্থানে। তিলক ছিলেন 'কৌশলগতভাবে সাম্প্রদায়িক' আর গোখেল ছিলেন শান্তিপূর্ণ পথে পরিবর্তন ঘটানোর পক্ষে। গান্ধী এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। তিলকের উগ্রতা পরিত্যাগ ক'রে গান্ধী বিভিন্ন 'হিন্দু সিম্বলকে' রাজনীতির ক্ষেত্রে আমদানি করেন। তপস্যা, আত্মিক শক্তি, শত্রুর ক্ষতি না ক'রে তার হৃদয়ের পরিবর্তন, ধর্মবোধ-সঞ্জাত নৈতিকতা, অনশন, বিমূর্ত সত্য, ভবিষ্যতে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, পঙ্কস্নান (গান্ধী তাঁর আশ্রমে সর্বাঙ্গে মাটি মেখে রোগ নিরাময়ের প্রচেষ্টা করতেন; অনেকের বিশ্বাস এতে পুণ্য হয় এবং শরীর ভালো থাকে), মৌনব্রত ইত্যাদি বিষয় গান্ধীর রাজনীতিকে সাধারণ বুদ্ধির অগম্য অতীন্দ্রিয়বাদে ('মিস্টিসিজম') আচ্ছাদিত করে।

গান্ধী তাঁর বিখ্যাত 'কটিমাত্র বস্ত্র' ধারণ করেন ১৯২১ সালে। তাই এলিট সমাজের লোক হয়েও তিনি হলেন 'ভার্ণাকুলার এলিট'। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী গান্ধীকে 'ক্যারিজম্যাটিক লীডার' বলেছেন, এতে কোনো অতিরঞ্জন নেই। রাজনীতিতে 'হিন্দু সিম্বল' ব্যবহার করার জন্য গান্ধীর 'ক্যারিজমার' প্রভাব ছিল শুধুমাত্র হিন্দুসম্প্রদায়ের ওপর, ১৯১৫ থেকে ১৯২২ সাল অবধি মুসলিম লীগের অধিবেশনে তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় তিনি হিন্দু-মুসলমানের অবিসংবাদী নেতৃত্বের পদে বৃত হয়েছিলেন একথা ঠিক কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের হুজুগ কেটে যাবার পর সারা ভারতে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় তখন গান্ধীর তিন সপ্তাহের অনশনে (১৯২৪) সাম্প্রদায়িক হিন্দু-মুসলমানের চৈতন্য লাভ হয়নি। ফ্র্যাঙ্ক মোরেস বলেছেন, জনসাধারণের প্রতি গান্ধীর আবেদন ছিল 'হিন্দুঘেঁষা', রাজনীতিকে হিন্দুধর্ম-অনুপ্রাণিত করার ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানসম্প্রদায় তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েন।

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীপূর্ব যুগে 'হিন্দু আইডেনটিটি' আর 'মুসলমান আইডেনটিটি' বোধ শুধুমাত্র সমাজের উঁচুতলার গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্প্রদায়িক বোধকে নিচুতলার মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেন ভবিষ্যতের 'জাতির জনক'। গান্ধী ছিলেন সনাতনী হিন্দু। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবেদন প্রসঙ্গেও তিনি আত্মপরিচয় দিতেন হিন্দু হিসেবে। তাঁর কাছে হিন্দু সম্প্রদায় ছিল 'আমরা' আর মুসলমান সম্প্রদায় ছিল 'ওরা'। গান্ধী তাঁর 'হিন্দু আইডেনটিটি'

বজায় রাখার জন্য খ্রিষ্টান অথবা মুসলমানের গৃহে ফল ছাড়া কিছু খেতেন না। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ সমর্থন করতেন না। এ প্রসঙ্গে 'ইয়ং ইণ্ডিয়াতে' (২০শে অক্টোবর ১৯২০) তিনি লেখেন, তিনি নিজে এবং আলি ভাইরা (মহম্মদ আলি, শৌকত আলি) নিজ নিজ ধর্মমতে বিশ্বাসী— আলিভাইদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কন্যাকে আলিভাইদের কোনো একজনের পুত্রের হাতে সমর্পণ করবেন না। এরকমই ছিল গান্ধীর পরমতসহিষ্ণুতা।

গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলন[ঋ] (১৯২০-১৯২৪) সমর্থন করেন 'প্যান ইসলামিজমকে' কংগ্রেসের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য, আর ধর্মান্ধ মুসলমানদের ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষের কারণ ছিল 'প্যান ইসলামিক' দৃষ্টিভঙ্গি। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের প্রতি জনসাধারণের অসন্তোষ আর ধর্মান্ধ মুসলমানের বিক্ষোভ সংযুক্ত হয়ে পড়ে। সেকুলার জাতীয়তাবাদ বস্তুত হিন্দু-মুসলমান-জনসাধারণের ঐক্য স্থাপন করতে পারতো কিন্তু ব্রিটিশের 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি'র নীতিতে আস্থাশীল কংগ্রেস, গান্ধী, বা মুসলমান নেতারা ধর্মান্ধতার সাহায্যে রাজনীতির 'বৈতরণী পার' হবার আশা করেছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলন স্বল্পকালের জন্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন করতে পেরেছিল কিন্তু কংগ্রেস বা খিলাফৎ কমিটি— সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে উঠে জাতীয় ঐক্য স্থাপন করতে পারেনি। বস্তুত, ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রবক্তাদের পক্ষে সেটা সম্ভবও ছিল না। নেহরু লিখেছেন, উভয় সম্প্রদায়ের এই ঐক্য ছিল জাতীয়বাদ, রাজনীতি, মিস্টিসিজম, আর ধর্মোম্মত্ততার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। এই জাতীয়তাবাদ ছিল [হিন্দু-মুসলমানের] সংযুক্ত জাতীয়তাবাদ এবং এর পশ্চাতে পরিষ্কারভাবে [দু'টি বিষয় ভাগ করা যেতো] হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর মুসলমান জাতীয়তাবাদ— আংশিকভাবে ভাবতসীমান্ত ছাড়িয়ে যার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

এর আগে উল্লেখ করেছি— গান্ধী ছিলেন সনাতনী হিন্দু। তাই খিলাফৎ আন্দোলনের ডামাডোলের সময় (১৯২০) হঠাৎ তিনি ঘোষণা করেন, খিলাফতের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করতে পারেন কিন্তু পরিবর্তে তিনি মুসলমানের ছুরির [আক্রমণ] থেকে গরুকে রক্ষা করতে চান। তিনি এসময় হিন্দুদের উপদেশ দেন, যদি তারা 'গো-মাতাকে' রক্ষা করতে চায় তাহলে তাদের খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করা উচিৎ। দৈহিক শক্তির সাহায্যে গো-রক্ষা করা যাবে না, তা করা যাবে আত্মিক শক্তির সাহায্যে।

১৯২১ সালের শেষের দিকে মৌলানা হসরৎ মোহানী ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন— কিন্তু মহাত্মা হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের প্রশ্ন তুলে সে প্রস্তাব খারিজ ক'রে দেন। তিনি বলেন, এ প্রস্তাব তাঁকে দুঃখ দিয়েছে কারণ এ প্রস্তাবে দায়িত্বজ্ঞানের অভাব আছে। শেষাবধি খিলাফৎ আন্দোলনে ধর্ম আর রাজনীতির সুবিধাবাদী ঐক্যের ফল শুভ হয়নি। নেহরু বলেছেন এর ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে 'স্বামী' আর 'মোল্লা-মৌলবীদের' প্রভাব বেড়ে যায়। এঁদের অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, বা ইতিহাসচিন্তা— সবই ছিল ভুল, পরিচ্ছন্ন চিন্তার বিরোধী। এ সময় থেকেই গান্ধীর ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রভাবে অনেক [হিন্দু] গান্ধী-শিষ্য গান্ধীর 'রামরাজ্য' ইত্যাদি বাগাড়ম্বর চর্বিতচর্বন করতে শুরু করেন।

১৯২২ সাল। জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব তখন তুঙ্গে। সারা দেশ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত। হঠাৎ ৫ই ফেব্রুয়ারির এক ঘটনায় চৌরিচৌরা বিখ্যাত হয়ে পড়ে।

কৃষকজনতা পুলিশফাঁড়ি আক্রমণ ক'রে আগুন ধরিয়ে দেন, ফলে বাইশ জন পুলিশ প্রাণ হারায়। ১২ই ফেব্রুয়ারি বরদলই-এ 'ওয়ার্কিং কমিটি'র মিটিঙে মহাত্মাজী এ ঘটনার নিন্দা করেন এবং প্রস্তাব পাশ হয়— "চৌরিচৌরার জনতার অমানবিক আচরণের ফলে" আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি বাতিল ক'রে দেওয়া হোলো। এই সভায় জমিদারশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করে— এমন কিছু প্রস্তাবও গৃহীত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের পশ্চাতে বিশাল জনসমর্থন ছিল, মহাত্মাজীর অহিংসানীতির ফলে গণজাগরণ ব্যর্থ হোলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র, লাজপত রায় প্রমুখ গান্ধীর এই অদ্ভুত আচরণে ক্ষুব্ধ হন কিন্তু এঁদের বিশেষ কিছু কবার ছিল না, কারণ এর আগেই গান্ধীকে কংগ্রেসের 'সোল এক্সিকিউটিভ অথরিটি' বা 'সর্বময় কর্তা' হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ায় জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্যমের প্রকাশ ঘটে সাম্প্রদায়িকতার পথে। সারা দেশে শুরু হয় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। ১৯০০ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে সারা ভারতে মাত্র ষোলোটি দাঙ্গা ঘটেছিল। মহাত্মা তথা কংগ্রেসের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রভাবে ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে ঘটে বাহাত্তরটি দাঙ্গা। এ সময় বাঙলাদেশে হিন্দুনারী এবং গো-মাতাকে রক্ষা করার জন্য যথাক্রমে 'বেঙ্গল লীগ' এবং 'কাউ প্রোটেকশান লীগ' গঠিত হয়। অন্যদিকে মসজিদের সামনে হিন্দু-শোভাযাত্রার বাজনা নিষিদ্ধ করার জন্যও আন্দোলন শুরু হয়। গো-রক্ষা আন্দোলনে উৎসাহ এবং মসজিদের সামনে বাজনা নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন খিলাফৎ-উত্তর ভারতে হিন্দু-মুসলমানের চিন্তায় এমন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল যে, হিন্দু-মুসলমান 'ঐক্য সম্মেলনে' সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে 'গো-রক্ষা' এবং 'মসজিদেব সামনে বাজনা নিষিদ্ধ' করার দাবিই প্রধান হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কারণই যে সাম্প্রদায়িকতার উৎস একথা নেতারা মোটেই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি, ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সহজ হওয়ার পরিবর্তে তিক্ততর হয়ে ওঠে।

১৯২৮ সালে মতিলাল নেহরু সাম্প্রদায়িকতার সমাধানকল্পে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি' বা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিধ্বনি করা হয়। নেহরু রিপোর্ট প্রস্তাব করে, ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করবে। ১৯৩১ সলের করাচি কংগ্রেসেও এই নীতিরই পুনরাবৃত্তি ঘোষিত হয়। করাচি কংগ্রেসে প্রস্তাব করা হয়ঃ নৈতিকতা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে প্রত্যেক নাগরিক তাঁর ধর্মাচরণের অবাধ অধিকার পাবেন। এই প্রস্তাবে আরও বলা হয়— রাষ্ট্র 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি' বা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' পালন করবে।

একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কংগ্রেস— ব্রিটিশের ভেদনীতিকেই সাজিয়েগুছিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হিসেবে হাজির করে। ধর্মাচরণেব অবাধ অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ, বিশেষত দ্বিতীয় বিষয়টি পরবর্তীকালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের অন্যতম যুক্তি হয়ে দাঁড়ায। এর ফলে সাম্প্রদায়িক মুসলমানের ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গরু জবাইয়ের অধিকার স্বীকার ক'বে নেওয়া হয়, অন্যদিকে 'গো-মাতার' রক্ষাকর্তাদের এই কাজে বাধা দিতে উৎসাহ দেওয়া হয, যাকে কেন্দ্র ক'রে সাধারণ হিন্দু-মুসলমান পরস্পরেব প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে ল্যান্সডাউন

সাহেবই হাজির হলেন করাচি কংগ্রেসের প্রস্তাবে। এখানে বলা উচিৎ নেহরু রিপোর্ট মৌখিকভাবে পৃথক নির্বাচনীব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিল; এই রিপোর্ট সাম্প্রদায়িকতাকে সমাজের 'কৃত্রিম বিভাজন' হিসেবে চিহ্নিত করলেও হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার চাপে মুসলমানদের কিছু দাবি অগ্রাহ্য করেছিল।

১৯৩৫ সালে 'গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' মারফৎ পৃথক নির্বাচনীব্যবস্থাকে বিস্তৃত করা হয়। এই নতুন আইন হিন্দু আর মুসলমান ছাড়াও শিখ, দেশীয খৃষ্টান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্যও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য ছিল ভোটাররা যেন সাম্প্রদায়িক চিন্তায ভাবিত হয়ে ভোট দেন, নির্বাচন উপলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা শোনেন, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির থেকে প্রার্থীদের বিচার করেন, এবং তাঁদের সাম্প্রদায়িক দাবি প্রকাশ করেন। [৪]

'গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' চালু হবাব আগে একটি ঘটনা ঘটে। ১৯৩২ সালের 'কমিউনাল অ্যাওযার্ড'এ হিন্দু-অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। গান্ধী এ প্রস্তাবে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা অস্পৃশ্য সমাজ এবং হিন্দুধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর। এই ব্যবস্থা হিন্দু-সম্প্রদায়কে দ্বিখণ্ডিত করবে। তিনি অস্পৃশ্যসমাজের প্রতিনিধি আম্বেদকর এবং বর্ণহিন্দুদেরকে ঐকমত্যে আনার জন্য আমরণ অনশন শুরু করেন। গান্ধীর অনশন সত্ত্বেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন। অন্যান্য ভারতীয় নেতারা তখন আম্বেদকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন এবং গান্ধীর ছ'দিন অনশনেব পর আম্বেদকর অনেক দর-কষাকষি ক'রে অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনীব্যবস্থার দাবি প্রত্যাহার ক'রে নেন। এই মতৈক্য 'পুনা প্যাক্ট' নামে পরিচিত এবং পরে একে 'গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিযা অ্যাক্ট'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এখানেই মহাত্মাজীর মাহাত্ম্য। মুখে 'হরিজন-হবিজন' বললেও কার্যক্ষেত্রে হিন্দু-ধর্মান্ধতার সবচেয়ে কুৎসিত প্রকাশ জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি কিছুই বলেননি, আজও গান্ধীব 'হরিজনদের' পুড়িয়ে মারা হয়। অথচ আম্বেদকরের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে তিনি দ্বিধা কবেননি, যদিও এই ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশের ভেদবুদ্ধি-প্রসূত। তিনি জানতেন, কংগ্রেস-নেতাবা এবং আম্বেদকর তাঁর মৃত্যুর আগেই ঐকমত্যে আসবেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মুসলমান-নেতারা তাঁর মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখ পাবেন না। আবার অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও তাঁর মতো 'সেফটি ভালভ্‌টিকে' সহজে ধরাধাম ত্যাগ করতে দেবেন না। তাই ১৯৩৫ সালের 'গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে তিনি অনশন করেননি এবং জহরলাল যখন এই আইনকে 'দাসত্বের পরোয়ানা' বলেন, তখন মহাত্মাজী কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী 'ওল্ডগার্ডদের' (যার নেতা ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল) সমর্থন করেন। 'ওল্ডগার্ডদের' উদ্দেশ্য ছিল এই আইনের কর্মক্ষমতা যাচাই ক'রে দেখা। ধীরে ধীরে নেহরুর ওপর প্রভাব বিস্তার কবা হয় এবং দাওয়াই গেলার বদলে ১৯৩৬ সালে তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতির পদে নির্বাচিত করা হয়। গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনে ভোট সংগ্রহ এবং কংগ্রেসের 'বামপন্থী অংশ' ও 'ওল্ডগার্ডদেব' সহযোগ স্থাপন করা।

১৯৩৭ সালে নির্বাচন হয়। কংগ্রেস এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কংগ্রেসেব ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি সক্রিয় হযে ওঠে এবং ব্যাপকভাবে বাপুজীব 'ক্যারিজমাকে' এক্সপ্লয়েট করা হয়।

মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন ঃ মহাত্মাকে ভোট দেবার জন্য গ্রাম্য ভোটারদের আবেদন জানানো হোতো। কংগ্রেসের স্লোগান ছিল, কংগ্রেসকে ভোট দেবার অর্থ মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ। প্রকৃতপক্ষে ভোটাররাও 'মন্দিরে যাবার উৎসাহ নিয়েই' ভোটকেন্দ্রে যেতেন, 'ব্যালট পেপার'-এর সঙ্গে থাকতো ফুল, ধানের শিস, আর পূজার অন্যান্য উপকরণ।[ট] এমনই ছিল তথাকথিত 'সেকুলার' সংগঠন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতা মহাত্মাজীর ইমেজ।[ঠ] "জনসাধারণ শ্রদ্ধা করেন মহাত্মাকে। [তিনি] অপার্থিব শক্তির ধারক, ধর্মবোধের উৎস।" গান্ধীর ভূমিকার এমন স্পষ্ট ব্যাখ্যা মানবেন্দ্রনাথ রায় ছাড়া বোধহয় আর কেউই করেননি।

নির্বাচনে কংগ্রেস সাফল্য লাভ করে। ব্রিটিশ-ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে বোম্বাই, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা— এই ছ'টি প্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করে। কংগ্রেসের এই বিজয়কে নেহরু— সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় রূপে বর্ণনা করেন। ইতিমধ্যে জিন্নার রূপান্তর ঘ'টে গেছে।[ড] কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ হয় ১৯২৮ সালে। ১৯৩৯ সালে তিনি বিলেত থেকে ফিরে আসেন কট্টর 'মুসলিম নেতা' হিসেবে। নির্বাচনের ফলাফল তাঁকে হতাশ করলেও তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেন, যাতে লীগের রাজনৈতিক প্রভাব বজায় থাকে। কিন্তু 'বিজয়োন্মত্ততায়' কংগ্রেসের নেতারা লীগের সঙ্গে কোনো কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় যেতে রাজি হননি। এর আগে নেহরু একবার বলেছিলেন, ভারতের রাজনীতিতে কেবলমাত্র দু'টি পক্ষ— সরকার এবং কংগ্রেস দল। জিন্নার প্রত্যুত্তর ছিল "এ দেশে আরও একটি পক্ষ আছে, তা হোলো মুসলমান [সম্প্রদায়]!" কংগ্রেস বা নেহরু একথার কোনো গুরুত্ব দেননি, সম্ভবত জিন্নাও ভাবতে পারেননি যে তিনি ভবিষ্যতের এক অনিবার্যতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন।

কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে কংগ্রেসের অনিচ্ছা মুসলিম লীগের ভীতির কারণ হয়েছিল। মুসলিম লীগ এর অর্থ করেছিল স্বাধীনতা মানে হিন্দুর একনায়কত্ব। পার্সিভাল গ্রিফিথস্ এই ঘটনাকে কংগ্রেসের 'ট্যাকটিকাল ব্লাণ্ডার' বা 'কৌশলগত ভুল' বলেছেন, আর ফিলিফ্সও মনে করেন লীগের সঙ্গে মন্ত্রীসভা গঠন না করা কংগ্রেসের বিরাট ভুল হয়েছিল। নেহরুর জীবনীকার ফ্রান্সিস মোরেস বলেছেন, কংগ্রেস যদি লীগকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারতো তাহলে হয়তো পাকিস্তানের জন্ম হোতো না। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় যেতে কংগ্রেসের অনিচ্ছা লীগকে দুর্বল করার পরিবর্তে অদূর ভবিষ্যতে জিন্নাকে শক্তিশালী করেছিল।

কবি ইকবাল মনে করতেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জিন্নাই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান নেতা। তাই ১৯৩৭ সালে তিনি জিন্নার কাছে ইসলামের ওপর হিন্দু-প্রভুত্বের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ভবিষ্যতে স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিল। পাঞ্জাবে 'প্রফেট'-এর অসম্মান, 'কোরাণ' পোড়ানোর ঘটনা, আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা উল্লেখ ক'রে তিনি জিন্নাকে লেখেন— একমাত্র পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রই অ-মুসলমানের প্রভুত্ব থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে। পরবর্তীকালে জিন্না— তাঁর ওপর কবি ইকবালের প্রভাবের কথা স্বীকার করেন।

জিন্না এসময় থেকেই 'ঘর গোছানোর' দিকে নজর দেন। ১৯৩৫-এর অক্টোবরে মুসলিম লীগের এক সভায় তিনি মন্তব্য করেন, বিগত দশ বছরে কংগ্রেসের 'হিন্দু পলিসি' ভারতের

মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে। এই বক্তৃতায় মুসলমানদের তিনি লীগের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্য আবেদন করেন।

জিন্নার এই বক্তৃতার সমালোচনা ক'রে বাপুজী বলেন, "আপনার বক্তৃতা এক যুদ্ধ ঘোষণা!" শুরু হয় গান্ধী-জিন্না বিতর্ক। গান্ধী তাঁর এক চিঠিতে জিন্নাকে উদ্দেশ ক'রে বলেন, "আপনি কি এখনও সেই জাতীয়তাবাদী জিন্না আছেন?" জিন্নার উত্তর, "জাতীয়তাবাদ কোনো ব্যক্তির একচেটিয়া [সম্পত্তি] নয়।" গান্ধী এসময় হিন্দু-মুসলমান পারস্পবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলানা আজাদের পরামর্শ অনুসারে চলতেন। তাই তিনি জিন্না ও আজাদের বৈঠকের প্রস্তাব করেন। কিন্তু জিন্নার দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। তিনি আলীগড়ের ছাত্রদের কাছে কংগ্রেসকে 'হিন্দুর দল' আর কংগ্রেসী মুসলমান-নেতাদের 'বিশ্বাসঘাতক' রূপে বর্ণনা করেন। তিনের দশকের শেষদিকে জিন্নার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় গান্ধীকে হিন্দুসম্প্রদায়ের এবং নিজেকে মুসলমানসম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে প্রচার করা। তিনি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটিতে মুসলমানদের নিয়োগ না করার জন্যও গান্ধীকে 'অনুরোধ' করেন। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে পাটনায় অনুষ্ঠিত লীগের এক সভায় জিন্না অভিযোগ করেন, গান্ধীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কংগ্রেসকে হিন্দু পুনরুত্থান আর হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক যন্ত্রে পরিণত করেছেন। গান্ধী 'মহাত্মা' অভিধায় কথিত হতেন, ইস্কুলে ইস্কুলে ছাত্রেরা তাঁর ছবি উদ্দেশ ক'রে শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করতো। লীগ কঠোর ভাষায় এই 'মহাত্মা কাল্ট'-এর সমালোচনা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে বিনা পরামর্শে ভারতকে যুদ্ধে জড়ানোর প্রতিবাদে ১৯৩৯-এর অক্টোবরে কংগ্রেস প্রাদেশিক আইনসভা থেকে পদত্যাগ করে। লীগ এই উপলক্ষ্যে ২২শে ডিসেম্বর 'মুক্তি দিবস' পালনের ডাক দেয়। লীগের তরফ থেকে 'মুক্তি দিবস' পালন করা খুব অযৌক্তিক হয়নি। কারণ ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে বহু কংগ্রেসী মন্ত্রীই তখন উদ্ধত আচরণ করতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাম্প্রদায়িক।

এরপরে ঘটে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৪০ সালে বিখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' পাশ হয়, পববর্তীকালে যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-পরিচালিত সংবাদপত্রেই লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে অভিহিত করা হয় এবং জিন্না এজন্য 'হিন্দু প্রেসকে' ধন্যবাদ জানান। 'লাহোর ভাষণে' জিন্না তাঁর দ্বি-জাতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। প্রায় একলক্ষ শ্রোতা তাঁর ভাষণ শোনেন; জিন্না সভাস্থলেই ঘোষণা করেন 'মুসলমান জাতির' জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন। শ্রোতাদের হর্ষধ্বনিতে তাঁর কণ্ঠস্বর ডুবে যায়। হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে গান্ধীর কোনো নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। সাম্প্রদায়িক মুসলমান-নেতাদের দ্বি-জাতি তত্ত্বের উত্তরে তাঁদের মন ভেজাবার জন্যই বোধহয় তিনি একবার বলেছিলেন, মুসলমানরাও কোরাণ চর্চা করেন এবং "আমিও সেই পবিত্র গ্রন্থটির কিছু কিছু পাঠ করেছি।" জিন্না এই সুযোগটি হাতছাড়া করেননি। তিনি গান্ধীকে ব্যাঙ্গ ক'রে বলেন, [অবিভক্ত ভারতে] মুসলমানের স্বার্থ যে রক্ষিত হবে, এর সহজ সরল কারণটি হোলো গান্ধী কোরাণ পড়েছেন! জিন্নার এই ব্যাঙ্গ শ্রোতাদেব হাসির উদ্রেক করে।

লীগের অভিমত ছিল কংগ্রেস-— হিন্দু সংগঠন। গান্ধী হরিজন' পত্রিকায় এর প্রতিবাদ করেন। তাঁর যুক্তি ছিল-— কংগ্রেস হিন্দু সংগঠন নয়, কারণ এই সংগঠনের সভাপতি একজন

মুসলমান এবং এর ওয়ার্কিং কমিটির পনেরো জন সদস্যের মধ্যে চারজন মুসলমান। বস্তুতপক্ষে কংগ্রেস দল সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে তার ভাবমূর্তি স্থাপন করার জন্য চারের দশকে মৌলানা আজাদকে বেশ কয়েকবার দলের সভাপতির পদে নির্বাচিত করে (১৯৩৯-১৯৪৬)। কিন্তু এর ফলে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি; ব্যাপক মুসলমানই কংগ্রেসের ধর্মাশ্রয়ী-রাজনীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করতে পারেননি। দ্বি-জাতি তত্ত্বকে খণ্ডন করার জন্য গান্ধী এসময় ভাবালুতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি বলেন— যদি ভারতের বিশাল সংখ্যক মুসলমান মনে করেন যে তাঁরা হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাইদের সঙ্গে একই জাতির ভুক্ত নন তাহলে তাঁদের [এই চিন্তায়] কে বাধা দেবেন? ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে গান্ধী ঘোষণা করেন— দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নেওয়া যায় না, "আমি হিন্দু ব'লে এ কথা বলছি না, আমি এই মঞ্চ থেকে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী এবং অন্যান্য সকলের প্রতিনিধি হয়েই একথা বলছি। আমি তাদের বলবো, ভারত ভাগ করার আগে আমাকে বিভক্ত করো।"

কংগ্রেসের হিন্দুনেতাদের মধ্যে অনেকেই গো-মাতার ভক্ত ছিলেন। গান্ধীশিষ্য রাজাগোপাল আচারি তাই দেশভাগের প্রস্তাবকে দুই হিন্দু ভাইয়ের দ্বন্দ্ব রূপে বর্ণনা করেন, যেখানে এক ভাই 'গো-মাতার' দেহ দু'টুকরো করতে চায়। গান্ধীর গো-ভক্তি এসময় আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তিনি এক বিবৃতিতে (এপ্রিল ১৯৪০) মুসলমানদের গরু জবাইয়ের পূর্ণ অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়েও নিজের পরিচয় দেন 'গরুর পূজক' হিসেবে, "আমি আমার জননীকে যেমন শ্রদ্ধা করি, গরুকেও তেমনই শ্রদ্ধা করি!" বলা বাহুল্য একথায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতিই দেওয়া হয়েছিল।

'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হবার পর দ্বি-জাতি তত্ত্ব তথা দেশভাগের দাবির বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোনো জোরালো যুক্তি উপস্থিত করতে পারেনি। ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলে, এই কমিটি কোনো অঞ্চলের জনসাধারণকে তাঁদের ঘোষিত এবং প্রতিষ্ঠিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে রাখার কথা চিন্তা করতে পারে না। আর প্রায় পরাজিতের মনোভাব নিয়েই গান্ধী বলেন, যদি ভারতের বিশাল সংখ্যক মুসলমান নিজেদের [হিন্দুদের থেকে] পৃথক জাতি হিসেবে ভাবেন তাহলে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা তাঁদের অন্য চিন্তায় ভাবিত করতে পারে।[৮]

যুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯৪৬-এর নির্বাচনে লীগ বিপুল সাফল্য অর্জন করে। পাকিস্তান হাসিল করার জন্য মুসলিম লীগ 'ডিরেক্ট অ্যাকশান ডে' পালন করার ডাক দেয়। দিন স্থির হয় ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬। বাঙলাদেশে সোহ্‌রাওয়ার্দি 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আওয়াজ তুলে প্রস্তুত হন। শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কোলকাতা এক 'নরকে' পরিণত হয়। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার আশা বিলুপ্ত হয়। দ্বি-জাতি তত্ত্ব বিজয়লাভ করে।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে লণ্ডনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল জিন্নার দাবির অনুকূলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর দাবিতে অটল থাকলে তিনি পাকিস্তান পাবেন। ১৯৪৭-এর মার্চ মাসে মাউণ্টব্যাটেন সাহেব এলেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা রূপে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তখন এক নিত্যকার ঘটনা। এপ্রিলে গান্ধী-জিন্না এক যৌথ আবেদন মারফৎ জনসাধারণকে হিংসা থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানান এবং এতদিনে পরোক্ষভাবে হ'লেও গান্ধী স্বীকার ক'রে নিলেন— তিনি হিন্দুর প্রতিনিধি, আর মুসলমানদের প্রতিনিধি 'কায়েদ-এ-আজম' জিন্না।

জুন মাসের ৩ তারিখে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' মারফৎ মাউন্টব্যাটেন 'ক্ষমতা হস্তান্তব' তথা দেশবিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা কবেন। নেহরু, জিন্না, এবং শিখনেতা বলদেব সিং পরিচ্ছন্ন এবং সমতাপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মাউন্টব্যাটনের প্রশংসা করেন। মহাত্মা গান্ধীকেও দেশবিভাগের প্রস্তাবে রাজি করানো হয়েছিল। অথচ এর অল্প কিছুদিন আগেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কংগ্রেস যদি দেশবিভাগের প্রস্তাবে রাজি হয় তাহলে দেশবিভাগ "আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে হবে।" মাউন্টব্যাটেন উপমহাদেশে শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— অথচ "সারা দেশে রক্তের নদী বয়ে গেছিল, নির্দোষ হিন্দু-মুসলমানের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।" [৫] ছ'লক্ষ নরনারীশিশু প্রাণ হারালেন এবং উপমহাদেশের ষোলো লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হলেন।

দেশবিভাগ তথা পাকিস্তানের উদ্ভব কি এড়ানো যেতো? লিওনার্ড মোসলি বলেছেন, কংগ্রেস নেতারা জিন্নার মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধরলেই দেশবিভাগ এড়ানো যেতো। কারণ পাকিস্তান জিন্নার একক প্রচেষ্টার ফল। ল্যারি কলিনস্ এবং লা পিয়াবে বলেছেন, দেশবিভাগের কিছুদিন আগে থেকেই জিন্না 'মৃত্যু পরোয়ানা' নিয়েই বেঁচে ছিলেন। জিন্নার দুরারোগ্য যক্ষ্মা হয়েছিল কিন্তু ব্রিটিশ বা কংগ্রেস উভয় পক্ষেরই একথা অজানা ছিল। জিন্নার মৃত্যু যদি কিছুদিন আগে হোতো অথবা দেশবিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দানের ব্যাপাবে কংগ্রেস গড়িমসি করতো, তাহলে দেশবিভাগকে হয়তো শেষপর্যন্ত রোধ করা যেতো! কিন্তু "ক্ষমতা ভোগের জন্য লালায়িত নেহরু-প্যাটেল এবং তাঁদের কংগ্রেসী বন্ধুরা নাকের ডগায় ঝুলতে থাকা মাউন্টব্যাটেন-প্রদত্ত গাজরখণ্ডের লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। ওটা তাঁরা গোগ্রাসে গিলে ফেললেন।"[৬]

নেহরু একবার ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় বলেছিলেন, জিন্নাকে পাকিস্তান উপহার দিয়ে তিনি মাথাধরার আরোগ্যের জন্য মাথাটাই কেটে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিভাগোত্তর ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিসংখ্যান প্রমাণ করে— সেই 'মাথাধরা' আজও সারেনি। আরোগ্যের কোনো লক্ষণও নেই। মৌলানা আজাদ খুব সঠিকভাবেই বলেছিলেন, "দেশবিভাগ কখনোই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করবে না।" আজাদের কথাব সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতি, দ্বি-জাতি তত্ত্বের উৎপত্তি, আর দেশবিভাগেব ইতিহাস নিয়ে সুবিশাল আলোচনা করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে এ বিযয নিয়ে বেশ কিছু আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লেখকই কংগ্রেস-রাজনীতিকে সেকুলার রাজনীতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কংগ্রেস (বিশেষত গান্ধীর ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি) সম্পর্কে আলোচনা খুব কমই হয়েছে। দেশবিভাগের দায়িত্ব শুধুমাত্র লীগের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে না। ব্রিটিশ-ভারতে যে 'কমিউনাল ট্রাঙ্গেল' বা 'সাম্প্রদায়িক ত্রিভুজ' তৈবি হয়েছিল তার মূলে হিন্দু আর মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীব অসম বিকাশ, ব্রিটিশেব ভেদনীতি, আব রাজনীতিব ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিব সংমিশ্রণ। কংগ্রেস বা লীগনেতাবা শ্রেণীস্বার্থগত কারণেই শ্রেণীসংগ্রামের (জাতীয় কংগ্রেসের অধীন শ্রেণীসংগ্রাম) মতাদর্শ থেকে শতহস্ত দূবে ছিলেন। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়েব নেতারাই ভাবতের প্রধান দু'টি সম্প্রদায়কে 'হোমোজিনিয়াস কমিউনিটি' হিসেবেই দেখেছিলেন। শ্রেণীস্বার্থগত-ঐক্য হিন্দু-মুসলমান শ্রমজীবী মানুষকে এক শিবিরে সমবেত কবাতে পাবতো। কিন্তু গান্ধী বা জিন্না উভয়েই দু'টি সম্প্রদায়েব মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি আব সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন। তাই এঁরা একই সম্প্রদায়েব বিরোধী শ্রেণীগুলিব

মধ্যে সমস্বার্থ বোধ স্থাপন করার জন্য ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। হিন্দু-শ্রমিকের 'পিতা' হবার জন্য গান্ধীর 'কোষাগার' শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা মহাশয়কে ব্রহ্মচারী সাজতে হয়েছিল; হিন্দু-জমিদারের 'পুত্র' কৃষককেও একই কারণে 'রামধুন' শোনানো ছাড়া মহাত্মার আর কোনো উপায় ছিল না, জনসমর্থন আদায় করার জন্য নেহরুর 'অ্যাগ্‌নস্টিজম' ('ঈশ্বর সম্পর্কে বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে কিছুই জানা যায় না'— এই মতবাদ)-এর চেয়ে ধর্মপ্রাণ মহাত্মার 'গো-মাতার' পূজা অনেক বেশি কার্যকর হয়েছিল। অন্যদিকে, ইসলামে নিষিদ্ধ মাংস যার প্রিয় খাদ্য ছিল, যার পাঠ্যতালিকায় কোরাণ অনুপস্থিত ছিল, যিনি সুরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই জিন্নাসাহেবও 'বিপন্ন ইসলাম'-এর জিগির তুলেছিলেন এবং 'কায়েদ-এ-আজম' (মহান নেতা)-এর আসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

লীগের পক্ষে কংগ্রেসের ওপর 'হিন্দু লেবেল' লাগানো খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এর যথার্থতাও অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই, লীগের এই অভিযোগ সম্পর্কে পানিক্কর বলেছেন— একথা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে অসত্য হ'লেও কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ অনেকাংশেই সত্য। সুগত দাশগুপ্ত মনে করেন, কংগ্রেস-আন্দোলনকে 'সেকুলার' ভাবা হ'লেও কংগ্রেস বস্তুত হিন্দুআদর্শেই পরিচালিত হোতো। আমাদের বিচারে-- একমাত্র নেহরু ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনো নেতাই প্রকৃত অর্থে সেকুলার ছিলেন না। আর, বোধহয় এই কারণেই ধর্মান্ধ বল্লভভাই প্যাটেল নেহরুকে "একমাত্র জাতীয়তাবাদী মুসলিম" ব'লে উপহাস করতেন। গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেসীদের ধর্মান্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৩৮ সালে। এসময় "বারাণসীতে গান্ধীজী 'ভারতমাতা মন্দির' উদ্‌ঘাটন করেন, "আর বহু বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত থেকে আবদুল গফ্‌ফর খান-এর মতো মানুষকে দেখতে হোলো যে— মূর্তির বদলে খোদিত রয়েছে ভারতবর্ষের মানচিত্র আর দেশের বিভিন্ন লিপি। অথচ যে উর্দুভাষা হোলো হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সৃষ্টি তার চিহ্নমাত্রও নেই। অজুহাত এই যে, উর্দুভাষার লিপি হোলো বিদেশী।"[৯] বলা বাহুল্য, তখনকার ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিশেষ অবনতি ঘ'টে চলেছে রাজনৈতিক নেতাদের মূঢ়তা আর ক্ষমতালিপ্সার জন্য।

আজকের ভারতে হিন্দুত্ব— শাসকদের হাতের অন্যতম অস্ত্র; জাতীয়তাবাদীদের আমলে যা ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের হাতিয়ার, আজ তা উৎপীড়নের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, আজ তা শাসনক্ষমতার বৈধতার অন্যতম ভিত্তি। তাই শোষিত নিপীড়িত মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের জন্য গণ-আন্দোলনের পাশাপাশি সেকুলারিজম-এর পক্ষে আন্দোলন গ'ড়ে তোলা একান্তই জরুরি।

টীকা

ক. বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিন পাল প্রমুখের নেতৃত্বে যে আন্দোলন বিকাশলাভ করেছিল তাকে অনেকে 'চরমপন্থা', আর এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের 'চরমপন্থী' বলেছেন। কিন্তু আমরা সত্যপাল ও প্রবোধচন্দ্রের অনুসরণে এঁদের 'জাতীয়তাবাদী' বলবো; যদিও স্বল্পকালের জন্য বিপিনচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি তাঁর ও তিলকের সমর্থন ছিল।

খ. এই নীতির প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণার নিদর্শন পাওয়া যায় ১৮২১ সালে।

গ. এখানে উল্লেখ করা উচিৎ দয়ানন্দ ১৮৮২ সালে 'গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলন' গ'ড়ে তোলেন এবং বাঙালি নাট্যকার ও সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন ১৮৮৮ সালে 'গো-হত্যা থেকে বিরত' থাকার জন্য মুসলমানদের আবেদন জানান।

ঘ. পাশ্চাত্য জগতে রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, আধুনিক নগরের বিস্তার, শিল্পবিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলশ্রুতি স্বরূপ 'সেকুলারিজম'-এর উদ্ভব হয়। ফলে সামন্ততন্ত্রের সাংস্কৃতিক উপরিকাঠামো অর্থাৎ ধর্মীয় কুসংস্কার এবং চার্চ ও পাদ্রীদের অত্যাচার লোপ পায় বা হ্রাস পায়। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বাধীন বিকাশের জন্যই তাদের প্রয়োজন হয়েছিল ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধাচরণ এবং বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার বিস্তার। মানুষের ওপরে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন রুশো ও কান্ট। বেন্থামের 'ইউটিলিটারিয়ানিজম' বা 'উপযোগবাদ'— সমাজ-সংস্কারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে 'সেকুলারিজম' এক পরিচ্ছন্ন ও শক্তিশালী মতবাদ হিসেবে বিকাশলাভ করে। মধ্যযুগে অলৌকিক শক্তি, 'অদেখা জগৎ', বা পাপপুণ্য ইত্যাদি ধারণা ছিল সর্বব্যাপী। সেকুলার মতাদর্শের উদ্ভবের ফলে এই ধারণাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজনীতি, শিক্ষা, ও জাগতিক বিষয়সমূহ ধর্মীয়-কর্তৃত্বের থেকে মুক্তিলাভ করে। জেফারসন বলেন, "পৃথিবী মানুষের।" রাষ্ট্র, রাজনীতি, বা শাসকের সঙ্গে ধর্মীয়-জগতের এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর গ'ড়ে ওঠে। রাষ্ট্র অনেকক্ষেত্রে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রসারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলে 'ধর্মবিরোধী' আন্দোলন ব্যাপ্ত আর বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালের সমাজবিজ্ঞানীরা একে 'নেগেটিভলী রিলিজিয়াস' অর্থাৎ ধর্মীয়-বিষয়সমূহের প্রতি 'নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি' রূপে বর্ণনা করেন।

আমাদের দেশের মতো অনুন্নত ধর্মান্ধ দেশে ধর্মীয়-বিষয়সমূহ 'ইতিবাচক' রূপে দৃষ্ট হয়। অসংখ্য দৃষ্টান্তের একটি আমরা উল্লেখ করতে পারি, "চাকলা পঞ্চায়েতে পার পাটনা গ্রামে বুজরুক ব্রজেন মুঠো-মুঠো মাটি 'বিক্রি' ক'রে চলেছে কঠিন অসুখ সারানোর আশ্বাস দিয়ে।" ধর্মভীরু মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে 'এক্সপ্লয়েট' ক'রে, কিছু 'গালগল্প' প্রচার ক'রে ধর্মের আচ্ছাদনে জনৈক ব্রজেন এই পবিত্র মাটির ব্যবসা চালাচ্ছে। আজকাল, ৭.৯.২০০২।

ঙ. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আমীর আলির 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' ১৮৮৫-র কংগ্রেস অধিবেশন সমর্থন করে কিন্তু পরের বছর এই সংগঠন কংগ্রেসের প্রতি তার সমর্থন প্রত্যাহার ক'রে নেয়।

চ. 'কাঁদুনি' কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের।

শুধু বিবেকানন্দই নন, 'মডারেট' কংগ্রেসীদের 'আবেদন-নিবেদন'-এর রাজনীতিকে বঙ্কিমচন্দ্রও ব্যাঙ্গ করেছেন।

ছ. 'হিন্দু-কংগ্রেস'-এর এই বিপর্যয়ের খবরে উল্লসিত হয়ে 'ইসলাম-ভক্ত' 'ইসলাম প্রচারক' লেখে (৮ম বর্ষ; ৮ম সংখ্যা; ১৩১৪), "২২ বৎসরের কংগ্রেস ২৩ বৎসরে পা দিয়া যমের বাড়ি গিয়াছে। সুখের বিষয়, ২/৪টা নগণ্য মুসলমান-নামধারী বিকৃত স্বদেশী পাণ্ডা ব্যতীত কোনো নামজাদা মুসলমান-কংগ্রেসের সেই মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না।"

ভারতের জাতীয়তার বিকাশের পথে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিশ্বাস আস্থা আর সৌহার্দ্যের অপ্রতুলতার প্রধান কারণ যে অর্থনৈতিক, অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব— তা প্রকাশ পায়

'ইসলাম প্রচারক'-এর একই সংখ্যায়, ''হিন্দুগণ একদিকে মুসলমানদিগকে 'ভাই ভাই' বলিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছেন, অন্যদিকে হিন্দু-জমিদার ও অপরাপর শ্রেণীর হিন্দুদিগের ভীষণ অত্যাচারে দরিদ্র মুসলমান জর্জরিত.... মুসলমানগণ এক্ষণে তাঁহাদের কপট বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই কপটতার জন্যই মহাবিচারক খোদাতাআলা তাঁহাদের ২২ বৎসরের কংগ্রেসকে এ বৎসর সুরাট নগরে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। তাপ্তী নদীর পানিতে কংগ্রেসের চিতাভস্ম বিধৌত হইয়াছে।''

জ. গান্ধীজীর 'অহিংসা বাতিক' তাঁকে এমন পেয়ে বসে যে পরবর্তীকালে কোলকাতায় এক ঘরোয়া আলোচনায় দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, এবং তরুণ সুভাষচন্দ্রের সামনে তিনি বলেন বাংলার বিপ্লবীরা 'দেশের শত্রু'। একথায় সকলে হতবাক হ'লেও শরৎচন্দ্র গান্ধীজীর কথার প্রতিবাদ করেন এবং তর্কে পরাজিত হয়ে গান্ধী তাঁর কথা 'উইথড্র' করতে বাধ্য হন।

যখন মহাত্মাজীর অন্ধ চাটুকাররা তাঁকে হিট্‌লার বা মুসোলীনির সঙ্গে তুলনা করেন তখন তিনি নিজে অথবা অহিংসার অন্যান্য পূজারীরা নীরব থাকেন; ''ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদি গ'ড়ে উঠছে তার কি স্পর্দ্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি যখন মহাত্মাজীকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনী ও হিট্‌লারের সমকক্ষ ব'লে বিশ্ব সমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন?'' [রবীন্দ্রনাথ , ১৯৩৭]।

ঝ. 'খিলাফৎ আন্দোলন'-এর উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের বিভাজন রোধ করা, 'অটোমান খলিফার' পদ বজায় রাখা, এবং আরব ভূমির পরাধীনতা রোধ করা। এসময় 'উলেমা' সমাজ 'জামাইৎ-উল-উলেমা-ই হিন্দ' গঠন করেন। হাকিম আজমল খান, ডঃ এম. এ. আনসারী, মৌলানা হসরৎ মোহানী এবং আলি ভাইরা খিলাফৎ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। জামাইৎ-উল-উলেমা' অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন ক'রে এক ফতোয়া জারি করে। এতে ৯২৫ জন বিশিষ্ট মুসলমান স্বাক্ষর করেন। 'মুসলিম লীগ' এসময়ে খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় হিন্দু-ধর্মান্ধতা আর মুসলমান-ধর্মান্ধতার এক বিচিত্র 'ঐক্য' গ'ড়ে ওঠে। বাঙলাদেশে কংগ্রেস-কমিটির পাশাপাশি 'খিলাফৎ কমিটি' সংগঠিত হয়। এসময় দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটিতে কয়েকটি ছত্র সংযোজিত হয়— ''কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ভয়।/চল্লিশ কোটি ভ্রাতৃ মিলিয়া গাহিবো যখন ধর্মের জয়।/ইসলাম খলিফা করিতে ধ্বংস কখনো পারেনি-- পারেনি কেউ/ধ্বংসের স্রোতে ডুবিবে অরি যখন উঠিবে— উঠিবে ঢেউ....''। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় হিন্দুরা 'আল্লাহো আকবর' আর মুসলমানরা 'বন্দেমাতরম' সদর্পে উচ্চারণ করলেও এই 'ঐক্য' স্থায়ী হয়নি।

হিন্দু মুসলমানের এই ক্ষণস্থায়ী ঐক্য সম্পর্কে 'মোসলেম ভারত' (১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) লেখে, ''আজ যে 'খেলাফৎ' এর জন্য আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি, সেই 'খেলাফৎ' এর প্রতিনিধিরাই যদি কালক্রমে ভারত আক্রমণ করিতে আসেন, তবে তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করাই হইবে আমাদের কর্তব্য . ভারতের এই যে অগণিত হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান - তাহাদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিবার অধিকার কাহারও নাই, আমাদের খলিফার প্রতিনিধিবর্গেরও নাই।''

প্রকৃতপক্ষে এই সুস্থচিন্তার বিপরীতে অসুস্থ ধর্মান্ধ ধারাটিই ছিল প্রবল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ছিল অতলস্পর্শী অজ্ঞতা আর মূঢ়তায় নিমজ্জিত। 'ইসলাম দর্শন' (২য়

বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) এ প্রসঙ্গে লেখে, "হায়! আজ অজ্ঞ মোসলমান সমাজ মূর্খ স্বদেশী মওলানাদিগের প্রভাবে দ্বিন ও ঈমান হারাইয়া হিন্দুর সম্মিলিতভাবে কংগ্রেস, কনফারেন্স বিভিন্ন সভা-সমিতিতে সিংহবাহিনী মূর্তিপূজা, ভারতজননী অর্চনা, তিলক মূর্তির তর্পণ ও গো-মাতার আরাধনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে.... বাজারে একখানি বিখ্যাত ছবিতে দেখিলাম 'ভারত মাতা' পরমাসুন্দরী দ্রৌপদী মূর্তিতে সভার মধ্যে বিপন্না। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট রূপে 'দুঃশাসন' তাহার.... শাড়িখানি টানিয়া বস্ত্র হরণের অভিনয় করিতেছে। অন্যদিকে মওলানা মহম্মদ আলি, শওকত আলি, মিঃ সি, আর. দাস, লালা লাজপত রায়, ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু পঞ্চপাণ্ডবের বেশে গদা অসি ও ধনুর্বান লইয়া দুঃশাসনকে শাস্তি দিতে সমুদ্যত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রূপী গান্ধী.... সুদর্শন চক্ররূপ 'চরকা' হইতে দ্রৌপদী রূপিনী সুন্দরীর বস্ত্র যোগাইতে নিরত।"

এই হাস্যকর, শিশুসুলভ সাম্প্রদায়িক প্রীতি তথা দেশপ্রেমকে পাথেয় ক'রে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না— শক্তিশালী ও ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো তো দূরের কথা।

প্রকৃতপক্ষে 'মোল্লা-মৌলবীদের' 'প্যান ইসলামিক' চিন্তা আর দেশপ্রেমের বিদ্ঘুটে মিশ্রণের সারবস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় শওকত আলির সওদাগর-সুলভ এক ঘোষণায়, "তোমরা আমাকে খিলাফৎ দাও, আমি তোমাদের গো-রক্ষার [প্রতিশ্রুতি] দেবো।" [Sandhya Chaudhiri Gandhi & The Partition of India, New Delhi 1984 p 15]।

বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশের বিভেদনীতির ফলে 'হিন্দুজাতির' প্রতিপক্ষ 'মুসলমান জাতির' পারস্পরিক সম্পর্ক এতটাই কদর্য রূপ ধারণ করে যে, দেশের স্বাধীনতা বা গরিব মানুষের মুক্তির কথা হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গ ভেবে দেখবার সময় পাননি ব'লেই মনে হয়। তাই পরবর্তীকালে 'খিলাফৎ আন্দোলন'-এর অগ্রগণ্য নেতা মহম্মদ আলি ১৯২৮ সালে বলেন, "পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে ডোমিনিয়ন স্টেটাস-এ রাজি হ'তে আপনারা কসুর করেন না, কিন্তু স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানের শতকরা তেত্রিশটি আসনের দাবি অগ্রাহ্য ক'রে শতকরা পঁচিশ দেবেন ব'লে দর-কষাকষি করছেন। আপনারা ইহুদি, আপনারা বেনিয়া।" আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২.২.১৯৮৯।

৭. ব্রিটিশ-প্রধানমন্ত্রী রেমজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের ভারত সম্পর্কিত সাংবিধানিক প্রস্তাব [১৭ই আগস্ট, ১৯৩২]। এই প্রস্তাবে মুসলমান-সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনীব্যবস্থা বহাল রাখা হয় এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় এই সম্প্রদায়ের জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। এই প্রস্তাবে সর্বপ্রথম 'হিন্দু অস্পৃশ্যদের' জন্য 'পৃথক নির্বাচনীব্যবস্থা'র বন্দোবস্ত করা হয়।

৮ আজও প্রায় একইভাবে দেবী দুর্গার প্রতিরূপ 'দেশ জননীর' মাতৃহারা পুত্রকে জনসাধারণ ভোট দেন এবং ব্যালট পেপারে থাকে সিঁদুরের চিহ্ন। আনন্দবাজার পত্রিকা ২.১.১৯৮৫

৯ মহাত্মাজীর ভাবমূর্তি অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনমনে যেভাবে আবির্ভূত হয়, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এ "বৌরিয়া পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে, গানহী বাওয়া, কুমড়োর উপর নিশ্চিত কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মুরত আঁকা হয়ে গিয়েছে.. থানে কুমড়োটার পুজো হয়, পান সুপুরি গুড় দিয়ে।"

শুধুমাত্র নিম্নতর হিন্দসমাজেই নন, বর্ণহিন্দু শিক্ষিত মহলেও গান্ধীজী ছিলেন 'অবতার'

বিশেষ। আমরা সরোজিনী দেবীর— ও চরণ বন্দি/প্রণমি হে গান্ধী।/মহাত্মার উদ্দেশে করি নমস্কার।/ভারতের পতন,/উত্থান কারণ,/গান্ধীরূপে হ'লে দেব অবতার।"

ড. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ১৯২০ সালের ১৩ই এপ্রিল বোম্বাইতে শহিদ স্মরণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। জিন্নার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ এক বার্তা প্রেরণ করেন, তাতে তিনি বলেন— জালিয়ানওয়ালাবাগে যে অশুভ শক্তির ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে তা আসলে এক দানবীয় যুদ্ধের দানবিক সন্তান....।

বলা বাহুল্য, জিন্না প্রথম জীবনে ছিলেন অ-সাম্প্রদায়িক। 'মডারেটদের' আদলে গ'ড়ে ওঠে তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এজন্যই গোখেল তাঁকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের 'রাজদূত' [ambassador] রূপে বর্ণনা করেন।

ঢ. এসময় কংগ্রেসের অগ্রগণ্য নেতাদের রাজনৈতিক অপদার্থতা অর্থাৎ সামন্ত ও পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কূট রাজনীতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "দুঃখের বিষয় [এই] যে, ১৯৪৫-'৪৬ সালে দেশজুড়ে যে বিপুল বিক্ষোভকে সংগঠিত করলে দেশবিভাগের মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা ক্রয়ের পরিবর্তে জনশক্তি-বলে জয় করা অসম্ভব ছিল না— তখনও শুধু গান্ধীজী কেন, জহরলালের মতো নেতার বিচারে 'সেদিন' হাজির হোলো না!" [হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; "বামপন্থা ও ভারতের ভবিষ্যৎ, আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৫.৮.১৯৮৭]।

এর অল্প কিছুদিন আগে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়, ১৯৪২-এর ১০ই মে 'হরিজন'-এ গান্ধীজী লেখেন, 'ভারত সম্বন্ধে ইংরাজের কর্তব্য'— 'ইংরাজের প্রতি আমার অনুমাত্র ঘৃণার ভাব নাই.... আমি যে জাতীয় ঔষধের ('ভারত ত্যাগ করো') ব্যবস্থা দিয়াছি, তাহা জনসাধারণের ঘৃণার ভাবকে প্রশমিত করিবে। ....নির্দোষভাবে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের অবসান ঘটিবে.... কোনোরূপ শাসক রূপে নহে, স্বাধীন ভারতের সম্মতিক্রমে বন্ধুরূপে ভারতে ব্রিটিশদের উপস্থিতি আমরা বরদাস্ত করিবো।" [শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ, ভারত ছাড়ো (প্রথম খণ্ড); কোলকাতা ১৩৫৩; পৃ. ৩১-৩২]।

তথ্যসূত্র

১। A R Desai Recent Trends in Indian Nationalism Bombay 1973 p 131-132
২। Ibid. p 131.
৩। Charlse H Heimsath Indian Nationalism and Hindu Social Reform Princeton 1964 p 141
৪। Wilfred Cantwell Smith Quoted in Mohammad Ghouse. Secularism. Society and Law in India Delhi 1973 p 62
৫। Maulana Abul Kalam Azad India Wins Freedom Calcutta 1959 p 190
৬। Leonard Mosley The Last Days of the British Raj Bombay 1971. p 284
৭। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুস্তক পরিচয়, আনন্দবাজার পত্রিকা ১২.২.১৯৮৯

[অনীক, বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৫]

শ্মশ্রু— শিখা ও নারী

কিছুদিন আগেকার কথা। সারা বিশ্ব তখন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা নিয়ে ব্যস্ত। এসময়েই আমাদের সৌরজগতের গ্রহ বৃহস্পতির বুকে আছড়ে পড়ে 'শুমেকার লেভী' নামের এক ধূমকেতু। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পূর্বেই বলেছিলেন এই মহাজাগতিক ঘটনায় পৃথিবীর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। তাই বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধিৎসু কিছু মানুষ ছাড়া অধিকাংশ মানুষই বোধহয় এই ঘটনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেননি। ব্যাপারটি এমত সরল হ'লেই পৃথিবীর পক্ষে শুভ হোতো, কিন্তু বাংলাদেশ বেতারের সৌজন্যে জানা গেল ঢাকার ধর্মভক্ত আলেমরা 'শুমেকার লেভী'র ঘটনায় বিস্তব মাথা ঘামিয়েছেন; তাঁবা ঘোষণা করেছেন— "বৃহস্পতির সঙ্গে 'শুমেকার লেভী'র সংঘর্ষ এবং তদ্বজনিত বিস্ফোরণ হোলো সর্বশক্তিমান আল্লার সতর্কবাণী।" এ বার্তা বিশেষভাবে প্রচার করেছে ঢাকা রেডিও। এই বার্তায় যা অনুক্ত ছিল, তা হোলো মানুষ যদি বেশি বেশি ক'বে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের চর্চা ক'বে অবিশ্বাসী নাস্তিক হয়ে ওঠে, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লা বিশ্ব ধ্বংস ক'রে দেবেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। সুতবাং শ্মশ্রুধাবী মোল্লারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট; দাপটে চলছে তাঁদের রাজত্ব। ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক কুকর্মই এঁরা ক'রে থাকেন। এমন-কি কোনো নারী চরম অপমানিত লাঞ্ছিত হ'লেও তাঁরা নারীটিকেই শাস্তি দেন ধর্মপালনেব অজুহাতে। রাজনৈতিক নেতারা থাকেন নির্বিকার।

কিছুদিন আগে এক নারী এই ধর্মান্ধ মোল্লাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান। এর প্রতিক্রিয়ায় মোল্লা-মৌলবীর দল এই নারীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কারণ এই মহিলা ইসলামের অসম্মান করেন; ধর্মপালন বা প্রচার করেন না; ধর্মের নিগড় ভেঙে স্বাধীনতা চান ইত্যাদি। কেউ কেউ অভিযোগ করেন তসলিমা নাসরিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর। এর বিরুদ্ধ মতের সঙ্গেও আমরা পরিচিত। এই বিতর্কে অংশ না নিয়েও বলা যায় তসলিমা যখন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং নাস্তিকাবাদের পক্ষে কথা বলেন তখন তাঁকে সমর্থন করা যায় কিন্তু তসলিমা বা অন্যান্য 'নারীবাদীদের' শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি-বর্জিত 'নারীবাদ' আমরা সমর্থন কবি না।

শ্মশ্রুধারী মোল্লার দল আর তাঁদের 'নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী দমন কমিটি' একটি সরল সত্য বুঝতে চান না, তা হোলো ধর্মদ্রোহী নাস্তিক না হ'লে মানুষেব মুক্তি আসতে পারে না, নারীর মুক্তি তো দূরস্থান। কোনো ধর্মই নারীর স্বাধীনতা, নারীর মুক্তির প্রশ্ন অনুমোদন করে না। ধর্মান্ধরা কোনো দেশে মোল্লা, কোনো দেশে গুরু, পাণ্ডা; শিখা ও উপবীতধারী রক্তচক্ষু সমাজকর্তা। কোথাও এঁরা রূপ কানোয়ারকে দাহ করেন, কোথাও তসলিমাকে হত্যা করতে চান। কোথাও দেবদাসী সম্ভোগ করেন, কোথাও একাধিকবাব নিকে করার পর সামান্য অজুহাতে অসহায় নারীকে তালাক দেন। এসবই চলে ধর্মের নামে। তাই প্রগতিপন্থী মননের উপলব্ধি হোলো শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি আসতে পারে অতিপ্রাচীন ঈশ্বর-চিন্তাকে সমূলে উৎপাটিত

করার পর; আর তখনই যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রবাক্য বর্জন ক'রে, পরিত্যাগ ক'রে নারীর স্বাধীনতা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে।

কোনো এক সুদূর অতীতে পুরুষ-সমাজকর্তা ঈশ্বরের গল্প শুনিয়েছেন, শাস্ত্র আর ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছেন, আর নারীকে পাঠিয়েছেন অন্দরমহলে— রিপু চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসেবে। ধর্মাশ্রয়ী সমাজে নারী কোনো সম্মান কোনো স্বাধীনতা কোনো মূল্যই পাননি। বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত কি-না, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না.... এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নতমস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য করা উচিৎ নহে।" বেগম রোকেয়ার অনুসরণে আমরাও বলতে পারি, ধর্মের ইতিহাস হোলো নারীকে দমন করার ইতিহাস, নারীকে পণ্য করার ইতিহাস।

কার্ল মার্ক্স বলেছেন— একটা সমাজকে বোঝা যায় সেই সমাজে নারী জাতির অবস্থান ও মর্যাদা দিয়ে। এর বিপরীতটিও বোধহয় সমানভাবে সত্য। আমাদের এই হতভাগ্য ভারতভূমিতে শাসক-শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা দলমত-নির্বিশেষে সাম্রাজ্যবাদের পদতলে আত্মনিবেদনে উন্মুখ। এঁরা প্রচার করেন ধর্মান্ধতা আর ভোগবাদের এক অভূতপূর্ব জগাখিচুড়ি। শাসকগোষ্ঠী এখন— শঙ্করাচার্য-শাহীইমাম-চন্দ্রস্বামী-হজভবন-শেয়ারমার্কেট-বোরখা-আন্টিনিকেতন-ফিল্মীমহাকাব্য-ক্যাবারে-রামচরিতমানস-বিশ্বসুন্দরী-বিশ্বকাপক্রিকেট-টিএনশেষন ইত্যাদির সংমিশ্রণে এক কিম্ভূত সংস্কৃতি— দেশবাসীর উদ্দেশে বিলিয়ে দিচ্ছেন পরম পুলকে।

বহু বিজ্ঞাপিত 'নব্য ভারতে' হিন্দু-জনগোষ্ঠী অন-আর্য ধর্মের প্রভাবে বহুলাংশে মাতৃপূজক। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে ও দর্শনে নারীর স্থান নারীর মর্যাদা কোথায়? মৃন্ময়ীর পূজারী বাস্তবে চিন্ময়ীকে কোনো সম্মানই দেন না। প্রকাশ্যে চলে নারীর অবদমন। এর অন্যতম কারণ হিন্দুর ধমনীতে 'বিশুদ্ধ আর্যরক্ত' প্রবাহিত। উনিশ শতকের হিন্দু-জাতীয়তার পরিপুষ্টি আজও অব্যাহত। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তথা 'আর্য ঐতিহ্যের ধ্বজা' আজও বহন ক'রে চলেছে হিন্দু সম্প্রদায়। এই বেদ-বেদান্ত-রামায়ণ-মহাভারতের দেশে মনুবাক্য আজও অনুসৃত হয়— "স্ত্রী জাতি সর্ব অবস্থাতেই পুরুষের অধীন। বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন।"

বৈদিক যুগের প্রথম সাহিত্য হোলো ঋকবেদ। ঋকবেদের যুগে নারীর তবু কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা ছিল। এ যুগে পুরুষ বহুবিবাহ করতে পারতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরও বহুপতিত্বে অধিকার ছিল, যদিও স্বল্পকালের মধ্যেই নারী এই অধিকার হারায়। সহমরণ বা সতীদাহ তখনও শুরু হয়নি। সহমরণের কথা শোনা যায় অথর্ববেদে। বৈদিক যুগেই নারীর শিক্ষালাভের পথ রুদ্ধ করা হয়; শুরু হয় নারীর অবনমন। যজুর্বেদের যুগে শাস্ত্রজ্ঞানী বিধান দেন "যজমান দীক্ষার দিনে গণিকা সাহচর্য বর্জন করবেন, তাঁর পরদিন পরস্ত্রীর এবং তৃতীয় দিনে নিজ স্ত্রীর।" যজ্ঞে যজমানের স্ত্রী পাশে থাকতেন কিন্তু তাঁর হোম করার কোনো অধিকার ছিল না কারণ নারী দ্বিজ নয়— তার উপবীত নেই! সে যুগে গৃহকর্ম ছাড়া কুলনারীর আর কোনো বৃত্তি ছিল না। বিবাহে কন্যাকে পতির কুলে সম্প্রদান করা হোতো। সম্ভবত এসময়েই বিবাহিত নারীর 'ভার্যা' আখ্যা জোটে— নারী অন্যের দ্বারা ভরনীয়া অর্থাৎ পরঅন্নে প্রতিপালিত! আদর্শ নারী "স্বামীকে সন্তুষ্ট করে; পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর কথার উপরে কথা বলে না।"

পরবর্তীকালে মহান আর্যঋষি বিধান দেন, "যজ্ঞকালে কুকুর শূদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না!" ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয় "কন্যা অভিশাপ।" এই হোলো বৈদিক যুগে আর্যঋষি-কথিত শাস্ত্রবাক্য!

মহাকাব্যের যুগে নারীর সম্মান সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়, নারী পরিণত হয় পণ্য বা সামগ্রীতে। নারী অপবিত্র, অশুচি, যার কোনো মর্যাদাই নেই। মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র মহামতি ভীষ্ম স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে বলেন— "নারীদের এই দোষ, তারা সদ্বংশীয়া রূপবতী সধবা হ'লেও সদাচার লঙ্ঘন করে। ধনবান, রূপবান এবং বশীভূত পতির জন্যও তারা অপেক্ষা করতে পারে না। যে পুরুষ কাছে গিয়ে কিঞ্চিৎ চাটুবাক্য বলে তাকেই কামনা করে। উপযাচক পুরুষের অভাবে এবং পরিজনের ভয়েই নারীরা পতির বশে থাকে। তাদের অগম্য কেউ নেই। পুরুষের বয়স বা রূপ তারা বিচার করে না। রূপযৌবনবতী সুবেশা স্বৈরিণীকে দেখলে কুলস্ত্রীরও সেইরূপ হ'তে ইচ্ছা করে.... যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধার বিষ সর্প ও অগ্নি— এ সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান।

পিতামহ ভীষ্ম না হয় বিবাহ করেননি; কিন্তু অবতার রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র বিবাহিত ছিলেন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যুদ্ধবিগ্রহ ক'রে তিনি তাঁর স্ত্রী সীতাকে রাবণের কবল থেকে উদ্ধার করেন। সীতাউদ্ধারের পর রামচন্দ্র সীতার উদ্দেশে বলেন— "তুমি জেনো, এই রণ পরিশ্রম সুহৃদ্গণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি— এ তোমার জন্য করা হয়নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন, এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করার জন্যই আমি এ কাজ করেছি। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে। নেত্ররোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষেও তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছো, সে তোমাকে দুষ্টচক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোমায় পুনঃগ্রহণ করি তবে কী ক'রে নিজের বিখ্যাত বংশের পরিচয় দেবো?... আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ লোক পরহস্তগত নারীকে ক্ষণকালের জন্যও নিতে পারে না। তুমি সচ্চরিত্রা বা অসচ্চরিত্রা যা-ই হও, কুক্কুরভুক্ত হবির ন্যায় আমি তোমাকে ভোগের জন্য নিতে পারি না।" কুলবধূ সীতার প্রতি বিষ্ণুর অবতারের এই ব্যবহার অত্যন্ত অভদ্রতা ও নারীত্বের প্রতি চরম অবমাননাকর। অথচ আজও হিন্দুরা মনে করেন রামচন্দ্র 'পুরুষোত্তম'! এই পুরুষোত্তম রামচন্দ্রই বলেছিলেন, "ভরত কর্তৃক প্রার্থিত হইলে আমি নিজেই— রাজ্য স্ত্রী প্রিয়জীবন এবং ধন— সকলই ভরতকে প্রদান করিতে পারি।" যেন রাজ্য বা ধনরত্নের মতো সীতাও এক হস্তান্তরযোগ্য বস্তু!

সত্যবাদী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সে যুগের সজ্জন ব্যক্তিদের মতোই মনে করতেন, নারী হোলো এক দ্রব্য বা বস্তুপিণ্ড যা খেয়ালখুশিমতো হস্তান্তর করা যায়— "ধর্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগণকে পৃথক পৃথক গো-সমূহ, শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ ও দিব্যভরণ ভূষিতা রূপযৌবনবতী সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন।" শুধু সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী প্রদানই নয়, ধর্মরাজ দ্যুতক্রীড়ার ঝোঁকে দ্রৌপদীকে বাজী রেখেছিলেন, যিনি ছিলেন পঞ্চপাণ্ডবের সম্পত্তিঃ "রাজার ভাগ্যের পাশা খুশিমতো মুষিক নাচায়/ধর্মের জুয়াড়ি পুত্র বাঁধা রাখে প্রিয়ার যৌবন/কৃষ্ণার কবরী কাঁপে লম্পটের রক্তের তৃষ্ণায়/মধ্যরাতে কাক ডাকে শোনে না বধির দুর্যোধন!"

শাশ্বত ভারত কবির কল্পনায় স্থান পায় অনায়াসে। মহাবীর অর্জুন যেখানে যেতেন,

সেখানেই গান্ধর্ব বিবাহ অর্থাৎ নারী সম্ভোগ করতেন। মণিপুরী চিত্রাঙ্গদা, নাগরাজকন্যা উলুপী, গোপবালিকা সুভদ্রা প্রমুখ আদিবাসী রমণী ছিলেন তাঁর লালসার বলি। ভীম ছিলেন ষণ্ডাগুণ্ডা, তাঁর উপপত্নী হিড়িম্বা অন-আর্য অর্থাৎ ঊনমানব, অনুন্নত কোনো জনগোষ্ঠীর কন্যা।

আর্য-ভারতে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের সহযোগিতায় নারী নির্যাতন চলতো অবাধে। এ নিয়ে কাব্যগাথাও কম হয়নি। রাজা দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার 'প্রেম' চিত্রিত হয়েছে মহাকবি কালিদাসের আলেখ্যে। এই প্রেম কৌলিন্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণের 'প্রেম'-এর মতোই নির্লজ্জ অভদ্র এক সামাজিক অপরাধের কাব্যিক প্রতিরূপ। প্রেমিকের ক্ষণিক মোহের মূল্য দিতে হয়েছিল শকুন্তলাকে— এ যুগের সহায়হীন নারীর মতোই;— আমরা সরোজ দত্তের 'শকুন্তলা' কবিতাটি স্মরণ করতে পারি।

দুর্বাসার অভিশাপ, অভিজ্ঞান অঙ্গুরী কাহিনী
স্বর্গ মিলনের দৃশ্য, মিথ্যা কথা হীন প্রবঞ্চনা
রাজার লালসা যূপে অসংখ্যের এক নারীমেধ—
দৈবের চক্রান্ত বলি রাজকবি করেছে রটনা।
গৃহস্বামী দেশান্তরে, অরক্ষিত দরিদ্রের ঘরে
নারী-মাংস লোভে রাজা মৃগ-মাংস এলো পরিহরি
অরুচি হয়েছে যার অবিশ্রাম নাগরী বিহারে
তাহার কথার ফাঁদে ধরা দিলো অরণ্য কিশোরী।

স্তব্ধ আজি নাট্যশালা. নান্দীমুখ আতঙ্কে নির্বাক,
বিদীর্ণ কাব্যের মেঘ সত্যসূর্য উঠেছে অম্বরে—
দর্শক শিহরি করে নাটিকার মর্মকথা পাঠ;
'বালিকা গর্ভিনী হোলো লম্পটের কপট আদরে'—
রাজার প্রসাদভোজী রাজকবি রচে নাট্যকলা,
অন্ধকার রঙ্গভূমি, ভূলুণ্ঠিতা কাঁদে শকুন্তলা।''

সম্ভবত মহাভারতের কৃষ্ণ আর নন্দগোপের পালিত পুত্র ব্রজবিহারী রাখাল— দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি; লোকগাথায়, কবিকল্পনায়, ভক্তের ভক্তিতে দু'জন একাকার হয়ে গেছেন। ব্রজের কুঞ্জবিহারী দক্ষিণ ভারতের রাখালদের লোকপ্রিয় দেবতা, যাঁর পরিচয় তাঁর গাত্রবর্ণ; তিনি কাব্যে বা ভক্তিতে প্রেমিকপ্রবর, রমণী-মন হরণে পটু। এই মিথিক্যাল (mythical) পুরুষটির সঙ্গে তাঁর প্রেমিকা শ্রীরাধার প্রেমলীলা যুগে যুগে হিন্দুর কণ্ঠে কীর্তিত হয়েছে। বিদ্যাপতির মতো কবিরা শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমলীলার যে বিবরণ দিয়েছেন, তা এ যুগের অনেক সাহিত্যিককেই লজ্জা দেবে। কৃষ্ণের প্রেমে আর যা-ই থাক্, নারীর প্রতি সম্মান বা শ্রদ্ধা বোধ ছিল না। অশোক রুদ্র লিখেছেন, ''বৃন্দাবন লীলা, যার অধিকাংশের মধ্যেই কৃষ্ণের আচরণ অজাতশ্মশ্রু অনভিজ্ঞ বালকের যৌন স্বপ্নের মতোই পরিমিতিহীন এবং তার সঙ্গে তার মাতৃস্থানীয়া বয়স্কা নারীকুলের আচরণও একই স্তরের, যাকে জীবাত্মা পরমাত্মাপুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের রূপক হিসাবে প্রচার করতে যে মানসিকতা লাগে তা নিঃসন্দেহে ব্যাধিগ্রস্ত।'

হিন্দুধর্মশাস্ত্র বা এর রসমিশ্রিত পুরাণ কাব্যাদি যে পুরুষশাসিত এক ধর্মান্ধ সামজের প্রতিবিম্ব, তা সহজেই বোঝা যায়। প্রাচীন ভারতে বা মধ্যযুগের ভারতে রাজন্যবর্গ ও এদের অনুগ্রহপ্রার্থী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র 'সুমহান' 'আর্য সভ্যতা'র ধ্বজাধারীরা— শূদ্র ও নারীকে মনুষ্যেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে। নারীকে অবদমিত রাখার ব্যাপারে শাস্ত্র আর শস্ত্রের ছিল গভীর ঐক্য।

মধ্যযুগের ভারতে উচ্চবর্গীয় মানুষের জীবনে 'ধর্মান্ধতা অনুমোদিত' বিবিধ বিকার— নারীকে চরমতম অবদমনের শিকারে পরিণত করে। উচ্চবর্গীয় সমাজে সর্বত্রই ছিল বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন। নারীর প্রতি পুরুষশাসনের বীভৎস দৃষ্টান্ত বাংলাসাহিত্যে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই ব্যাভিচার সামান্যই হ্রাস পায়। বিবেকানন্দ লিখেছেন, "৮ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন্ দেশী ধর্ম?" কলুষপূর্ণ শাস্ত্র-আচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "সর্ব বিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন অতি পবিত্র, কারণ তাহাতে স্বাধীন বুদ্ধিকে অকর্মণ্য করিয়া রাখে।" এই শাস্ত্রানুসারী বিবাহ ছিল নারীকে যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার মাধ্যম মাত্র। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "স্ত্রী যদি পতিপ্রাণা না হয় তবে অশেষ সংসারিক অসুখের কারণ হয়.... স্বামীর স্ত্রীগতপ্রাণ হইবার এত আবশ্যক নাই.... আধ্যাত্মিক পবিত্রতা যতই থাক্, সন্তান না হইলেই হিন্দুবিবাহ ব্যর্থ।"

ইসলামে নারীর স্থান খুব উচ্চে নয়, সে যুগের সমাজে তা সম্ভবও ছিল না। তবে কিছু-কিছু প্রগতির সূচক ছিল এই নবীন ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের কথাই আমরা উদ্ধৃত করতে পারি, "এমন সময়ে মহম্মদের আবির্ভাব হইলো। মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহাব উদ্দেশ্য ছিল না। সে-সময়ে আরব-সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসী-সংসর্গ, ও যথেচ্ছ স্ত্রী-পরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্য পদবীতে আরোপন করিলেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন, স্ত্রী-বর্জন ঈশ্বরেব চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ-প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই জন্য তিনি স্ত্রী-বর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।....

কোনো কোনো বিষয়ে মুসলমানদের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ উচ্চতর ছিল এবং মহম্মদ যে-সকল সংস্কারকার্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি চূড়ান্ত স্থির করেন নাই.... তবু সমাজ সেইখানেই থামিয়া রহিলো। কিন্তু সে-দোষ মুসলমান ধর্মের নহে, সে কেবল জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতার অভাব....'

নারী সম্পর্কে ভারতীয় মুসলিম সমাজে প্রচলিত ইসলামিক ধর্মীয় বিধানাদির সঙ্গে হিন্দু-শাস্ত্রকারদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ তফাৎ পাওয়া যায় না। নারী সর্বঅবস্থাতেই পুরুষের অধীন ভোগ্যবস্তু। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়ার বিদ্রোহের বাণী স্মরণ কবা যেতে পারে, "যখনই কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে.....আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

নারী-সম্ভোগের ব্যাপারে রাজা-রাজড়া বা আমীর-বাদশা কেউই পিছিয়ে ছিলেন না। আজকের

বা অদূর অতীতের হিন্দুদের দৃষ্টিতে একমাত্র 'ভালো' মুসলমান শাসক হলেন সম্রাট আকবর, যিনি পবধর্মসহিষ্ণু ও ধর্মসমন্বয়ে আগ্রহী ছিলেন। ধর্মপ্রেমী হ'লেও সম্রাট আকবর নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন একথা বলা যায় না। তাঁর 'মালটিন্যাশনাল' হারেমে তিন শতেরও বেশি স্ত্রী ছিল। সম্রাটের প্রভাবে এর এক ধর্মীয় অনুমোদনও সংগ্রহ করা হয়। হায় নারী!

আমাদের দেশে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে আধুনিকতার সূচনা ১১৭৬ বঙ্গাব্দের কালান্তক মন্বন্তরের সমসাময়িক ব'লে গণ্য কবা যায়। ফিরিঙ্গী রাজত্বকে স্বাগত জানান রাজ রামমোহন। প্রচারিত ইতিহাস অনুসারে রাজা রামমোহন নারীমুক্তির পথনির্মাতা, তিনি সতীদাহ রদ করার পথ প্রস্তুত কবেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম আমলে, ইংরেজের প্ররোচনাতেই সতীদাহর ঘটনা বৃদ্ধি পায়। এজন্য ফিরিঙ্গী বণিক হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রেরই দোহাই পাড়ে। ১৮১৩ সালের পর থেকে ব্রিটেনের শিল্প-পুঁজিবাদেব 'পরিকল্পনা মাফিক' ভারত-শোষণের পালা শুরু হবার পর বেণ্টিঙ্ক সাহেব সতীদাহ প্রথা বদ করেন। এ ছিল ব্রিটিশ-পুঁজিবাদেব 'বিফর্মিস্ট্' চিন্তা। বামমোহন আইন ক'রে 'সতীদাহ' রদ করার পক্ষে ছিলেন না। অন্যদিকে 'সতীদাহ' রদ করাব পক্ষে শাস্ত্রসম্মত যুক্তি প্রথম প্রদর্শন করেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাব, রামমোহন নন। রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন, বামমোহন এ ব্যাপারে যে উদ্যোগ নেন তা প্রায় বিদ্যালঙ্কারের যুক্তির প্রতিধ্বনি।

উনিশ শতকে হিন্দুর গর্ব ছিল প্রাচীন 'আর্য ভারত'-এর গাথা'য। এ কাবণে সতীদাহব মতো হত্যাপরাধও হিন্দুর দৃষ্টিতে মহিমান্বিত রূপে প্রতিভাত হয। বিস্মিত হ'তে হয় যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "হে আর্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিযা দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জানো নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীবপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছো। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারেব কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহন করিতে, দাম্পত্যলীলার অবসান-দিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায লইয়া— তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গল-সিন্দুর পরিযা পতিব চিতায় আরোহন করিয়াছো। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছো, শুভ করিয়াছো, পবিত্র করিয়াছো; চিতাকে তুমি বিবাহশয্যাব ন্যায আনন্দময কল্যাণময কবিয়াছো।"[১]

সমসময়ে সহমরণ নামক নারীহত্যাকে মোহময় দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বিবেকানন্দও। তিনি লেখেন, "আধুনিক হিন্দুনারীর জীবনের প্রধান ভাব হচ্ছে তাঁর সতীত্ব। স্ত্রী হচ্ছে এক বৃত্তের কেন্দ্র, যার স্থিরতা নির্ভর কবে তার সতীত্বের উপর, হিন্দু-বিধবাদের সহমরণের কারণ হচ্ছে এই ভাবের চরম অবস্থা।" ১৮৯৪ সালে বিবেকানন্দ মার্কিন দেশ ভ্রমণকালে সতীদাহ সম্পর্কে তাঁর মতামত উপস্থিত করেন যা তাঁর স্বাজাত্য বোধেরও পরিচায়ক, সতীদের পুড়িয়ে মারা হয়, এ তথ্য বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "বরং অনেক ক্ষেত্রে সতীরা স্বেচ্ছায় তাঁদের মৃত স্বামীদের চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছেন.... তাঁরা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে হাত বাড়িয়েছেন এবং সে আগুন হাত দু'টিকে গ্রাস করলে তখন সতীদের ইচ্ছাপূরণে কোনো বাধাই দেওয়া হয় না। শুধু যে ভারতবর্ষের রমণীরাই তাঁদের মৃত স্বামীদের অনুগমন ক'রে অমর হয়েছেন তা-ই নয়, এ ধবনের আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্যদেশেও মিলবে.... ভরতবর্ষে বিধবাদের পুড়িয়ে মারা বা ডাইনি ব'লে কাউকে জ্যান্ত পোড়ানো হয় না।"[২]

বিবেকানন্দের এই ভাবাবেগ-প্রসূত উক্তি অসত্য— কিন্তু মধ্যযুগে বা বৈদিক যুগে তথা প্রাচীন ভারতে পুরুষ-শাসন বজায় রাখার জনাই 'বস্তুপিণ্ড' নারীকে হত্যা করাব প্রথা শাস্ত্রেব বিধান ব'লে প্রচার করা হয়। কারণ 'শাস্ত্রানুশাসন অতি পবিত্র'! 'পবিত্র হিন্দুবিবাহ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছামতো তাহাকে ত্যাগ করিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি। স্বামী ব্যাভিচারপরায়ণ হইলেও স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ.. যদি জানা যাইতো অন্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষের অধিকাংশ বাব-স্ত্রীআসক্ত নহে তবে হিন্দুবিবাহের পবিত্র প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহ মোচন হইতো।"

ভারতবর্ষ নামক এই ধর্মান্ধ মূঢ় দেশে প্রাচীন যুগ থেকেই নাবীকে বিবেচনা কবা হয়েছে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসেবে, পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে নয়। শ্রেণীবিভক্ত, শ্মশ্রু-শিখা শাসিত সমাজে এটাই স্বাভাবিক! 'অসুস্থ সমাজ' নারীকে সম্মান দিতে জানে না। শ্মশ্রুধাবী ও শিখাধাবী ধর্মবেত্তাদের নির্দেশে ধর্মের অচলায়তনে বন্দী নারী— পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিতান্ত এক ভোগ্যবস্তু। যুগে যুগে পুরুষ হোলো নারীব প্রভু। ধর্ম আব ধর্মবেত্তাবা পুরুষতন্ত্রেব রক্ষক। স্বার্থসর্বস্ব পুরুষ— অবদমিত নারীকে ভয় দেখায় ধর্মের, সর্বশক্তিমান আল্লার, 'পবম মঙ্গলময়' ভাগ্যবিধাতার। আবার আমরা রবীন্দ্রনাথেব শবণ নেবো, "সাধাবণেব... বিশ্বাস এই যে, হিন্দু স্ত্রী কোনোকালে হিন্দু স্বামীর দেবতা ছিলেন না।" "বিলাত দেশটা মাটিব, সেটা সোনা-রূপাব নয়"— সুতরাং বিলাতী ধর্মের বিধানেও নারীকে মিথ্যা অপবাদে চিত্রিত ক'রে প্রভু যিশুর ভক্তবা তাঁদের পৌরুষেব ধ্বজা উড্ডীন করেছেন নির্লজ্জের মতো, "স্ত্রীলোকদেব . সম্বন্ধে চার্চেব অধ্যক্ষগণ বিপরীত বিদ্বেষেব সহিত মতপ্রকাশ কবিয়াছেন . স্ত্রীলোককে শয়তানেব প্রবেশদ্বাব, নিষিদ্ধ বৃক্ষেব ফল চৌর, দিব্যধর্ম পবিত্যাগিনী... আখ্যা দিযাছেন।"

পৃথিবীব যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রেই নারীকে হীনভাবে অঙ্কিত কবা হয়েছে। আমরা বিশেষ জোব দিয়ে বলতে পাবি-- ধর্মের বিরুদ্ধে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না কবলে নবনারীব সমতা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পাবে না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধিকাংশ পুরুষ বিভিন্ন বন্ধনে বন্দী, কিন্তু নারী— পুরুষেব কাছেই বন্দী। প্রতিটি সমাজে যুগে যুগে, দেশে দেশে এ ব্যবস্থাই ধর্ম-অনুমোদিত, শাস্ত্র-অনুমোদিত ব'লে প্রচারিত ও বিবেচিত হয়ে এসেছে। শ্রমজীবী পুরুষও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁব ধর্মপত্নীটিব ওপব শাসন চালান। এদেশেব সমাজে নারীব চেয়ে আপ্তবাক্যেব মূল্য অনেক বেশি।

'শাশ্বত ভারতে', 'মহান রামবাজ্যের' আহ্বায়কদেব কল্যাণে 'সতীদাহ' অব্যাহত, নারীকে অন্তঃপুবে নির্বাসন দেবার আয়োজন চলছে সগৌরবে, সগর্জনে। বিবেকানন্দ বলেন, "আমেরিকানরা ডলারকে ঈশ্বরেব মতন সর্বশক্তিমান মনে করেন ." এই 'নতুন ঈশ্বর'-এব পূজারীরা কুৎসিত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অবাধ আমদানী করছেন 'বিশ্বায়ন'-এর ঋত্বিকদের পদতলে দাসখৎ লিখে দিয়ে।

নারী— পুরুষকে পূর্ণ করে, সুন্দব করে, আদর্শনিষ্ঠ কবে; নারী তাই 'অর্ধেক আকাশ'। কোনো ধর্মশাস্ত্রই কিন্তু নাবীকে এই সম্মান দেয় না, মহীভূষণেব "বুদ্ধিব কাঁচা ফলে ঠোকব দিয়েছিল বাশিয়ার লক্ষ্মী খেদানো বাদুড়টা", তাব আদর্শবোধেব জন্যই মহীভূষণ অমিয়াকে পেয়েছিল, অমিয়া পেয়েছিল মহীভূষণকে। অমিয়া তাই বলতে পেরেছিল "এসেছি তাঁবই

কাজে! উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।/ আমি শুধালেম, 'কোথায় আছেন তিনি।'/ অমিয়া বললে, 'জেলখানায়....'।" আমাদের এই ধর্মান্ধ, আচারনিষ্ঠ, দুঃখী দেশে নারী-পুরুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বর নয়, শাস্ত্র নয়— আরাধ্য হোক সেদিনের "রাশিয়ার লক্ষ্মী খেদানো বাদুড়টা"।

টীকা

১। আমরা একথা বলতে চাই না যে রবীন্দ্রনাথ 'সতীদাহ' বা 'সহমরণ' প্রথা সমর্থন করতেন। উদ্ধৃতি রচনার সময়কাল ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের তিন বছর পূর্বে। দেশজোড়া হিন্দু জাতীয়তার প্রবল আবেগে রবীন্দ্রনাথও তখন আপ্লুত। দেশমাতৃকার পদতলে নিবেদিতপ্রাণ হিন্দু বাঙালির চিত্তে ও হৃদয়ে বীরমন্ত্র সঞ্চারিত করার জন্য, ভীরু বাঙালিকে সাহস জোগানোর জন্য, আত্মবিসর্জনে উন্মুখ করার জন্য আরও অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন ভারতের 'ইতিহাসে' মহিমা আরোপ করেন অসীম গর্বে।

২। বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন যে, ইউরোপেও এক সময় 'ডাইনি' সন্দেহে নারীহত্যার প্রচলন ছিল। অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে উল্লেখ করা উচিৎ ফ্রান্সের বীরবালিকা জোয়ান অব আর্ক-কে (১৪১২-১৪৩১) ডাইনি অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

[অনীক, মে ১৯৯৬]

জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা ঃ মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা

কোথা থেকে আসে এই দ্বিজ ব্রাহ্মণ?
কোনো উদ্ভিদ না কি মেঘ থেকে উড়ে?
না কি সে যোগীর যজ্ঞ-আগুন থেকে?
জাত কি রক্তে-মজ্জায়, তার হাড়ে?
চণ্ডালিনীব অচ্ছুৎ দেহ, সেও
অনুর্বরা কি থাকে ব্রাহ্মণ-বীজে?
ব্রাহ্মণ তার উপবীত শিখা তিলক
জন্ম থেকেই বয়ে নিয়ে আসে নিজে?

কুমারণ আসান
অনুবাদ ঃ শঙ্খ ঘোষ

"যে মুহূর্তে অস্পৃশ্যদের প্রতি ব্যবহারের জন্য ভারত অনুতপ্ত হবে, সেই মুহূর্তে কঠিন হৃদয় ব'লে পরিচিত ইংরেজ রাজপুরুষরা পর্যন্ত 'বিদেশী বস্ত্র পরিহার আন্দোলনকে' একটি সাহসী জাতীয় প্রচেষ্টা ব'লে সহানুভূতি জানাবে। আমি জানি হিন্দুরা যদি ইচ্ছে করে তাহলে তারা তথাকথিত পঞ্চমদের নিজেদের সমান সুখসুবিধাও দিতে পারে.... এই পরিবর্তন.... ঈশ্বরের করুণা দ্বারাই একমাত্র লাভ করা যেতে পারে। কে অস্বীকার করবে যে, ঈশ্বর সত্যই আমাদের হৃদয়ে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আনছেন? যা-ই হোক প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীর এখন কর্তব্য— হিন্দু হয়েও যারা হিন্দু নয়, তাদের কাছে গিয়ে বারবার ক'রে বলা, যে— বেদ উপনিষদ্ ভগবদ্গীতায় উক্ত হিন্দুধর্মে.... কোনো মানুষকেই অস্পৃশ্য জ্ঞান করবার সমর্থন নেই, সে যতই পতিত হোক না কেন। প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীর উচিৎ যথাসম্ভব সুন্দরভাবে রক্ষণশীল হিন্দুদের বুঝিয়ে বলা, যে— এই নিষ্ঠুর ব্যবধান অহিংসার আদর্শের বিরোধী....।" —মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তিতেই অস্পৃশ্যতা বা জাতিভেদ সম্পর্কে তাঁর, তথা তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের চিন্তাভাবনা সম্যকভাবে পরিস্ফুট। ভারতবর্ষের ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক নির্দেশে রচিত, তাই আধুনিক ভারতের প্রচলিত ইতিহাসে অস্পৃশ্যতাবিরোধিতার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। স্বদেশী এবং কোনো কোনো বিদেশী সমাজবিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন ধারার রাজনীতিবিদরা অস্পৃশ্যতাবিরোধিতার প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নাম সশ্রদ্ধায় উচ্চারণ ক'রে থাকেন। আটের দশকের ভারতে মহাত্মাজীর সবরমতী আশ্রমের অনতিদূরে 'গান্ধীর হরিজন যুবককে' পুড়িয়ে মারার ঘটনা [১] প্রমাণ করে— অস্পৃশ্যতাবিরোধিতার ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর নীতি ছিল অনেকাংশেই ভ্রান্ত। ১৯৮২ সালের স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে ৫৫৭ জন 'হরিজন' মহিলার চরম অসম্মান ঘটলেও [২] বেদ-বেদান্তের চিরন্তন ভারতে ধর্মপ্রাণ রাজনৈতিক নেতাদের তীর্থস্থান পর্যটন অব্যাহত থাকে, প্রত্যেক পাঁচবছর

পর পর গান্ধীজীর উত্তরসূরীরা এবং গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মন্ত্রীপন্থী কমিউনিস্টরা হরিজন-বস্তিতে যান, গণতন্ত্রের ঢক্কানিনাদ অনেক ধর্মপ্রাণ মন্ত্রীর জন্ম দেয়, আর শাশ্বত ভারতের বিহার গুজরাট বা তামিলনাড়ুর হরিজন-বস্তির প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে কোনো পিতৃপরিচয়হীন 'হরিজন' শিশু হয়তো চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির মতো তার মাকে প্রশ্ন করে 'জন্ম কেন দিলি মোরে?'

জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভূমিকা আলোচনা করার আগে জাতিপ্রথার (কাস্ট সিস্টেম) উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, আর হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থাদিতে এর সমর্থনের ইতিহাস সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা উচিৎ। কারণ মহাত্মা গান্ধী সনাতন বর্ণপ্রথার সমর্থন খুঁজেছিলেন প্রাচীন ভারতে, হিন্দু আদর্শে। জাতিপ্রথার উৎপত্তি আর এর ইতিহাস আলোচনা স্বতন্ত্র গবেষণার কাজ। আমরা এখানে সংক্ষেপে এর বিবরণ দেবার চেষ্টা করবো।

জাতিপ্রথা ঃ ধর্মগ্রন্থ

ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় জাতিপ্রথা বা 'কাস্ট সিস্টেম' এক উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। 'কাস্ট' কথাটি ল্যাটিন শব্দ 'Castus' থেকে উদ্ভূত। 'Castus' কথাটির অর্থ 'বিশুদ্ধ'। পোর্তুগীজরা ভারতের অসংখ্য জাতিকে 'কাস্ট' হিসেবে চিহ্নিত করে। প্রাচীন ভারতের বর্ণবিভাগ হোলো এক ধরনের শ্রেণীবিভাগ। কালক্রমে বর্ণবিভাগের কাঠামোর মধ্যে অসংখ্য জাতি ধীরে ধীরে উদ্ভূত হয়। বর্তমান ভারতে প্রায় তিন হাজার জাতির দেখা পাওয়া যায়। বর্তমানের জাতিপ্রথা আজও আবর্তিত হয় প্রাচীন সনাতন বর্ণপ্রথার মধ্যে যা এখন শুধুই একটা ধারণা। রক্তের বিশুদ্ধতা আজ আর কোনো উচ্চ জাতিরই নেই।

বর্ণবিভাগ বা জাতিপ্রথার ক্রমবিকাশ আর সমাজকর্তার দ্বারা এর পরিচালনার ইতিহাসে 'ইডিয়লজি' বা 'ধর্ম' যুগে যুগে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে এসেছে। অনেকে বর্ণবিভাগ বা জাতিপ্রথাকে ফাংশনাল ব'লে মনে করেন, তাঁদের মতে এক সংহতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হোলো জাতিপ্রথা এবং এই কাঠামোতে 'সোস্যাল মোবিলিটি'র[১] (অর্থাৎ নিম্নবর্ণ থেকে উচ্চবর্ণে আরোহণ বা এর বিপরীত গমন) অভাব ছিল না। কিন্তু আমাদের ধারণা বর্ণবিভাগ বা জাতিপ্রথা অতি অবশ্যই এক ধরনের শ্রেণীবিভাগ, একে অস্বীকার করলে সমাজকর্তারা 'Coercion' বা দমনপীড়নের বিধানই দিয়েছেন। তার সঙ্গে দিয়েছেন তাত্ত্বিক অর্থাৎ ধর্মগত নির্দেশ। ধর্ম বা ইডিয়লজির এত ব্যাপক আর গভীর ভূমিকা বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যাবে না। সহস্র ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা; আর সহস্রাধিক বিধিনিষেধ, আপ্তবাক্য, আচার-সংস্কার সমন্বিত প্রচলিত হিন্দুধর্মের[২] অচলায়তন তার বিপুল সংখ্যক শাখাপ্রশাখা নিয়ে প্রাচীন যুগ থেকেই ভাবতীয় সমাজের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেছে, ব্যাহত করেছে। ধর্মের এই ব্যাপক আর গভীর প্রভাবের জন্য ভারতের হিন্দুসমাজ ছিল 'থিওক্র্যাটিক সোসাইটি' বা ধর্মাশ্রয়ী সমাজ। শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ শাস্ত্র রচনা করতেন আর শাসক-ক্ষত্রিয় সেই শাস্ত্রানুসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ভারতীয় সমাজে নিঃস্ব নিরন্ন শ্রমজীবী মানুষকে নির্বিবাদে নির্বিচারে শোষণ কবাব সবচেযে বড় হাতিয়ার ছিল ধর্ম; ইহকালে

ভাগ্যদেবতার নির্বন্ধের দোহাই আর পবকালে ন্যায়বিচার বা স্বর্গলাভের প্রতিশ্রুতি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের এই ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল ছিল বর্ণবিভাগ বা জাতিপ্রথার গণ্ডীব বাঁধা ছকে, একে আমরা নিয়ন্ত্রিত অসাম্য বলতে পারি।

ভারতবর্ষে আর্যপূর্ব সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা বা মহেঞ্জোদাড়ো ও হবপ্পার সভ্যতার আনুমানিক কাল হোলো ৩০০০-১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে আর্যদের আগমন ঘটে ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে, তখন সিন্ধু সভ্যতা লুপ্তপ্রায়। আর্য কথাটির মূল অর্থ Kinsmen (জ্ঞাতি গোষ্ঠী), কিন্তু কালক্রমে এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় ভদ্র। শব্দের এই অর্থান্তর ঘটে ভারতেব আদি অধিবাসী অর্থাৎ অনার্যদের সঙ্গে বহিরাগত আর্যদের তফাৎ বোঝাতে। আর্যরা ছিল মূলত গো-পালক জাতি। পশুচারণ-ভূমির প্রয়োজনে প্রথমদিকে এরা পাঞ্জাবের সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। বহিরাগত আর্যদেব সঙ্গে অনার্যদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। আর্যরা তাদের এই শত্রুদের অত্যন্ত হীন চোখে দেখতো এবং এদের দস্যু, দাস, বা পনি ব'লে অভিহিত কবতো। আর্য-অনার্য সংঘাতে আর্যরাই জয়লাভ কবেছিল। তাই পববর্তীকালে দাস শব্দের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় গোলাম। দাসদের গায়ের বঙ (বর্ণ) কালো আর তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইত্যাদি ভিন্ন হবার জন্য আর্য-অনার্যের বিভেদটা প্রথমত ছিল বর্ণগত। বলা বাহুল্য, গায়ের কালো বঙ আর নাক-মুখের ভোঁতা ভাবের জন্য (অনাসা) আর্যরা অনার্যদের নিচু শ্রেণী ব'লে গণ্য করতো।

অনার্য সভ্যতা পশুপালক-আর্যদের সভ্যতার থেকে উন্নত ছিল। তাই আর্যদের ভারত অধিকার ছিল পশ্চাদাভিমুখী ঘটনা। কালক্রমে সিন্ধু সভ্যতার মানব গোষ্ঠীর মতো আর্যদেব অর্থনীতিও কৃষিভিত্তিক হয়ে ওঠে। এই সময়েই প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য ঋকবেদের শ্লোকগুলি রচিত হয় (১৫০০-১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ)। চার বেদের অন্য তিন বেদ, অর্থাৎ সামবেদ, যজুর্বেদ, ও অথর্ববেদেব রচনাকাল আবও পরে। যাযাবর পশুপালক আর্যরা কৃষি-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নীত হবার পর স্বাভাবিকভাবেই সমাজে শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হয়; সমাজে শ্রমবিভাগ আর অনার্যদের ওপরে আর্যদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ঋকবেদে চারবর্ণের বিবরণ দেওয়া হয়। প্রথম বেদের শেষের দিককার স্তোত্র 'পুরুষ সূক্তেই' সর্বপ্রথম বর্ণবিভাগ ঐশ্বরিক বিধান রূপে বর্ণিত হয়— "যখন দেবতারা বলিদানের জন্য উৎসর্গ হিসেবে মানুষকে বেছে নিলেন.... যখন তাঁরা মানুষকে বিভক্ত করলেন। কত খণ্ড হয়েছিল মানুষের শরীর? কী নাম দেওয়া হোলো তার মুখকে, তার বাহুকে, তাব জঙ্ঘা ও পদযুগলকে? ব্রাহ্মণ হোলো তার মুখ, বাহু দিয়ে এলো যোদ্ধা। বৈশ্য হোলো তার জঙ্ঘা, পদযুগল থেকে এলো শূদ্র। উৎসর্গের দ্বারা দেবতারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করলেন, এভাবেই প্রথম ধর্মের সূচনা হোলো। এরপর দেবতারা দ্যুলোকে গমন করলেন, এখানেই শাশ্বত আত্মা বিরাজ কবেন।" এইভাবে বর্ণবিভাগেব এক ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা প্রচার করা হোলো শ্রমজীবী শূদ্রকে শোষণ করাব জন্য। এ কাজ করলো ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা; কারণ তারাই বাজা বা শাসকের ওপর দেবত্ব আবোপ করতে পারতো। বর্ণবিভাগ টিকিয়ে রাখতে তাই ব্রাহ্মণ আর রাজন্যেব পাবস্পবিক সহযোগিতা ছিল একান্তই অপরিহার্য। বর্ণবিভাগের ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা প্রচারের পর বংশানুক্রমিকতা আবও দৃঢ় হয়ে উঠলো এবং কয়েক শতাব্দী পর শূদ্ররা উচ্চবর্ণের কাছে প্রায় স্পর্শেব অযোগ্য হয়ে উঠলো।

শূদ্ররা ছিল দাস ও আর্য-দাস মিশ্র সম্প্রদায়। এদেব সামাজিক স্থান ছিল ক্রীতদাসেব

সমতুল্য। বৈদিক সাহিত্যে শূদ্রকে 'অপরের ভৃত্য', 'ইচ্ছা করলেই হত্যা করা যায়' ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হয়। শূদ্র ধনী হ'লেও তার প্রধান কাজ উচ্চবর্ণের পদধৌত করা— এ হোলো বেদের বিধান। বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞগৃহে প্রবেশাধিকার থেকেও শূদ্রকে বঞ্চিত করা হয়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' শূদ্র বর্ণিত হয়েছে মূর্তিমান অসত্য রূপে। ঋষি বশিষ্ঠ এক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন যাতে বিধান দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণবর্ণ রমণী শুধুমাত্রই ভোগের জন্য। বৈদিক যুগে পুরোহিতকে দাসদান করা হোতো, তবে তারা নারী! সামাজিক বিচারে আর্যরা ছিল দ্বিজ, উপনয়নের সময় এদের দ্বিতীয় জন্ম হোতো— আর শূদ্ররা ছিল এক জাতি। শূদ্রদের দীক্ষাগ্রহণের অধিকারও ছিল না। সামগ্রিক বিচারে বৈদিক যুগে শূদ্র কখনোই আর্যদের মতো স্বাধীনতা বা সামাজিক সুবিধার অধিকারী ছিল না।

বৈদিক যুগেই পঞ্চম বর্ণ (অবর্ণ) বা 'out-caste'-এর উৎপত্তি হয়। এরা ছিল নিষাদ, চণ্ডাল, পৌলকেশ ইত্যাদি। এরা ছিল 'বর্বর' বা বন্য মানুষ, এদের জীবিকা ছিল শিকার বা মাছ ধরা এবং এদের সংস্কৃতি ছিল অনুন্নত, এরা ছিল সমাজ বহির্ভূত। যজুর্বেদে এদের হীন [মানুষ] বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে চণ্ডালদের বলা হয়েছে শূদ্রপিতা আর ব্রাহ্মণমাতার সন্তান।[৩] আমাদের ধারণা আর্য-অনার্য বর্ণসঙ্করের ফলে যে ব্যাপক শ্রমজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয় তারাই পরবর্তীকালের শূদ্র এবং নিষাদ; আর আর্য-প্রভাবের বহির্ভূত 'অসংশোধনীয়', 'অবাধ্য' মানুষরাই হোলো চণ্ডাল এবং পৌলকেশ।

মহাভারত আর রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলীর সময়কাল হোলো ১০০০-৭০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। রোমিলা থাপারের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কাল ৯০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ, হয়তো মহাভারত একটি স্থানীয় সঙ্ঘর্ষের বিবরণ, আর রামায়ণের রচনাকাল ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের পঞ্চাশ বা একশো বছর পরে। রাম ও রাবণের যুদ্ধকে গাঙ্গেয় উপত্যকার কৃষিজীবী ও বিন্ধ্য অঞ্চলের আদিবাসী শিকারী মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ব'লেও ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, তাহলে এই মহাকাব্যের রচনাকাল আরও প্রাচীন ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। শ্রীলঙ্কা বিজয়ের ঘটনা সম্ভবত কাল্পনিক, কারণ অত দক্ষিণে রামচন্দ্র যাননি।

ঐতিহাসিকরা যা-ই বলুন না কেন আজও ভারতের কোটি কোটি ধর্মভীরু মানুষের কাছে এই দু'টি মহাকাব্যের আবেদন অপরিসীম। মহাত্মা গান্ধীর ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির ফলে 'রামরাজ্য' আজও এক অবতারের রাজ্য— সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধির আদর্শ রাজ্য।

মহাকাব্যের যুগে চতুর্থ আর পঞ্চম বর্ণের মানুষের সামাজিক অবস্থার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় আজও অস্পৃশ্যদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমরা মহাভারতের 'শান্তিপর্ব' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ "....মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া.... এক অরণ্যমধ্যে প্রাণীঘাতক হিংস্র চণ্ডালদিগের পল্লী অবলোকনপূর্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, ভগ্ন কলস, কুক্কুরের চর্মখণ্ড, বরাহ ও উষ্ট্রের অস্থি ও কপাল এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্রে উহার চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে.... কোনো স্থান কুক্কুটরব ও কোনো স্থান গর্দভের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোনো স্থানে চণ্ডালেরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে।.... এরপর বিশ্বামিত্র এক চণ্ডালের বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং সেই চণ্ডালগৃহে সদ্য নিহত কুক্কুরের মাংসখণ্ড তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলো। তখন তিনি যার পর নাই

আনন্দিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, 'আমাকে যে-কোনো প্রকারে হউক, ঐ মাংসখণ্ড অপহরণ করিতে হইবে.... আপৎকালে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সাধুব্যক্তির গৌরবের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না। আর শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, আপৎকালে ব্রাহ্মণ প্রাণরক্ষার্থে চৌর্যবৃত্তিও অবলম্বন করিবেন। অগ্রে নীচ, পরে তুল্য ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিবে।.... অতএব অগ্রে আমি এই নীচ ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিবো'...." মহাভারতের এই অংশ পাঠ করলে আমরা জানতে পারি, বিশ্বামিত্রর উদ্দেশ্য চণ্ডাল জানতে পারে কিন্তু বিশ্বামিত্রকে সে হত্যা না ক'রে বা তিরস্কার না ক'রে তাকে সদুপদেশ দেয়। কিন্তু বিশ্বামিত্র কুকুরের মাংস খান এবং অবশেষে "ঐ মহাত্মা.... তপঃপ্রভাবে আপনার পাপ অপনীত করিয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।" বিশ্বামিত্র আর চণ্ডালের কাহিনী বর্ণনা ক'রে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "হে ধর্মরাজ, এইরূপে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখে নিপতিত হইলে যে-কোনো উপায়ে হউক, আপনাকে উদ্ধার করিবেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় বুদ্ধি অবলম্বন-পূর্বক জীবন রক্ষা করা সর্বতোভাবে বিধেয়।"

সমাজের ঘৃণিত চণ্ডাল ক্ষুধার্ত-বিশ্বামিত্রকে সদুপদেশ দিয়ে নিজ ধর্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। পরে উপায়ন্তর না দেখে তার মুখের খাবার বিশ্বামিত্রকে দান করে। অন্ত্যবাসী চণ্ডাল এই উদারতা দেখাতে পারলেও বিশ্বামিত্র 'নীচ ব্যক্তির' দ্রব্য চুরি করার জন্য শাস্ত্রের সমর্থন পেয়েছিল। সমাজ উচ্চবর্ণ বিশ্বামিত্রকে 'কুকুরমাংস ভোজন করিলে আমাকে তোমার ন্যায় চণ্ডাল হইতে হইবে না....' বলার অধিকারও দিয়েছিল। চণ্ডালের কোনো পুণ্য হয়েছিল কি-না মহাভারতকার তা ব'লে যাননি কিন্তু সমাজ-নির্দেশিত চণ্ডাল-জীবনের দারিদ্র্য আর অপমান-বেদনার যে বর্ণনা তাঁর রচনায় পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় অস্পৃশ্য চণ্ডালরা ছিল হতদরিদ্র, সমাজের বাইরে 'অরণ্যমধ্যে' তার বাস, তার বহিরঙ্গ অপবিত্র, কুকুরের মাংস তার খাদ্য, আর তার প্রতি উচ্চবর্ণ মানুষের ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই।

মহাকাব্যের যুগে সমাজ-শাসনের জন্য ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভবত আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। মহাভারতে উপদেশ দেওয়া হয় ঃ "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরের উন্নতির কারণ।" বর্ণপ্রথার সরব ঘোষণাও এই পবিত্র গ্রন্থটিতে পাওয়া যায় ঃ "পরাশর কহিলেন, 'হে মহারাজ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ তিন বর্ণের সেবা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করাই শূদ্রের শ্রেয়স্কর। ঐ সেবা দ্বারা শূদ্র সময়ক্রমে বিপুল ধর্মলাভ করিতে সমর্থ হয়.... সেবাই শূদ্রের পরম ধর্ম।"

বৈদিক যুগেই সমাজকর্তারা শূদ্রের সমস্ত অধিকার হরণ করেছিলেন। শূদ্রের পূজার্চনার কোনো অধিকারই প্রাচীন ভারতে ছিল না। মহাকাব্যের যুগে এই বিধিনিষেধ আরও কঠোর হয়ে ওঠে। আমরা রামায়ণে বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি— "এক ব্রাহ্মণ কিশোরের অকালমৃত্যু হয়। রামচন্দ্র ঋষিদের কাছে এই অঘটনের কারণ জানতে চাইলেন। নারদ বললেন, সত্যযুগে ক্ষত্রিয়রাও তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিশিষ্টতা রইলো না, সেজন্য তখন চতুর্বর্ণ স্থাপিত হোলো.... ত্রেতা যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সেবা করাই বৈশ্য ও শূদ্রের বিশেষত শূদ্রের কর্ম হোলো.... মহারাজ তোমার রাজ্যে কোনো দুর্বুদ্ধি শূদ্র তপস্যা করেছে, সেই পাপেই এই বালক মরেছে.... এরপর রামচন্দ্র— বশিষ্ঠ, মার্কণ্ডেয়, কাশ্যপ, গৌতম, নারদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের নির্দেশে বেদপাঠ এবং সশরীরে দেবত্ব লাভের আকাঙ্খায়

কঠোর তপস্যারত শূদ্র শম্বুককে বধ করলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হোলো। কারণ? দেবগণ বললেন, (রামচন্দ্র) তুমি আমাদের প্রিয় কার্য করেছো। তোমার জন্যই এই শূদ্র স্বর্গাধিকারী হোলো না।" [৩]

অবতার রামচন্দ্রের এই রাজন্যোচিত কীর্তি প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য বাহুল্য। আমরা এ যুগেও দেখছি রামভক্ত গান্ধীর 'হরিজনদের' গান্ধীভক্ত রাজনীতিকদের স্বাধীন ভারতে অনেক ক্ষেত্রেই মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই। বর্ণহিন্দুরা সংবিধানকে অগ্রাহ্য ক'রে বেশ দাপটের সঙ্গেই অস্পৃশ্যদের মনুষ্যেতর জীবনযাপনে বাধ্য করছে।

যুগে যুগে ভারতের হিন্দুসম্প্রদায়ের কাছে 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা' পবিত্রতম গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে, যদিও বিভিন্ন অঞ্চলের লোকায়ত রামায়ণ বা মহাভারতের মতো 'গীতা' কখনোই বহুপঠিত বা বহুশ্রুত ছিল না। বিশ শতকের ভারতের বহু রাজনৈতিক নেতার কাছে গীতার বিশেষ স্থান ছিল না। তিলক, গান্ধী, লাজপত রায়, অরবিন্দ এঁরা প্রত্যেকেই গীতার ভাষণ লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও গীতার ভাষ্য লিখেছিলেন। বাঙলার বিপ্লবীরা আন্দোলনের প্রথমদিকে অনেক ক্ষেত্রে গীতা স্পর্শ ক'রে রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত হতেন। আবার অন্যদিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী কানাইলাল পুকুরের জলে গীতা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

বর্ণবিভাগের ক্ষেত্রে গীতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গীতা মহাভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ব'লে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনপ্রিয় চারণগাথা রামায়ণ বা মহাভারতকে পরবর্তীকালে মহাকাব্যের রূপ দেওয়া হয় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করার জন্য অনেক পুরোনো বচনা এর মধ্যে সংযোজিত করা হয়। এভাবেই গীতাকে মহাভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ব'লে প্রচার করা হয়। গীতায় জন্মান্তরবাদ, নিষ্কাম কর্মবাদ, বর্ণধর্ম আর জন্মগত মানব প্রকৃতির উদাত্ত প্রচারের মাধ্যমে জাতিভেদপ্রথাকে এক ধর্মীয় দার্শনিক রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়।

গীতায় প্রচারিত বর্ণ-ধর্মের মূল কথা হোলো কোনো মানুষ তার পূর্ব জন্ম বা জন্মগুলিতে কৃত ভালো কাজ বা মন্দ কাজের জন্য বর্তমান জন্মে সমাজে উচ্চ বা নিম্ন বর্ণে জন্মগ্রহণ করে। মানুষ জন্মায় নির্দিষ্ট 'গুণ' নিয়ে। সত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণ— তার বর্ণধর্ম অর্থাৎ কর্ম শাস্ত্রচর্চা, অধ্যাপনা, পূজা ইত্যাদি; অল্প সত্বগুণ বিশিষ্ট রজোগুণ-প্রধান ক্ষত্রিয়— তার কর্ম বা বর্ণধর্ম যুদ্ধাদি, প্রজাপালন, রাজ্য রক্ষা ইত্যাদি; অল্প তমোগুণ বিশিষ্ট রজোগুণ-প্রধান বৈশ্য— তার কর্ম বা বর্ণধর্ম ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিকর্ম ইত্যাদি; আর তমোগুণ-প্রধান শূদ্র, তার বর্ণধর্ম বা কর্ম অসূয়াশূন্য হয়ে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা— "হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্মসকল স্বভাবজাত গুণানুসারেই পৃথক পৃথক বিভক্ত হইয়াছে।" গীতার উপদেশ হোলো ঃ স্বধর্ম পালনে কিছু ত্রুটি উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা বিপজ্জনক। মানুষ তার বর্ণগত ধর্ম পালন করবে কামনারহিত হয়ে। এর অর্থ শূদ্র উত্তমরূপে বেদপাঠ করতে পারলেও তা বর্ণধর্মবিরোধী, তার উচিৎ নিষ্কাম হয়ে অসূয়াশূন্য হয়ে উচ্চবর্ণের সেবা ক'রে যাওয়া। কারণ সেবাই তার বর্ণধর্ম। এর কারণ বিগত জন্মে পাপ করার জন্য সে তমোগুণবিশিষ্ট শূদ্রকুলে জন্মেছে; এ জন্মে নিষ্কামভাবে বিধাতা নির্দেশিত শূদ্রধর্ম নিষ্ঠাভরে পালন করলেই তার পুণ্য হবে, মুক্তির পথ সুগম হবে, অর্থাৎ পর জন্মে সে উচ্চতর বর্ণে জন্মাতে পারে।

বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্র' ধর্মগ্রন্থ না হ'লেও সে যুগের রাজনীতির সংবিধান। 'অর্থশাস্ত্র' লেখা হয় ৩২১ খৃষ্ট পূর্বাব্দেব পবে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২১ অথবা ৩২২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন বৈশ্য সম্প্রদাযের মোরিয়া উপজাতি ভুক্ত। চাণক্য বা কৌটিল্য ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা। নন্দবংশের রাজাকে হটিয়ে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন দখল করেন। অনেকের মতে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম ছিলেন শূদ্রানী মাযের সন্তান, আবার অনেকের মতে তাঁর পিতা ছিলেন ক্ষৌরকার ও মাতা ছিলেন রাজসভার নর্তকী। নন্দরাই প্রথম অক্ষত্রিয় রাজা। নিম্নবর্ণের মানুষ এ যুগে রাজা হ'লেও সাধারণ শূদ্রদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই সে যুগের 'অটোক্র্যাটিক' শাসকের উপদেষ্টা চাণক্যের প্রচেষ্টা ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা। তিনিও বর্ণধর্ম পালনের নির্দেশ দেন। অর্থশাস্ত্র শূদ্রদের জন্য 'দ্বি-জাতি শুশ্রূষা'র বিধান দেয়। সমসাময়িকালে রচিত মেগাস্থিনিস-এর বিবরণ (৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) থেকে জানা যায়, সে আমলে ব্রাহ্মণশ্রেণীর কোনোরকমের কায়িক শ্রম করার প্রয়োজনই হোতো না। আর ক্ষত্রিয়ের একমাত্র কাজ ছিল যুদ্ধ করা, শান্তির সময় ক্ষত্রিয়রা আলস্যে দিনযাপন কবতো, তখন এদের কাজ ছিল মদ্যপান করা। দৈহিক পরিশ্রম তথা উৎপাদনের কাজ নির্দিষ্ট ছিল অধঃপতিত বৈশ্য অথবা শূদ্রের ওপর। এ যুগে শূদ্রজীবনের সঙ্গে ক্রীতদাসজীবনের খুব একটা পার্থক্য ছিল না।

'মনুসংহিতাব' রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। অধ্যাপক বুলার-এর মতে মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ১০০-২০০ অব্দের মধ্যে। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রকুমার দত্তও এই সময়েবই উল্লেখ করেছেন। আম্বেদকর মনে কবেন মনুসংহিতা ১৮৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দের পরে লেখা। রোমিলা থাপার মনে করেন, মনুসংহিতার রচনাকাল দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ। এ. এল. ব্যাশাম সম্পাদিত 'A Cultural History of India' গ্রন্থে মনুসংহিতার রচনাকাল নির্দেশ করা হয়েছে ১০০-২০০ খৃষ্টাব্দ। অধ্যাপক ঘুরিয়ে 'মনুসংহিতার' রচনাকাল হিসেবে আরও পরবর্তী সময় নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে 'ধর্মশাস্ত্রের' যুগ হোলো খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে দশম শতক অথবা একাদশ শতক। এ যুগের প্রধান প্রবক্তা হলেন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, এবং বিষ্ণু। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমাদের মনে হয় মনুসংহিতা খুব প্রাচীন রচনা নয়। 'সংহিতাতে' সাতজন মনুর উল্লেখ করা হয়েছে; এর থেকে বোঝা যায় এই 'আইনগ্রন্থটি' অনেকজনের লেখা এবং বহুদিন ধ'রে লেখা। এ কারণেই সমগ্র সংহিতার মধ্যে কিছু কিছু স্ববিরোধী উক্তি পাওয়া যায়। বৌদ্ধসম্প্রদায় ও বেদবিরোধী মানুষের বিরুদ্ধে সমাজকে সংহত করার জন্যই এই সংহিতা। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, বর্ণাশ্রম ও জাতিপ্রথা, আর নির্যাতিত মানুষকে ঘৃণার অন্ধকারে নির্বাসিত করার উদগ্র প্রচার করা হয়েছে। সে যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা মারফৎ যে দমনপীড়ন শূদ্রসাধারণের ওপর নেমে এসেছিল তা এককথায় অভাবনীয়। মনুসংহিতায় নির্দেশিত প্রশাসনিক বিষয়ের কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছিঃ "এক জাতি অর্থাৎ শূদ্র যদি দ্বি-জাতিদিগেব প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদ দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে.... দর্পিতভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করাইবেন; অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে-কোনো অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠজাতিকে মারিলে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন. .. শূদ্র যদি দর্পবশত ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে

নির্বাসিত করিবেন, অথবা যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন.... দর্প করিয়া শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিবেন.... এবং অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে গুহ্যদেশ ছেদন করিয়া দিবেন....'' ইত্যাদি। মনুসংহিতায় লিপিবদ্ধ এই ভয়ঙ্কর বিধিব্যবস্থার মধ্যে হয়তো অতিরঞ্জন থাকতে পারে কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা অনুমান করতে পারি, ধর্মশাস্ত্রের যুগে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-এলিট শূদ্রসাধারণের ওপর এক নিপীড়নমূলক সমাজবিধি চাপিয়ে দিয়েছিল। মনুসংহিতা শূদ্রকে দাস রূপে বিবেচনা করেছিল; এই সংহিতায় বিধান দেওয়া হয়— ''বিধাতা দাস্যকর্ম নির্বাহার্থ উহাকে [শূদ্রকে] সৃষ্টি করিয়াছেন.... শূদ্র স্বামী-কর্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব-বিমুক্ত হয় না, দাসত্বকর্ম তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে উহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে....।'' মনে হয়, শূদ্র সে যুগে ক্রয়বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল। মনুসংহিতায় সাত রকম দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সাত রকমের দাস হোলো ঃ 'ধ্বজাহৃত'— যাকে যুদ্ধে জয় করা হয়েছে; 'ভক্তদাস'— অন্নের জন্য যে স্বেচ্ছায় দাসত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছে; 'গৃহজ'— গৃহদাসীর পুত্র; 'ক্রীত'— যাকে অর্থের বিনিময়ে কেনা হয়েছে; 'দত্রিম'— যাকে অন্য কেউ দান করেছে; 'পৈত্রিক'— পিতার সম্পত্তি; এবং 'দণ্ডদাস'— রাজা যাকে দাসবৃত্তি পালন করার শাস্তি দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, মনুসংহিতার এই অংশের রচনাকার দাসপ্রথা সমর্থনের জন্য প্রাচীনতর শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছেন।

তথাকথিত হিন্দুধর্মের উদারতা বা সহিষ্ণুতার কথা বহুশ্রুত। কিন্তু আমাদের মনে হয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের 'লজিককে' প্রশ্ন করে— এমন কোনো মতবাদকে 'হিন্দুধর্ম' প্রশ্রয় দেয়নি। এ ব্যাপারে হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মের মতোই অসহিষ্ণু। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সঙ্গে বৌদ্ধদের দ্বন্দ্বের কথা সুবিদিত। অবশেষে বুদ্ধকে অবতার বানিয়ে এই দ্বন্দ্বকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বস্তুবাদী-চার্বাকপন্থীদেরও দমন করেছিল। ব্রাহ্মণতন্ত্রের এই স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তি ছিল বর্ণধর্মের উদাত্ত প্রচার। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এই বর্ণধর্মকেই সমাজজীবনের নির্দেশক হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। 'পুরুষসূক্তের' রচয়িতা থেকে শুরু ক'রে মনু পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রকারই এ কাজ করেছেন। তাই হিন্দুধর্মের উদাবতাকে আমাদের অতিকথা ব'লে মনে হয়। একমাত্র মধ্যযুগেই লোকধর্ম বা ভক্তিআন্দোলন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বাইরে এক উদার মানবতাবাদী ধর্মপ্রচারে সক্ষম হয়।

ইংরেজ আমলে জাতিপ্রথা

ধর্মশাস্ত্র রচনার যুগ যদি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে দশম বা একাদশ শতক হয়, তাহলে এ যুগেই ভারতের সমাজের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়, আর তা হোলো— ভারতে মুসলমান প্রতিষ্ঠার যুগ। এ যুগে জাতিপ্রথা আর লোকধর্মে জাতিপ্রথাবিরোধিতার আলোচনা স্বতন্ত্র রচনাতেই সম্ভব। মধ্যযুগে হিন্দুধর্ম আর ইসলামের সমন্বয়ে গ'ড়ে ওঠা ধর্মের 'লিট্‌ল ট্র্যাডিশন'-এর ধারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র আর উলেমা-সম্প্রদায়ের এলিটপন্থী ইসলামকে অস্বীকার করে। একদিকে হিন্দুধর্মের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যেও জাতিপ্রথা সংক্রামিত হয়, অন্যদিকে হিন্দুসমাজের নিচুতলার মানুষ সুফী সম্প্রদায়-প্রচারিত উদারনৈতিক সমতাবাদী ইসলামে দীক্ষিত হয়। কিন্তু উনিশ শতকের রাজনৈতিক হিন্দুত্ব, আর্যধর্মপ্রীতি, আর রাজনৈতিক ইসলাম এই সমন্বয়ী সাধনার ধারাকে বহুলাংশে বিনষ্ট করে-- যার ফলাফল হয়েছিল অত্যন্ত অশুভ।

সাধারণত ভারতের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনাকাল ইংরেজের ভারত-অধিকারের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব'লে ধরা হয়। 'ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র' হিসেবে ইংরেজ-বণিক ভারতের সমাজে আধুনিকতার বীজ ছড়ালেও শাসনের প্রথমদিন থেকেই হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায়ের কুসংস্কারকে ইংরেজ প্রশ্রয় দিতে শুরু করে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলে ইংরেজের প্ররোচনাতেই বাঙলাদেশে 'সতীদাহ'র ঘটনা বৃদ্ধি পায়। ঠিক একইরকমভাবে জাতিপ্রথাকেও স্থায়ী করার চেষ্টা করে ইংরেজ;[৫] কারণ তাদের নীতি ছিল 'ভাগ করো শাসন করো!'

১৮৫৭-র প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটায় কিন্তু শঙ্কিত করে মহারাণীর প্রতিনিধিদের। টোটা আর চর্বির কাহিনী প্রথমত উত্তেজিত করে উচ্চবর্ণ সিপাহীদের, তাই ইংরেজপ্রশাসকরা সৈন্যদলে জাতিভেদ জোরদার করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যপ্রেমী ইংরেজরা স্বদেশে ব'সেই ভারতীয় সৈন্যদল থেকে উচ্চবর্ণের সিপাহীদের উচ্ছেদ করার দাবি জানায়। কোনো কোনো ইংরেজ-সেনানায়ক অভিমত প্রকাশ করেন যে, জাতিভেদপ্রথা বিদ্রোহ প্রতিহত করতে পারে। 'হিন্দু কলেজ'-এব অধ্যক্ষ জেমস্ কার ১৮৬৫ সালে ঘোষণা করেন জাতিভেদপ্রথা জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী— সুতরাং তা সাম্রাজ্য রক্ষার সহায়ক। ইংরেজ সাংবাদিক আর ঐতিহাসিকরাও ভেদনীতি প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠেন।

ইংরেজ শুধু হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করার রাজনীতিই গ্রহণ করেনি, হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিপ্রথাকে সুদৃঢ় করার কৌশলও গ্রহণ করে। ১৮৭১ সালে ভারতে প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে লোকগণনা শুরু হয়। সেন্সাসে হিন্দুদের জাতি নির্দিষ্ট করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়— এর ফলে হিন্দুদের মধ্যে জাতিবোধ বা 'কাস্ট স্পিরিট' নতুন ক'রে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দশ বছর পর পর লোকগণনায় 'জাতি নির্দিষ্ট করার প্রথার' ফলে শ্রেণীচেতনা বা জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মননে গোষ্ঠীমানসিকতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এর বিষময় ফল ফলতে দেরি হয়নি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী-আন্দোলনের সময় থেকে বহু নিম্নজাতির হিন্দু 'স্বদেশী আন্দোলন' থেকে দূরে থাকেন। এর মূলে একদিকে যেমন ছিল উচ্চবর্ণ নেতৃবৃন্দের ভ্রান্তি আর ব্যর্থতা, অন্যদিকে নিচুতলার মানুষদের উচ্চবর্ণ মানুষের প্রতি অবিশ্বাস— যার কারণ কঠোর জাতিভেদপ্রথা। নিম্নবর্ণের মানুষরা ব্রিটিশ-রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করেন এবং শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা মারফৎ অবস্থার উন্নতি ঘটাতে তৎপর হন।

১৯২১ সালের লোকগণনায় দেখা যায় ভারতে অস্পৃশ্য মানুষের সংখ্যা ৫,২৬,৮০,০০০; সমগ্র হিন্দুজনসংখ্যার ২৫ শতাংশ। ১৯৩১ সালে অস্পৃশ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,০১,৯৫,৭৭০; সমগ্র হিন্দুজনসংখ্যার ২১ শতাংশ। দশ বছরে অস্পৃশ্যদের সংখ্যা ক'মে যাবার কারণ হোলো অনেক অস্পৃশ্য মানুষই সমাজের লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পাবার জন্য লোকগণনার সময় উচ্চতর জাতি হিসেবে পরিচয় প্রদান করেন।

১৯২১ সালে লোকগণনা সম্পন্ন হবার পর ভারতীয় 'স্ট্যাটুটরি কমিশন' নিম্নোক্ত ধারায় অস্পৃশ্যদের সংজ্ঞা নির্দেশ করে— "এরা হিন্দুধর্ম ও সমাজের ঐতিহ্য অনুসারে নিম্নতম শ্রেণীর; এদের মূল লক্ষণ হোলো যে, এরা যদিও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত, তবুও গোঁড়া হিন্দুদের মতানুসারে অস্পৃশ্য, অর্থাৎ অন্যান্য হিন্দুরা তাদের দেওয়া খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করবে

না। হিন্দুমন্দিরের মধ্যে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এরা যে শুধু হিন্দুধর্ম ও সমাজের সবচেয়ে তলায় আছে তা-ই নয়, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারেও কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এরা সবচেয়ে তলায়। গ্রামাঞ্চলে এরা সাধারণত একটি স্বতন্ত্র পল্লীতে থাকে এবং অন্যান্য হিন্দুদের অস্পৃশ্য খাদ্য খায়।"

উনিশ শতক থেকেই বাঙলাদেশে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করলেও অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক থেকে বঙ্গসমাজও মুক্ত ছিল না। বিশের দশকে 'ভোটাধিকার কমিটি' বাঙলাদেশের 'অবজ্ঞাত শ্রেণীর' কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করে ঃ

ক। যে সমস্ত শ্রেণীর কাছ থেকে উচ্চবর্ণ, এমন-কি নব-শাখার লোকেরাও জলগ্রহণ করবে না এবং রান্নাঘরে অথবা যে ঘরে জল এবং রাঁধা খাবার আছে, সে ঘরে যারা ঢুকলে সমস্ত জিনিসই নষ্ট হয়ে যায়।

খ। যারা মন্দিরে ঢুকলে পূজার জিনিস অপবিত্র হয়ে যায়।

গ। সবর্ণ হিন্দুদের পরিচালিত কোনো হোটেলের খাবার-ঘরে যাদের খেতে দেওয়া হয় না।

ঘ। যাদের বাড়িতে সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করলে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণরা অন্যান্য স্ববর্ণ হিন্দুদের বাড়িতে আর কাজ করতে পারে না।

ঙ। যে শ্রোত্রিয় নাপিত এদের কাজ করে সেও আর স্ববর্ণদের বাড়ি কাজ পায় না।

বলা বাহুল্য, সরকারি রিপোর্টে অস্পৃশ্যদের সামাজিক অবস্থার যে বর্ণনা পাওযা যায়— তার থেকে বাস্তব অবস্থা অনেক বেশি অসহনীয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে বর্ণহিন্দুরা অস্পৃশ্যদের কূপ, শ্মশান, ধর্মশালা, পথঘাট ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করতে দিতো না।[৬] তবে একথা ঠিক যে, দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যদের অবস্থা বাঙলার অস্পৃশ্যদের থেকেও অপমানকর ছিল।

১৯৩২ সালে মাদ্রাজের 'হিন্দু পত্রিকায়' এক বিপোর্ট প্রকাশিত হয়, এই রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি— 'পুরাদা ভান্নান' নামের এক নিম্নজাতি শুধু অশুচিই ছিল না, তারা ছিল দর্শনের অযোগ্য। অর্থাৎ কোনো উচ্চবর্ণের ব্যক্তি কোনো 'পুরাদা ভান্নানকে' দেখামাত্র অপবিত্র হয়ে যেতেন, সুতরাং সমাজ এই 'পুরাদা ভান্নানদের' দিবালোকে পথভ্রমণ নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিল। এদের কাজ ছিল অন্যান্য নিম্নজাতির ব্যবহৃত কাপড় কাচা। এরা এই কাজ শুরু করতো সন্ধে থেকে; আর রাত শেষ হবার আগেই তারা বস্তীতে ঢুকতে বাধ্য ছিল। একবার এক উচ্চজাতির মানুষ এদের সঙ্গে দেখা করতে যান। বারংবার বলার পর এই 'অদর্শনীয়রা' ঘরের বাইরে আসে— "এদের সর্বাঙ্গ তখন থরথর ক'রে কাঁপছিল।"

মহাত্মাজীর ভূমিকা

আমরা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি। অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে মহাত্মাজী যে আন্দোলন শুরু করেন তাও তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গেই যুক্ত। ধর্মপ্রাণ গান্ধীর অহিংসার নীতি, 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, 'স্বরাজ'-এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা নিয়ে টালবাহানা, শত্রুর ক্ষতি না ক'রে তার হৃদযের পরিবর্তনের আকাঙ্খা, মালিক-শ্রমিকের পিতা-

পুত্রপ্রতিম সম্পর্ক স্থাপনের প্রচার ইত্যাদির মতোই গান্ধী-নির্দেশিত বর্ণহিন্দু-হরিজন দ্বন্দ্বের সমাধানের পথও একান্তভাবেই মহাত্মাসুলভ! বর্ণাশ্রম বজায় রেখে, যাবতীয় হিন্দুধর্মগ্রন্থকে মান্য ক'রে, গীতার মাহাত্ম্য প্রচার ক'রে মহাত্মাজী 'হরিজন আন্দোলন' শুরু করেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নেও গান্ধী ব্যর্থ, আর একইরকমভাবে অস্পৃশ্যতাবিরোধী-আন্দোলনেও তিনি ব্যর্থ ঃ "জাতিপ্রথাকে ধ্বংস করা আর পশ্চিমী সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করার অর্থ— হিন্দুদের বংশানুক্রমিক [নির্দিষ্ট] জীবিকা গ্রহণের নীতি ত্যাগ করতে হবে যা হোলো জাতিপ্রথার অন্তঃসার। বংশানুক্রমিক জীবিকা গ্রহণের নীতি এক শাশ্বত নীতি, একে ধ্বংস করা মানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আমার জীবনে একজন ব্রাহ্মণের কোনো প্রয়োজন থাকবে না, যদি না তাকে আমি ব্রাহ্মণ বলতে পারি। [জাতিপ্রথার ধ্বংস] একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে, যদি প্রত্যেক দিন একজন ব্রাহ্মণ— শূদ্র হয়ে যায়; অথবা একজন শূদ্র— ব্রাহ্মণ হয়ে যায়।"

স্পষ্টতই বোঝা যায়— জাতিপ্রথার ধ্বংস চাননি গান্ধী। তিনি চেয়েছিলেন বর্ণ-কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে কিছু সংস্কার, বর্ণহিন্দুরা যাতে তাঁর 'হরিজনদের' ঘৃণা না করে— "মেথরের সন্তান নিজেকে ছোট মনে না ক'রেও মেথরই থাকুক" — আর ঠিক একইভাবে ব্রাহ্মণ তার মন থেকে অস্পৃশ্যদের প্রতি ঘৃণা ত্যাগ করুক।

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর প্রতিষ্ঠার সময় ১৯২১, আর এসময় থেকেই তিনি 'হরিজন আন্দোলন' শুরু করেন। গান্ধী-পূর্ব যুগে অস্পৃশ্যদের 'অন্ত্যজ' বলা হোতো। সর্বপ্রথম পণ্ডিত নরসিং মেহতা 'হরিজন' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং মহাত্মা এই শব্দটি গ্রহণ ক'রে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের কাছে 'হরিজন' বা 'ঈশ্বরের সন্তান' অভিধাটি সুখকর হয়নি। সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে শুধুমাত্র মেথর, ধাঙড়, ডোম, বা চাঁড়ালরাই ঈশ্বরের সন্তান আর উচ্চজাতিরা অন্য কিছু— এরকম সীমারেখা টানার প্রচেষ্টাকে অস্পৃশ্য সমাজের নেতারা সানন্দে গ্রহণ করেননি। 'হরিজন কল্যাণ পরিকল্পনাকে' আম্বেদকর তাই 'রাজনৈতিক অনুকম্পা' বলেছিলেন।

আজও ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সমস্যা সমাজবিপ্লবের সমস্যার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। একজন ব্যক্তির কোনো জাতি নেই অথচ সে হিন্দু— একথা অভাবনীয়। মহাত্মাও একথা ভাবেননি। বিবেকানন্দ কখনো কখনো বর্ণপ্রথাকে সরব সমর্থন জানালেও শূদ্রবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন— "আর্য-বাবাগণের জাঁকই করো, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই করো.... তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছো?.... চলমান শ্মশান হচ্ছো তোমরা.... (শূদ্ররা) সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে ... সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে— তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেযে দুনিয়া উল্টে দিতে পাবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।" 'দুনিয়া উল্টানোতে', মহাত্মার ভীতি ছিল— তাই 'শূদ্রবিপ্লব'-এর সম্ভাবনা রোধ করার জন্য 'হরিজনদের' তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন ধৈর্য ধরতে, প্রতীক্ষা করতে— যতদিন না বর্ণহিন্দুদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে।

বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে অস্পৃশ্যদের সচেতনতার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। ভারতের কোনো কোনো জায়গায় তারা সরকারি রাস্তাঘাট ব্যবহার করার দাবি জানায়। মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের কথাও আলোচিত হয়। এ সময় গান্ধী অস্পৃশ্যদের উপদেশ দেন যে,

মন্দিরে 'হরিজনদের' প্রবেশ করার প্রচেষ্টা নেওয়া উচিৎ নয়— কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই 'হরিজনদের' হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। ১৯৩৪ সালে মহাত্মা মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের অধিকার প্রসঙ্গে লেখেন, "যতদিন না বর্ণহিন্দুদের মতামত গঠিত হয় [ততদিন] হরিজনদের জন্য মন্দিরের [দ্বার] উন্মুক্ত হোক এমন কোনো ইচ্ছেই আমার নেই.... প্রত্যেক বর্ণহিন্দুর কর্তব্য হোলো হরিজনদের মন্দির-প্রবেশের অধিকার [প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা]।"

'শূদ্রবিপ্লব' সম্পর্কে গান্ধীজীর ভীতি ছিল— একথা আমরা আগেই বলেছি। ১৯২৫ সালে তিনি এ বিষয়ে স্পষ্ট ক'রে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন— "পুণায় থাকতে অস্পৃশ্যশ্রেণীর কয়েকজন আমায় জানান যে, হিন্দুরা যদি তাদের মত পরিবর্তন না করে— তাহলে তাঁরা বলের আশ্রয় নেবেন। কিন্তু বলপ্রয়োগ করলেই কি অস্পৃশ্যতা দূর হবে?.... গোঁড়া হিন্দুদের তাদের গোঁড়ামীর থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হোলো ধৈর্য সহ তর্ক এবং যথাযথ আচরণ। যতদিন তারা মত পরিবর্তন না করছে ততদিন নিজেদের দুর্ভাগ্য ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতে হবে.... আমি স্বধর্ম অনুসারেই তাঁদের (অস্পৃশ্যদের) সাহায্য করতে পারি, পাশ্চাত্য প্রণালীতে নয়। সেভাবে আমি হিন্দুধর্ম রক্ষা করতে পারবো না.... তাই আমি প্রার্থনা করি— নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য পাশবিক বল প্রয়োগের ইচ্ছা তাঁরা (অস্পৃশ্যরা) মন থেকে ত্যাগ করুন....।"

অস্পৃশ্যদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সঞ্চিত হোক এটা মহাত্মাজী চাননি। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদেব ভেদনীতি ১৯৩২ সালে হিন্দু-অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করে। গান্ধী এ প্রস্তাবে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা অস্পৃশ্য এবং হিন্দুধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর। এই ব্যবস্থা হিন্দুসম্প্রদায়কে দ্বিখণ্ডিত করবে। তিনি অস্পৃশ্য-সমাজের নেতা আর বর্ণহিন্দুদের ঐকমত্যে আনার জন্য আমরণ অনশন শুরু করেন। অন্যান্য ভারতীয় নেতারা তখন অস্পৃশ্যসমাজের প্রতিনিধি আম্বেদকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন; এবং গান্ধীর ছ'দিন অনশনের পর, অনেক দর-কষাকষি ক'রে অস্পৃশ্যদের জন্য আম্বেদকার 'পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার' দাবি প্রত্যাহার ক'রে নেন। অস্পৃশাদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা অবশ্যই জাতীয় ঐক্যের (অর্থাৎ হিন্দু ঐক্যের) পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। কিন্তু অস্পৃশ্যরা 'মুসলিম লীগ'-এর মতো সমস্ত ব্যাপারেই কংগ্রেসের সঙ্গে দর-কষাকষি করুক এটা গান্ধী চাননি। একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অস্পৃশ্যরা কিছুটা ক্ষমতা পেলে বর্ণহিন্দুদের একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হোতো। গান্ধী তাই হিন্দুসম্প্রদায়ের 'ঐক্য' রক্ষার জন্য আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। অথচ এর একবছর পরেই তিনি বিবৃতি দেন, "অস্পৃশ্যতা মোচনের যে রাজনৈতিক ফলাফল, সে সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই। বাস্তবিক আমার ধারণা আমরা যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে হরিজনদের সেবা করতে আমরা পারবো না, উপরন্তু হিন্দুধর্ম মহা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

বস্তুত, মহাত্মাসুলভ দৃষ্টিতেই অস্পৃশ্যতার প্রশ্নকে দেখেছিলেন গান্ধীজী। তিনি মনে করতেন নিম্নবর্ণকে ঘৃণা করা পাপ। তাই ১৯৩৪ সালে বিহারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পকে তিনি বর্ণহিন্দুর পাপের বিধাতা-নির্দেশিত-প্রতিফল ব'লেই মনে করেছিলেন। তাঁর ভাষায়— "ভূমিকম্প.. অস্পৃশ্যতার পাপের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধের একটা প্রকাশ....।" রবীন্দ্রনাথও গান্ধীজীর এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছিলেন। আর জহরলাল তো গান্ধীর এই মন্তব্যে

বিশেষ আঘাতই পেয়েছিলেন। প্রাকৃতিক ঘটনাকে মানুষের পাপের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ হিসেবে বর্ণনা করাকে তিনি কয়েক শতক পিছিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, যেমন— অজ্ঞ ধর্মান্ধরা ব্রুনোকে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য জীবন্ত দগ্ধ করেছিল।[৭]

অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে এরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মহাত্মাজী মানব-আত্মার চরম অপমানেও 'হরিজন কল্যাণের' কথা বলেছেন; অথচ অস্পৃশ্যতার ইডিয়লজি অর্থাৎ সনাতন হিন্দুধর্ম বা হিন্দুগ্রন্থ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। বরং বর্ণপ্রথার সমর্থন খুঁজেছেন প্রাচীন ভারতের আদর্শে। ব্যক্তিজীবনে এবং রাজনৈতিক জীবনে গান্ধী ছিলেন পরম ধার্মিক। ট্র্যাডিশনাল হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর ছিল অটল শ্রদ্ধা। তাই বর্ণাশ্রমকেও তিনি অভ্রান্ত সমাজব্যবস্থা ব'লে মনে করতেন— "যদি আর্যরা তাদের ইতিহাসের কোনো এক সময়ে একশ্রেণীর লোককে শাস্তি দেবার জন্য সমাজচ্যুত ক'রেই থাকে, তাদের সন্তানদেরও বিনা দোষে সেই শাস্তি যুগ যুগ ধ'রে বহন করতে হবে— এর কোনো মানে নেই   বর্ণবৈষম্যের কারণে বর্ণ জিনিসটাকেই একেবারে তুলে দিতে হবে, এ ধারণা করা অন্যায়.... অস্পৃশ্যতা তো বর্ণাশ্রম থেকে উদ্ভূত নয়. . আসল বর্ণধর্ম হোলো সমাজের চারটি শ্রেণীর সৃষ্টি করা, যারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূরক.... হিন্দুধর্মের পুরো শরীরটার সমান প্রয়োজনীয় অংশ।" —অথবা, "বর্ণাশ্রমে আমি বিশ্বাস করি এই জন্য যে, বর্ণাশ্রম বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে বিভিন্ন কর্মের প্রবর্তনা দেয়.... আমার ধারণায় হিন্দুধর্মে 'অস্পৃশ্য' ব'লে কোনো পঞ্চম শ্রেণী নেই   বর্ণাশ্রম, আমার কাছে, সমাজের উন্নতির জন্য আদর্শ পন্থা। আজ আমরা যা দেখি, তা বর্ণাশ্রমের অক্ষম অনুকরণ এবং প্রহসন মাত্র.. বর্ণাশ্রমকে প্রকৃত মর্যাদায়.... প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

হিন্দুধর্মের 'গ্রেট ট্র্যাডিশনে' 'গীতা' সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মগ্রন্থ। গান্ধীজী 'গীতা' নির্দেশিত জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, বর্ণধর্মের যে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন— তা 'গীতার' আদর্শসঞ্জাত— "আমরা সকলেই ভগবানের রাজ্যে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতে জন্মিয়াছি.... ব্রাহ্মণ তাঁহার জ্ঞান দিয়া, ক্ষত্রিয় তাঁহার আর্তকে রক্ষা করার শক্তি দিয়া, বৈশ্য তাঁহার ব্যবসায়িক বুদ্ধি দিয়া, শূদ্র তাঁহার কায়িক পরিশ্রম দিয়া ভগবানের নির্দেশ পালন করিবেন . জন্মের ফলে ব্রাহ্মণ প্রধানত জ্ঞানের চর্চা করিবেন যেহেতু জন্ম ও সংস্কার তাঁহাকে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছে। আবার বর্ণাশ্রম.... কেবল এইটুকু বলে যে, শূদ্র তাহার দৈহিক শক্তি দিয়া সংসারের সেবা করুক, সে যেন অপরের অন্য বিশেষ শক্তি আছে বলিয়া ঈর্ষা না করে। বর্ণাশ্রম শিক্ষা দেয় আত্মসংযম.... সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করে।" 'গীতার' মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে মাহাত্মা বলেন, "গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে সাম্যের কথা বলেছেন— আমি সেই সাম্য-বিশ্বাসী। গীতা বলে, চতুর্বর্ণের প্রত্যেকের অধিকার সমান এবং এই সাম্যের কথা মনে রেখে তাদের প্রতি ব্যবহার করা উচিৎ। ব্রাহ্মণের যা ধর্ম, মেথরের ধর্ম তা না হ'তে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ তার সমস্ত বিদ্যাবত্তা নিয়ে যে সম্মান ও সুবিচার পায় মেথরেরও ঠিক ততখানি সম্মান ও সুবিচারের অধিকার আছে।"

'গীতার' আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে গান্ধীজী— মেথরের জন্য ব্রাহ্মণের সমান সম্মানের দাবি জানিয়েছিলেন; কিন্তু ভারতের ইতিহাসে, গান্ধীর সমকালে বা গান্ধী-পরবর্তীকালেও মেথরের ভাগ্যে 'মানুষের ন্যূনতম সম্মানটুকুও' জোটেনি। এর জন্য দায়ী হিন্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম,

'পবিত্র' গ্রন্থাদি, আর কুশিক্ষা। বস্তুত, ভারতের মানুষের ধর্মাশ্রয়ী জীবনদৃষ্টি জাতিপ্রথাকে কঠোর থেকে কঠোরতর করেছে; আর মহাত্মাজীর ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি, 'হরিজন কল্যাণের' সরব প্রচার মারফৎ অস্পৃশ্য-বর্ণহিন্দু-দ্বন্দ্ব প্রশমিত করার চেষ্টা করেছে।[৮] বর্তমান আলোচনার শুরুতে হিন্দুধর্মগ্রন্থে জাতিভেদপ্রথা সমর্থনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিয়েছি তা থেকে বিশেষ জোর দিয়েই বলা যায় যে, জাতিভেদপ্রথার উৎস ইতিহাস, বিভিন্ন 'পবিত্র' গ্রন্থের শিক্ষা, আর আচার-সর্বস্ব ধর্মবোধ— তাই গান্ধীর উত্তরসূরীদের ভারতে আজও গান্ধী কথিত 'ঈশ্বরের সন্তান' নিগ্রহ অব্যাহতই রয়েছে। তথাকথিত সেকুলার ভারতে অস্পৃশ্যদের ওপর বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার আজও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

পণ্ডিত নেহরু খুব সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে, 'জাতিভেদ কণ্টকিত' সমাজকে যথার্থ সেকুলার সমাজ বলা যায় না।

ভারতের দুর্ভাগ্য. ভারতের বিকৃত শিল্পায়ন এ-দেশের সমাজে 'সেকুলারিজম'-এর জন্ম দিতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে গ'ড়ে ওঠা বিভিন্ন 'মুৎসুদ্দি শহর' শিল্প-বিপ্লব উত্তর নগর পাশ্চাত্য সমাজের নগর বিস্তারের মতো, মানুষকে 'গ্রাম্যজীবনের মূঢ়তা' থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। ভারতের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর সামন্ত জোটের প্রতিনিধি জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম স্ফূর্তি ঘটে গান্ধীজীর আমলে। 'কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত' এই মহাত্মা ছিলেন নগর সভ্যতার বিরোধী, শিল্প বিস্তারের বিরোধী। ধর্ম আর রাজনীতি ছিল তাঁর কাছে অভিন্ন। সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীচেতনা বিকাশের সহায়ক। বিশেষ ক'রে ভারতের সমাজের মতো 'প্লুরাল সোসাইটিতে' সেকুলারিজম-এর পক্ষে আন্দোলনই 'সাম্প্রদায়িকতা আর জাতিভেদপ্রথার মতো প্রগতিবিরোধী মতাদর্শকে' প্রতিহত করতে পারতো। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা শ্রেণীস্বার্থগত কারণেই 'সেকুলারিজম'-এর পক্ষে কোনো কথা বলেননি। আর শূদ্র হত্যাকারী অবতার রামচন্দ্রের ভক্ত মহাত্মাজী বিশ্বাস করতেন, ধর্মহীন রাজনীতি ইংরেজের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

দেশভাগ, তথা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে আজও ভারতের সমাজ জাতিভেদ-কণ্টকিত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর গণহত্যায় বিপন্ন; এর কারণ আমাদের পূর্বসূরীদের ভ্রান্তি। বর্তমান ভারতের সমাজে পুরোনো ধাঁচের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করার ঐতিহাসিক বস্তুগত উপাদানগুলি অনুপস্থিত। আজ নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার গুরুদায়িত্ব বর্তেছে 'তৃতীয় ধারার' রাজনীতিকদের স্কন্ধে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনারব্ধ বা অসম্পূর্ণ কাজ আজ তাঁদেরই সারতে হবে। আমাদের বিশ্বাস বর্তমান ভারতে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করার সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে জাতিভেদপ্রথা আর সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব বাড়তি-মাত্রা সংযোজিত করেছে। কিন্তু ভারতে শ্রেণীশোষণের সঙ্গে ধর্ম কীভাবে জড়িয়ে রয়েছে সে ব্যাপারে ঠিকমতো ভাবাই হয়নি। মন্ত্রীপন্থী কমিউনিস্টরা অতীতে 'সেকুলারিজম'-এর পক্ষে কোনো কথা বলেননি. এতে তাঁদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৈন্যই প্রকাশ পায়।

'তৃতীয় ধারার' রাজনীতিকরা নিজেদের 'গ্রুপ অস্তিত্ব' বজায় রাখার জন্য নিজেরাই 'কাস্ট-ইজম'-এ ভুগছেন। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদপ্রথা [ব্যাপক অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে হিন্দু-ধর্মান্ধতার প্রভাবে 'ঈগালিটারিয়ান' বা সমতাবাদী ইসলামের অনগামীদের মধ্যেও

এক ধরনের জাতিভেদপ্রথা বা বৈষম্যমূলক এক সামাজিক স্তর-বিন্যাস সংক্রামিত হয়। যোগেন্দ্র সিং দেখিয়েছেন অতীতে ভারতের মুসলমান সমাজে 'অস্পৃশ্য ভাঙ্গীদের' মসজিদে ঢুকতে দেওয়া হোতো না। (Yogendra Singh. Modernization of Indian Tradition. Faridabad 1977. p. 74) উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে 'আসরাফ-আতরাফ' অর্থাৎ 'ভদ্রলোক-ছোটলোক' বিভাগ বর্তমান ছিল। আমরাও মুর্শিদাবাদের গ্রামে 'শেখ', 'সৈয়দ', 'পাঠান', 'জোলা' ইত্যাদি বিভাজন লক্ষ করেছি। উল্লেখ করা উচিৎ নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই অনেক ক্ষেত্রে এক 'সহজীয়া ইসলাম' গ্রহণ করেছিলেন।] ইত্যাদি একান্তভাবে ভারতীয় সমস্যাগুলির প্রশ্নে তাঁদের কোনো স্পষ্ট দিগ্‌দর্শন আছে ব'লে মনে হয় না। তথাপি, শেষ কথার কথাটি হোলো, ভারতে সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী ব্যক্তিদের গণআন্দোলনের পাশাপাশি 'সেকুলারিজম'-এর বার্তা প্রচারের ঐতিহাসিক দায়িত্বও নিতে হবে।

টীকা

১। ভারতের সমাজের মতো 'কাস্ট সোসাইটিতে' 'সোস্যাল মোবিলিটির' ওপর ভিত্তি ক'রেই অধ্যাপক শ্রীনিবাস তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'স্যান্স্‌ক্রিটাইজেশন'-এর তত্ত্ব গ'ড়ে তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, নিচুজাতির মানুষ উচ্চজাতিব আচাব-ব্যবহার-সংস্কৃতি-জীবনধারা অনুকরণ করে এবং দু'চার পুরুষের মধ্যে উচ্চজাতি রূপে পরিগণিত হয়। ভারতীয় সমাজে এই প্রবণতা প্রথম লক্ষ করেন ম্যাক্স হেবর। শ্রীনিবাসের তত্ত্বের পক্ষে তথ্য পাওয়া যায়, যদিও 'স্যান্স্‌ক্রিটাইজেশন' কিন্তু ভারতের সমাজের প্রধান ধারা নয়। এই তত্ত্বকে আমাদের সমাজ-ইতিহাসের 'নন্‌-ডায়ালেক্‌টিক্যাল' ব্যাখ্যা ব'লে মনে হয়।

২। 'হিন্দুধর্ম' ধারণাটি আলোচনার দাবি রাখে। 'হিন্দু' শব্দটি আরবদের অবদান (৮ম শতাব্দী)। আরবরা সমগ্র উপমহাদেশের নাম দিয়েছিল 'আল হিন্দ্‌'। শব্দটি এসেছিল গ্রীক শব্দ 'ইন্দাস' ও পারস্য শব্দ 'সিন্ধু' থেকে। আসলে ইরাণীরা সংস্কৃত শব্দ 'সিন্ধু'কে 'হিন্দু'তে রূপান্তরিত করেছিল। 'সিন্ধু'র 'S' তাদের উচ্চারণে 'H' হয়ে গিয়েছিল। সিন্ধুনদের সমীপবর্তী অঞ্চলকে তারা তাই 'Hindush' বলতো। গ্রীকরা এই শব্দটি ধার ক'রে সিন্ধুনদের নাম দেয় 'Indus'! এই 'ইন্দুস' বা 'Indus' থেকেই 'India'-ব উৎপত্তি। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় ইরাণীদের উচ্চারিত 'Hindush' শব্দ থেকেই 'হিন্দুস্তান' শব্দটির উদ্ভব এবং এখানকার অধিবাসীরা তাই 'হিন্দু' আর এদের ধর্ম 'হিন্দুধর্ম'। এর আগে ভারতে ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ইত্যাদি সম্প্রদায়; এরা সকলেই আরবদের চোখে 'হিন্দু' নামে পরিগণিত হয়েছিল।
উনিশ শতকে 'আর্য ধর্ম' বা 'সনাতন ধর্ম' কথাটির বহুল প্রচার হয়। পরাধীন ভারতীয়রা পরাধীনতার গ্লানি ভুলবার জন্য গৌরবময় অতীত অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। এর ফলে প্রাচীন আর্যযুগ এবং বেদ আর উপনিষদ তাঁদের প্রিয়তর হয়ে ওঠে।
আসলে আর্যরা যুদ্ধ বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা অসুরবিজয়ী ইন্দ্র (ইন্দ্র-র অন্য নাম 'পুরন্দর'; অর্থাৎ দুর্গ-নগর ধ্বংসকারী), অগ্নি, সূর্য, বরুণ, উষা ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি আর মৃত্যুব দেবতা যম ইত্যাদি 'দেবতার' পুজো করতো। আজকের প্রচলিত হিন্দুধর্মে এইসব 'দেবতার' অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অন্যদিকে, ভারতের আদি অধিবাসী অর্থাৎ অনার্যরা ছিল মাতৃপূজক, এরা ষাঁড়ের পুজোও করতো, যেখানে আর্যরা ছিল গো-খাদক। সিন্ধুসভ্যতার মানুষরা 'পশুপতি

শিব'-এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন কোনো দেবতার পুজো করতো একথাও ঐতিহাসিকরা জানিয়েছেন। বর্তমানে শিবলিঙ্গ পুজো করার রীতিও অনার্যদের অবদান।

বর্ণবিভাগ চালু হবার পর শূদ্ররা নিজস্ব দেবতার পুজো শুরু করে। কঠোর বিধিনিষেধ সত্ত্বেও আর্য-অনার্যর মিশ্রণ একেবারে রোধ করা যায়নি। উচ্চবর্ণ আর শূদ্রের মধ্যে বিবাহও হোতো, যেমন মহাকাব্যের যুগে আমরা দেখি রাজা দশরথের কনিষ্ঠা পত্নী সুমিত্রা ছিলেন শূদ্রা। বর্ণসঙ্করের ফলে 'আর্যধর্ম' আর 'অনার্যধর্ম' পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে। পরবর্তীকালে বেদভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য উপাসনার পদ্ধতি আর উপনিষদের নিরস দর্শন সাধারণ মানুষকে 'লোকধর্মের' প্রতি আকৃষ্ট করে। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীরা হিন্দুধর্মের 'গ্রেট ট্র্যাডিশন' আর 'লিট্‌ল্ ট্র্যাডিশন' এর কথা বলেছেন। দ্বিতীয়টি যদি লোকধর্ম হয়, প্রথমটি তাহলে এলিটশ্রেণীর ধর্ম। নিয়মিত 'গীতা পাঠ'কে আমরা 'গ্রেট ট্র্যাডিশন'-এর চর্চা বলতে পারি, আর মনসা বা শীতলা পুজোকে বলতে পারি 'লিট্‌ল্ ট্র্যাডিশন' এর ধারা। আমাদের ধারণা, সেই প্রাচীন যুগেই 'গ্রেট ট্র্যাডিশন' আর 'লিটল্ ট্র্যাডিশন' এর উদ্ভব হয়েছিল। আজও এই দু'টি ধারার মধ্যেকার পার্থক্য ও পারস্পরিক প্রভাবের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধর্মের 'গ্রেট ট্র্যাডিশন' আর 'লিট্‌ল্ ট্র্যাডিশন' পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণশ্রেণীই কিন্তু প্রচলিত ধর্মমতে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

উনিশ শতকে মুখ্যত ইউরোপিয়ান পণ্ডিতরা (orientalist) প্রাচীন ভারতে 'আলোকপাত' করেন। এর ফলে 'সনাতন ধর্ম', 'আর্য ধর্ম', বা 'হিন্দু ধর্ম' সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরে এক গৌরব আর মমত্ববোধ জেগে ওঠে। 'আর্যধর্ম' প্রীতি এঁদের এতদূর আচ্ছন্ন করে যে--- রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালিরা-- বাল্যবিবাহ ও জাতিপ্রথাকে সরবে সমর্থন জানান। উত্তর ভারতে দয়ানন্দ 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৭৫ সালে। পরবর্তীকালে 'হিন্দুবোধ' গভীরভাবে প্রভাবিত করে রাজনীতিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই 'আর্যপ্রীতির' বাড়াবাড়ি দেখে লিখেছিলেন--- "মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য'/সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,/মোরা বড় ব'লে করেছি ধার্য,/আরামে পড়েছি শুয়ে।/মনু না-কি ছিল আধ্যাত্মিক,/আমরাও তাই করিয়াছি ঠিক,/এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্,/শাপ দি' পইতে ছুঁয়ে।"

বস্তুতপক্ষে আজকের হিন্দুধর্ম একটা বিশাল অচলায়তন। বিদেশে খাতির পাওয়া বেদজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণ, বেলুড় মঠে পায়েস-ভক্ষণকারী যুবক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, গো-মাতার রক্ষাকর্তা বিনোবা ভাবে, সাঁইবাবা শিষ্যা, 'ফিল্মী দেবতা' সন্তোষীমাতার পূজারিণী অত্যাধুনিকা রমণী, হনুমানজীর ভক্ত ব্যারাকপুর রেলস্টেশনের বিহারী কুলি, অথবা 'ওলাওঠার দেবতা' ওলাদেবীর পূজক নিরন্ন নিরক্ষর নিম্নজাতির কৃষক- এরা সকলেই হিন্দু। সকলেই 'হিন্দুধর্ম' অনুশীলন করছেন।

(৩) আর্যসমাজে বর্ণসঙ্কর প্রতিরোধ করার জন্য অধিক মাত্রায় সচেতনতা থাকলেও বিভিন্ন সামাজিক কারণে 'প্রতিলোম বিবাহ' (অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পত্নী ও নিম্নবর্ণের পতি) ঘটতো। এছাড়া ছিল অবৈধভাবে জাত মানুষরা, এরাই হোলো 'অন্ত্যজ' বা সমাজ-বহির্ভূত পঞ্চম বর্ণের হীন মানুষ (অন্তবাসীন)। "শূদ্র কর্তৃক বৈশ্যাগর্ভজ সন্তান 'আয়োগব', ক্ষত্রিয়া-গর্ভসম্ভূত সন্তান 'ক্ষত্তা', এবং ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত তনয় নরাধম 'চণ্ডাল' আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।"--- মনুসংহিতা

(৪) উল্লেখ করা যেতে পারে— সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় রুশ মহাকাশচারীদের আর্দালি হিসেবে যখন রাকেশ শর্মাকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল, তখন তাঁর 'কল্যাণ কামনায়' ক্ষান্তিবিহীন 'হনুমান পুজো' হয়েছিল। আবার অন্যদিকে 'বাবরি মসজিদ' অথবা 'রামজন্মভূমি' নিয়ে সাম্প্রদায়িক হিন্দু-মুসলমানদের দ্বন্দ্ব— সমগ্র জাতিকে বৃহত্তর ক্ষতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, শাসকরা নীরব। ধন্য ভারতের 'সেকুলারিজম'।

(৫) প্রচলিত ধারণা অনুসারে আধুনিক ভারতের প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন রায় জাতিপ্রথাবিরোধী-আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন | অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'জাতিভেদপ্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ', কোলকাতা ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫; এবং সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়; 'রামমোহন ও জাতিভেদপ্রথা'— দেবী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা) 'জাতিভেদ বনাম প্রগতি'; কোলকাতা ১৯৮৩ ||। রামমোহন রায় জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি এমন নয়। কিন্তু তাঁর চরিত্র, বক্তব্য, বা রচনার অসংখ্য স্ববিরোধিতার মতো— জাতিপ্রথা প্রসঙ্গেও আমরা তাঁর স্ববিরোধিতা লক্ষ করি। ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হবার পর 'সমাজের' 'পার্শ্বগৃহে' 'হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ' উপনিষদ পাঠ করতেন, সেখানে শূদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮৪২ সাল পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। | দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; আত্মজীবনী (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত); কোলকাতা ১৯৬২; পৃষ্ঠা ৩১ ||। অথচ অনেকেই রামমোহন বা 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর সঙ্গে জাতিপ্রথাবিরোধিতাকে জড়িয়েছেন।

(৬) "ভট্টাচার্য মহাশয়... বলিলেন, তোদের জেতে কে আবার কবে পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে... কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখছেন ভট্চায মশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হ'তে চায়... কাঙালী আর প্রার্থনা করিলো না... নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলো। নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইলো। রাখালের মা— কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিলো। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিলো।" | অভাগীর স্বর্গ (১৯২৬) ||।

(৭) "জার্মানীর ব্রুনো যখন ঘোষণা করলেন পৃথিবী বিশ্বের মধ্যস্থলে অবস্থিত নয়, তখন তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। মধ্যযুগে বিশ্ব বলতে আমাদের সৌরমণ্ডলকেই বোঝানো হোতো। বাইবেলের ঘোষণা অনুসারে অর্থাৎ পাদ্রীদের উক্তি অনুসারে বিশ্বের মধ্যস্থলে রয়েছে পৃথিবী; এবং পৃথিবী থেকে স্বর্গে যাবার যে দ্বার— তার চাবি রয়েছে তাদেরই হাতে। ব্রুনো যুক্তি সহকারে একথা খণ্ডন করলেও পাদ্রীরা তাঁর যুক্তি অগ্রাহ্য করে এবং তাঁকে হত্যা করে।"

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা ক'রে বলেন, "যাঁরা অন্ধভাবে তাদের সামাজিক সংস্কার অস্পৃশ্যতা মেনে চলে তারা বিহারের একটি বিশেষ অঞ্চলে— ঈশ্বরের সর্বগ্রাসী অসন্তোষ প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত— ঈশ্বরের অভিশাপ ডেকে এনেছে ব'লে মহাত্মা গান্ধী যে অভিযোগ করেছেন তার জন্য অত্যন্ত মর্মাহত ও বিস্মিত হয়েছি... এ সম্পর্কে যা সত্য-সত্যই দুঃখের তা হোলো, বিশ্বজাগতিক দুর্ঘটনার সুযোগ গ্রহণ ক'রে মহাত্মাজী যে ধরনের যুক্তি ব্যবহার করেছেন, তা তাঁর নিজের অপেক্ষা তাঁর বিরোধীপক্ষের মানসভঙ্গিরই অনুকূল; এবং এই দৈবক্রোধের অভিপ্রকাশের জন্য তারা যদি তাঁকে এবং তাঁর অনুগামীদের অভিযুক্ত করতো তাহলে আমি বিস্মিত হতাম

না.... আমবা. .. গভীর মর্মপীড়া অনুভব করি যখন দেখি যে তাঁরই [মহাত্মার] মুখনিঃসৃত কোনো কথা.... স্বদেশবাসীরই মনে কোনোরূপে অযৌক্তিকতা পোষণে সাহায্য করে; কারণ যে-সব অন্ধতা— আমাদের স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের বিরুদ্ধে পরিচালনা করে, অযৌক্তিকতাই হোলো তাদের মৌল উৎস।"

৮। লক্ষণীয়, গান্ধী অস্পৃশ্যতার প্রসঙ্গে মধ্যযুগের প্রগতিশীল উদারনৈতিক লোকধর্মের শাস্ত্র তথা জাতিপ্রথাবিরোধী-চরিত্রের কথা একবারও বলেননি। বোধহয়, এর কারণ— তাঁর আরাধ্য, 'রামধুন'-এর 'শ্রীরাম' তাঁর প্রিয়-মিতা গুহক চণ্ডালের কাছ থেকে ফলমূলও গ্রহণ করেননি। কারণ গুহক ছিলেন শূদ্র, চণ্ডাল— তাই 'উনমানব', অর্থাৎ মনুষ্যেতর। মধ্যযুগের কবি বলেছিলেন, "চণ্ডালেতে রাঁধে ভাত, ব্রাহ্মণেতে খায়/এমন সুধন্য দেশ, জাত নাহি যায়।" আর হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ী সাধনার ধারার প্রতিষ্ঠানবিরোধী সাধক বলেছিলেন, "হে মুল্লা, ধর্মস্থানে থাকে সব দস্যু, ঠাকুরদ্বারায় (দেবমন্দিরে) থাকে সব ঠগ, মসজিদের মধ্যে বসিয়া আছে সব বদমায়েস; প্রেমময় আছেন এ সকলের বাহিরে।" সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মহাশয় রামমোহনকে 'সমন্বয় ঐতিহ্যের এক মহৎ উদ্ভাস' রূপে বর্ণনা করেছেন (দেশ, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামমোহনও তাঁর 'সমন্বয় সাধনায়' মধ্যযুগের সমন্বয়ী সাধনার ধারার উল্লেখ করেননি, যে ধর্ম ছিল মানুষের কাছে, মাটির কাছে; যা প্রকৃত সমন্বয়— রামমোহনের ধর্মের মতো এলিট-ঘেঁষা 'আধুনিক ধর্ম' নয়। মধ্যযুগের 'সমন্বয়ী ধর্ম' উনিশ শতকে গতিময়তা লাভ করলে হয়তো 'রাজনৈতিক ইসলাম' আর 'রাজনৈতিক হিন্দুত্বের' বিস্তারের প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হোতো।

তথ্যসূত্র

১। M. J. Akbar. The Senseless Intolerance of Caste Hindus. Sunday. 22.3.1981.
২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩.৩.১৯৮৩
৩। রথীন দাশগুপ্ত; প্রকৃতি মানুষ ধর্ম শোষণ; কোলকাতা ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৯১

যে সব গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য নিয়েছি—

B. R. Ambedkar. The Untouchables. New Delhi 1948.
রোমিলা থাপাব; ভারতবর্ষের ইতিহাস (অনুবাদ— কৃষ্ণা গুপ্ত); কোলকাতা ১৯৮০
Ronald Segal; The Crisis of India. Bombay 1971.
নির্মল কুমার বসু (সঙ্কলিত); গান্ধী রচনা সঙ্কলন; ব্যারাকপুর ১৯৬৬
ভারত সরকার পাবলিকেশন্স্ ডিভিশন; 'ঈশ্বরের চোখে সকলেই সমান' (মহাত্মা গান্ধীর বাণী সঙ্কলন); ১৯৬৮
J. H. Hutton. Caste in India. Bombay 1961.
Nripendra Kumar Dutt. Origin and Growth of Caste in India. Calcutta 1930.
G. S. Ghurye. Caste and Class in India. Bombay 1957.
D. E. Smith. India As a Secular State. Princeton 1963.
সুকুমারী ভট্টাচার্য; রামায়ণ ও মহাভারতঃ আনুপাতিক জনপ্রিয়তা; কোলকাতা ১৯৯৬

[অনীক; বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৬]

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে হিন্দু জাতিভেদপ্রথা

প্রচলিত অর্থে যাকে রাজনীতিক বলা হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে রাজনীতিক ছিলেন না। কিন্তু যে-কোনো যুগে, যে-কোনো সমাজে কোনো মানুষই রাজনীতি-নিরপেক্ষ হ'তে পারে না। মানুষ প্রগতিশীল, চলিষ্ণু, আবহমান কাল থেকেই ক্রান্তিপথের পথিক। তার বিরামহীন যাত্রা সামনের দিকে, স্থিতাবস্থার বিপরীতে— পরিবর্তনের পক্ষে। এই প্রগতিকে যাঁরা বাধা দেবার চেষ্টা করেন— ইতিহাসে তাঁরা ধিকৃত হন, বর্জিত হন। মানুষের সৃষ্টিকর্ম তার পরিচয় বহন করে। তাই রবীন্দ্র-জগতেই বিধৃত রয়েছে রবীন্দ্র-পরিচয়। তাঁর সুবিশাল সৃষ্টিকর্ম আর বিপুল কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞান। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— "পরাধীন, নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, ভিক্ষাজীবীর শ্রেণী যদি ভারতীয় সমাজ-বহির্ভূত না-হয়, যদি তাদের প্রাণবান না-করা পর্যন্ত ধর্মসাধনা অপূর্ণ থাকে, যদি তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ আনা পলিটিক্সের প্রাণবস্তু হয়, তবে নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ পলিটিশিয়ান....!"

হিন্দু-জাতিভেদপ্রথার মতো একটি সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা বা এর উল্লেখ 'পলিটিশিয়ান' রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা বা কবিতায় বিরল নয়। তরুণ রবীন্দ্রনাথ সমকালের নব-হিন্দুবাদের প্রভাবে প্রভাবিত— নিষ্ঠাবান হিন্দু-ধার্মিক। অথচ পরবর্তীকালে তিনিই হিন্দুধর্ম-আশ্রয়ী কুশ্রী-লোকাচারের সরব-সমালোচক— মানবধর্মের জয়গানের পক্ষে প্রগতির পুরোহিত। তাই প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় রাজনীতি না-করলেও জীবনের এক পর্বে রবীন্দ্রনাথ গোঁড়া হিন্দু, জাতিভেদপ্রথার সমর্থক; উত্তরকালে বিশ্বমানবতার উদ্বোধক। গোলাম মুরশিদ দেখিয়েছেন— ১৮৯২-'৯৩ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সূক্ষ্ম হিন্দুত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রভাব থেকে মুক্ত হন ও একটি উদার মানবিক ধর্মপথের যাত্রী হন। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে হঠাৎই তিনি প্রাচীন ভারত তথা বদ্ধমূল হিন্দুত্বের পক্ষ অবলম্বন করেন। এ-সময় তিনি হিন্দু-বর্ণাশ্রম ধর্মের ভক্ত হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের মতে তৎকালের অবক্ষয়ের কারণ শাশ্বত ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অভাব। ১৯০২ সালে ব্রজেন্দ্রকুমার দেবমাণিক্যকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লেখেন— "ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে— দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি।" এর প্রতিকারে, "আমি ব্রাহ্মণ-আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।" একই সময়ে ব্রজেন্দ্রকুমারকে লেখা অপর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন— "আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র ও নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই.. . বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হন। এই সময় তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধ্বজাধারী কট্টর হিন্দু; প্রগতিবিরোধী রাজনীতির প্রবক্তা। সমকালে তাঁর এই চিন্তা অর্থহীন-সংস্কারে কত দূর আচ্ছন্ন

হয়ে পড়ে তা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা থেকে বোঝা যায়। ১৯০২ সালেব শেষের দিকে শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে কায়স্থ জাতিব কুঞ্জলাল ঘোষ শিক্ষকের কর্মভার নিয়ে যোগ দেন। জাতিভেদের আখড়া এই বিদ্যালয়ে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে এক বিতর্ক উপস্থিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে চিঠি লেখেন, তা আমাদের স্তম্ভিত ক'রে দেয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন— "প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজ-বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে— ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ-অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শ-পূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই শ্রেয।" এই চিঠিটির ছত্রে ছত্রে এক ধর্মান্ধ, মূঢ়, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে অপমান করার, মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করার এক প্রগতিবিরোধী রাজনীতি প্রচারে উদ্যোগী।

একই সময়ে রচিত 'নববর্ষ' নিবন্ধে রবীন্দ্রপ্রতিভা প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম, ধর্ম ও জাতিভেদপ্রথার জয়গানে মুখর। এখানেও রবীন্দ্রনাথ প্রগতিবিরোধী। তৎকালে বহুচর্চিত শাশ্বত ভারতের এক সুবর্ণ যুগের বন্দনায় প্রকৃত সত্য বিস্মৃত— "ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ শ্রেণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট বলিয়াই উচ্চশ্রেণীয়েরা নিজেব স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীকে লাঞ্ছিত কবিয়া বহিষ্কৃত করে না। ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগদী দাদা আছে। শান্তিটুকু অবিতর্কে রক্ষিত হয় বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত, মানুষে মানুষে হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধাহীন হইয়া ওঠে— বড়দের আত্মীয়তার ভার ছোটদের হাড়গোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না। পৃথিবীতে যদি ছোট বড়র অসাম্য অবশ্যম্ভাবীই হয়, যদি স্বভাবতই সর্বত্রই সকল প্রকার ছোটর সংখ্যাই অধিক ও বড়র সংখ্যা স্বল্প হয়, তবে সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভাবতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকাব কবিতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথ এই রচনায় বর্ণভেদ জাতিভেদ ও অর্থনৈতিক অসাম্যভিত্তিক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। অথচ সনাতন ভারতীয় সমাজের বর্ণ জাতি ও শ্রেণীভেদ, যে দুঃসহ বোঝা নিম্নবর্ণের নিম্নজাতির ও দরিদ্র মানুষের ওপব চাপিযে দিয়েছে— যার সূচনা সেই 'গৌরবময় আর্যযুগে' তার সমতুল্য অনাচার অত্যাচার বিশ্বইতিহাসে বিরল। 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন 'হিন্দু আদর্শের' গুণগান ক'রে লেখেন— "হিন্দুসভ্যতা উচ্চ-নিচ, সবর্ণ-অসবর্ণ— সকলকেই ঘনিষ্ঠ কবিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।" এই রচনায় রবীন্দ্রনাথ জাতিভেদে-জর্জরিত হিন্দুসমাজের 'মাহাত্ম্য' প্রচার কবেন।

আমাদের সৌভাগ্য, অতি শীঘ্রই জাতিপ্রথা সম্পর্কে রবীন্দ্রদৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে। জীবনের এক পর্বে জাতিপ্রথা প্রসঙ্গে প্রগতিবিরোধী রাজনীতির প্রবক্তা হ'লেও অচিরেই রবীন্দ্রনাথের মুক্তদৃষ্টির উন্মেষ হয়। তাঁর মনোভঙ্গির এই পরিবর্তনের সূচনা হয় স্বদেশী যুগেই। রবীন্দ্র-প্রতিভা মুক্তির দিশা খুঁজে পায় পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি মানুষ ও সমাজ দেখে। বাঙলার পল্লীগ্রামে 'সভ্যতার পিলসুজ'-এর অত্যাচারিত ও পীড়িত জীবনযাত্রা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানব দেবতা' প্রত্যক্ষ করেন— "আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম, সেখানে নমঃশূদ্রদের

ক্ষেত্র— অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না। বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। আমাদের ধর্মই আমাদের প্রকৃতির নিচে নামিয়া অন্যায়ে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শুভবুদ্ধির নাম লইয়া দেশের নরনারীকে শত শত বৎসর ধরিয়া এমন নির্দয়ভাবে এমন অন্ধ মূঢ়ের মতো পীড়ন করিয়া চলিয়াছি।''

১৯১১ সালে 'ধর্মের নবযুগ' নিবন্ধে তিনি লেখেন— ''ধর্মের সংস্কারকে সঙ্কীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মতো মানুষকে চাপিয়া ধরে— মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না।''

একই সময়ে লেখা 'ধর্মের অধিকার' শীর্ষক রচনায় আমরা দেখি জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে রবি-কণ্ঠের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ— ''আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্মশাসন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে— পূর্ণসত্যে তোমার অধিকার নাই; অসম্পূর্ণেই তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকো। কত শত লোক পিতা-পিতামহ ধরিয়া এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে— মন্ত্রে তোমাদের দরকার নাই, পূজায় তোমাদের প্রয়োজন নাই, দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশ নাই... তোমরা স্থূলকে লইয়াই থাকো, চিত্তকে অধিক উচ্চে তুলিতে হইবে না, যেখানে আছো ওইখানে নিচে পড়িয়া থাকিয়াই সহজে তোমরা ধর্মের ফললাভ করিতে পারিবে।'' একই রচনায় রবীন্দ্রনাথ নিম্নবর্ণের মানুষের হীনাবস্থার জন্য সরাসরি লোকসমাজকে দায়ী করেন— ''তুমি লোকসমাজ, তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পারো না, কত তোমার পরাভব, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন— তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্মের নামে গিল্‌টি করিয়া ধর্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও। তাহাই করিয়া আজ শত শত বৎসর ধরিয়া এত বড় একটি সমগ্র জাতিকে তুমি মর্মে মর্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকূপের মতো পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছো— তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখো নাই। যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য, যাহা অবিশ্বাস্য— তাহাকেও দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কী প্রকাণ্ড, কী অসঙ্গত, কী অসংলগ্ন জঞ্জালের বোঝা মানুষের মাথার উপরে আজ শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছো। সেই ভগ্ন-মেরুদণ্ড নিষ্পেষিত-পৌরুষ নতমস্তক-মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর কোথাও নাই— কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছে; চারিদিক হইতেই আকাশে তর্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পুরুষ-কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে— যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও, কেননা তুমি মূঢ় তুমি বুঝিবে না; যাহা পাঁচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেননা তুমি অক্ষম। নিষেধ-জর্জরিত চিরকাপুরুষ নির্মাণ করিবার এত বড় সর্বদেশ ব্যাপী ভয়ঙ্কর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে— এবং সেই মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে?''

'জীবন দেবতা'র বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ এই রচনায় সোচ্চার, মানবতার জয়গান তাঁর কণ্ঠে; জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিনিবদ্ধ-প্রতিবাদ দৃপ্ত হয় এই রচনায়।

রবীন্দ্রনাথ জাতিপ্রথার অসারতা, অর্থহীন শাস্ত্রবাক্য, আর অপরিসীম মূঢ়তা-পরিকীর্ণ অন্ধ-

লোকাচারের জগদ্দল পাথরের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেন 'ধর্মের অধিকার' নিবন্ধে— ''রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল— সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য সেই দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে— তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না। এই আচরণের মধ্যে যে পরিমাণ অতি-অসহ্য মানব-ঘৃণা আছে, তত পরিমাণ ঘৃণা কি যথার্থই আমাদের অন্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান?''

এই অন্তহীন কুসংস্কার আর ধর্মান্ধ লোকাচারে জরাগ্রস্ত হিন্দুসমাজের নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন উত্থাপন করেন ভিন্নধারার গদ্যনাটক 'অচলায়তন'-এ। ১৯১১ সালের এই নাটকে তিনি ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লেখেন—

পঞ্চক ঃ	আচ্ছা, না-হয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ্য হয়— কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস!
প্রথম শোনপাংশু ঃ	করি বইকি।
পঞ্চক ঃ	কাঁকুড়! ছি ছি। খেসারি ডালেরও চাষ করিস বুঝি!
তৃতীয় শোনপাংশু ঃ	কেন করবো না! এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেসারি ডাল তোমাদের বাজারে চ'লে যায়।
পঞ্চক ঃ	তা তো যায়, কিন্তু জানিসনে কাঁকুড় আর খেসারি ডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই না।
প্রথম শোনপাংশু ঃ	কেন?
পঞ্চক ঃ	কেন কী রে? ওটা যে নিষেধ!
প্রথম শোনপাংশু ঃ	কেন নিষেধ?
পঞ্চক ঃ	শোনো একবার। নিষেধ, তার আবার কেন কী? সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ! এই সহজ কথাটা বুঝিসনে যে কাঁকুড় আর খেসারি ডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।
দ্বিতীয় শোনপাংশু ঃ	কেন? ওটা কি তোমরা খাও না?
পঞ্চক ঃ	খাই বইকি, খুব আদর ক'রে খাই— কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াইনে।
দ্বিতীয় শোনপাংশু ঃ	কেন?
পঞ্চক ঃ	ফের কেন? তোরা যে এত বড় নিরেট মূর্খ তা জানতুম না!'

রবীন্দ্রনাথের এই রচনার পরেও বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে— কিন্তু হিন্দু-অচলায়তনে বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি। এই বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২১ সালের 'ভারতীয় স্ট্যাটুটারি কমিশন'-এর এক রিপোর্টে। এই রিপোর্ট হিন্দুসমাজের নিম্নতম মানুষ অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে বলে— এরা হিন্দুসমাজের 'ট্র্যাডিশন' অনুসারে নিম্নতম জাতি; হিন্দু হ'লেও এবা অস্পৃশ্য রূপে গণ্য হয়; উচ্চজাতির হিন্দুরা এদের স্পৃষ্ট অন্ন-জল গ্রহণ করে না। দেবালয়ে

এদের প্রবেশ নিষেধ। এরা অর্থনৈতিকক্ষেত্র ও শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে নিচের তলায় রয়েছে। এরা একটি স্বতন্ত্র পল্লীতে বাস করে, উচ্চজাতির অস্পৃশ্য খাদ্য খায়, আর চরম অসম্মানের মধ্যে দিন কাটায়। এই অমানবিক ও অনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ মানবতার বিজয় ঘোষণা করেন।

১৯২১ সালের 'স্ট্যাটুটারি কমিশন'-এর রিপোর্ট প্রকাশ পাবার বছর দশেক পর ধূর্ত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ১৯৩২ সালের 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' মারফৎ হিন্দু-অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার সুপারিশ করে। গান্ধীজী এই প্রস্তাবে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন— এই ব্যবস্থা হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত করবে। জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার তত্ত্ব অর্থাৎ বর্ণধর্মের বিরুদ্ধে একটি কথা না বললেও গান্ধীজী অস্পৃশ্য-সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদকর ও বর্ণহিন্দু-সম্প্রদায়ের নেতাদের একমতে আনার জন্য আমরণ অনশন শুরু করেন। রবীন্দ্র-লেখনী এই সময় নীরব থাকেনি। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে, জাতিপ্রথা ও বর্ণভেদের প্রশ্নে— তিনি ধর্মাচারীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "জাতিভেদ সম্প্রদায়ভেদ ও ধর্মভেদ প্রেমের মধ্যে অতিক্রম ক'রে সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ সখ্যের সহযোগিতায় মিলিয়ে দিন তাঁরা।"

গান্ধীজীর মতো প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার না-করলেও জাতিভেদ-প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অনেক বেশি বাস্তবমুখী ও প্রগতিশীল। ১৯৩২ সালে বিশ্বভারতীতে এক 'সংস্কার সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়—

(১) কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিবো না, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিবো না। সকল জাতিকেই আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

(২) সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান, ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

(৩) বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভাসমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।

(৪) কাহারও জাতি লক্ষ করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায়-ব্যবস্থা সমাজে থাকিবে না।

রবীন্দ্র-মননের পরবর্তী উদ্ভাস 'শুচি' কবিতা। আর, এর কয়েক মাস পর লেখা হয় গদ্যনাটক 'চণ্ডালিকা'— সৃষ্টি হয় চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি। আরও কয়েক বছর পর, ১৯৩৭ সালে রচিত 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের প্রকৃতি তার দুর্ভাগ্যের জন্য সরাসরি অভিযুক্ত করে বিধাতাকে; কাব্য হ'লেও উদ্ধৃত করা উচিৎ কয়েকটি অমোঘ পংক্তি— "যে আমারে পাঠালে এই অপমানের অন্ধকারে/পূজিব না, পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে, পূজিব না/কেন দেবো ফুল, কেন দেবো ফুল,/কেন দেবো ফুল আমি তারে—/যে আমারে চিরজীবন রেখে দিলো এই ধিক্কারে।"

'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাটের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অর্থহীন 'হরিজন ভজনার' তুলনায় অনেক অগ্রসর। তথাকথিত রাজনীতিক না-হয়েও সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতৃবর্গের চেয়ে জাতিভেদ-প্রশ্নে তাঁর প্রত্যয় অনেক বলিষ্ঠ, অনেক স্পষ্ট, অনেক বেশি প্রগতির বার্তাবাহক।

স্বাধীন 'সেকুলার' ভারতে কাগজে-কলমে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হ'লেও— গান্ধীজীর

'হরিজনদের' পুড়িয়ে মাবার ঘটনা হামেশাই শোনা যায়। ধর্মভীরু রাষ্ট্র ও সমাজকর্তারা দেবতার শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ দেন নিয়মিত। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিদের কপালে জোটে নারীত্বের চরমতম অসম্মান আর লাঞ্ছনা। দু'চারজন আধুনিক চণ্ডাল মন্ত্রী হন। ভারতের গণতন্ত্র গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলে। কাপুরুষ বুদ্ধির কারবারীদের কলম— পুরস্কারের আশায় আত্মবিক্রয় করে, প্রকৃতিরা থাকেন সমাজের অন্ত্যে, লোকচক্ষুর আড়ালে! আবার তাই রবীন্দ্র-কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে বলি— "মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে।/ ঘৃণা করিয়াছো তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে/ বিধাতার রুদ্ররোষে/ দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে/ ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান/ অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

ভারতবর্ষের রুদ্র গণদেবতার জাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাসন্ন।

যে-সব রচনা থেকে বিশেষ সাহায্য নিয়েছি—

১। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী; কোলকাতা ১৯৮৭

২। গোলাম মুরশিদ : রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ ঃ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা; ঢাকা ১৯৮১

৩। শঙ্খ ঘোষ : ঐতিহ্যের বিস্তার; কোলকাতা ১৯৮৯

৪। শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় : জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা— মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা; অনীক, বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৬

৫। শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় : ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি; অনীক, বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৫

[উবুদশ ২০০১]

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও রাজনৈতিক ধর্ম

জর্জ বার্নাড শ গণতন্ত্রকে গ্যাসবেলুনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। গণতন্ত্ররূপী গ্যাসবেলুন যখন আকাশে ভেসে বেড়ায় তখন আপনি হাঁ ক'রে তাই দেখেন, আর সেই ফাঁকে অন্য লোক আপনার পকেট মারে।[১] বার্নাড শ বর্তমান ভারতের 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' দেখলে কী বলতেন তা একটা ভাবনার বিষয় বটে। আমরা এই ভাবনা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে 'স্বাধীন' ভারতের শাসক-এলিট-অনুসৃত 'রাজনৈতিক ধর্মের' প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করবো। বস্তুত, 'রাজনৈতিক ধর্মের' আলোচনায় 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে, কারণ আমাদের চিন্তা অনুসারে ভারতের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামোয় প্রথমটি দ্বিতীয়টির পরিপূরক; তাই বিচ্ছিন্নভাবে 'রাজনৈতিক ধর্মের' আলোচনার বিশেষ কোনো অর্থ হয় না।

'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর কথা বহুঘোষিত এবং বহুপ্রচারিত কিন্তু 'রাজনৈতিক ধর্ম' 'কনসেপ্টটি' রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় অধুনা উদ্ভুত। এর উদ্ভাবক ডেভিডই অ্যাপ্টার।[২] অ্যাপ্টার তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি গরিব দেশের ক্ষেত্রে তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন, ভারতবর্ষ যেখানে অনুপস্থিত; সম্ভবত এর কারণ অধিকাংশ বিদেশী পণ্ডিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ব'লে মনে করেন (কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার কথা যদিও অনেকে স্বীকারও করেন), এবং এঁদের মত অনুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মানেই সু-ব্যবস্থা।[৩] তাই ভারতবর্ষেও সু শাসনব্যবস্থা বজায় রয়েছে এবং গণতন্ত্র ক্রমশই হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠছে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কী? কোনো হিসেবনিকেশের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, সাড়ে তিন দশকের 'গণতান্ত্রিক' শাসনব্যবস্থায় গরিব মানুষ অনেক বেশি গরিব হয়েছেন, আর মুষ্টিমেয় ধনীরা আরও বেশি ধনী হয়েছেন। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে ভারতের অবস্থান নিচের দিকে। একথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান বাধা বর্তমান 'গণতান্ত্রিক' শাসনব্যবস্থা। তাই বার্নাড শ-এর অনুসরণে আমরাও বলতে পারি যে, ভারতবর্ষের আকাশেই বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাসবেলুনটি ভাসমান। এক টুকরো রুটির আশায় ভারতের হাভাতে ভোটাররা যখন প্রশংসনীয় ধৈর্যের সঙ্গে 'গ্যাসবেলুনটি' নিরীক্ষণ করছেন তখন 'মহানুভব শিল্পপতি' 'গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক' গোলগাল জোতদারবাবু আর 'সমাজবাদী' বাজেট— জনগণের পকেট মারছে। এই 'পকেট মারার' ন্যায়সঙ্গত অধিকারও 'স্বাধীন' ভারতের সংবিধানেই স্বীকার করা হয়েছে, আর তা করা হয়েছে 'গণতন্ত্রের' দোহাই দিয়েই।

ভারতের বর্তমান গণতন্ত্রের জনক 'স্বাধীন' ভারতের কাণ্ডারীরা নন, তাঁরা লালনকর্তা মাত্র। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পিতা আসলে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ। পণ্ডিতদের মধ্যে আজ আর

কোনো দ্বিমত নেই যে, 'স্বাধীন' ভারতের গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল মহামহিম ইংরেজ। ইংরেজের বিভিন্ন শাসনসংস্কারের স্বাভাবিক পরিণতি হোলো ভারতের বর্তমান গণতন্ত্র।[৪] এই গণতন্ত্র নতুন কোনো উদ্ভাবন নয়, এর পশ্চাতে রয়েছে একশো বছরের অভিজ্ঞতা।[৫] ভারতের গণতন্ত্রে মন্ত্রীসভার গঠন, প্রধানমন্ত্রিত্ব, রাজনৈতিক দলাদলি, বিরোধীপক্ষের অবস্থান— এ সমস্তই ব্রিটিশের একদা অভিভাকত্বের নিদর্শন।[৬] ভারতের বর্তমান গণতান্ত্রিক-শাসকদের অনুসৃত অনেক নীতির মূল নিহিত রয়েছে ইংরেজ আমলে।[৭] ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়করা ঘোষণা করেছেন যে, ভারতরাষ্ট্র বর্তমান 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' বা 'কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র'; এই 'কল্যাণব্রতী' দর্শনের কিছু কিছু কর্মসূচিও ইংরেজের অর্থনৈতিক নীতির থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।[৮]

প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ নিজেকে এবং তার শাসন-শোষণের প্রধান দুই স্তম্ভ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও সামন্তশ্রেণীকে তীব্র জনরোষ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে রক্ষা করার জন্য পরাধীন ভারতে এক নির্বাচনপ্রথা চালু করে। ব্রিটিশের সেই নাবালক পঙ্গু সন্তানই আজ 'স্বাধীন' ভারতের কাণ্ডারীদের সযত্ন প্রয়াসে 'স্ফীতোদর'-এ পরিণত হয়েছে। সি.আর.এম. রাও বলেছেন, "বৃহত্তম গণতন্ত্র— গণতন্ত্রের থেকে কিছু কম।"[৯] অবশ্য তিনি মনে করেন, এতে কিছু যায় আসে না! কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এতে অনেককিছুই যায় আসে। 'স্বাধীন' ভারতের লাঠি, গুলি, বিনাবিচারে আটক রাখার আইন, অথবা জেল-হত্যা— সবই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ধারাবাহিকতার নিদর্শন। ভারতের গণতন্ত্রের আড়ম্বর সত্ত্বেও একথা প্রতীয়মান যে, জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে কাশীপুর-বরানগর-কানপুর-বাইলাডিলার দূরত্ব বেশি নয়।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতের শাসক এলিট-সম্প্রদায় ব্রিটিশের পরিত্যক্ত নির্বাচনপ্রথাকে বিস্তৃত করে— ফলে ভোটাবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এত ভোটার পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা শাসকরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছেন ব'লে এই 'গণতন্ত্র' পুরোপুরি এলিট চরিত্রের।[১০] বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা ভোগের জন্য লালায়িত, তারা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ-বাঁটোয়ারা করার জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[১১] এই গণতন্ত্র তাই জনসাধারণের নূন্যতম চাহিদা মেটাতে অক্ষম। ব্রিটিশের তৈরি করা এই গণতন্ত্রে কিন্তু ক্ষুধার্ত, অজ্ঞ, অশিক্ষিত জনসাধারণের কোনো স্থান নেই। তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ হোলো কেবলমাত্র 'জনপ্রতিনিধি' নির্বাচন করা; অর্থাৎ— উদ্ধত, দুর্বিনীত, লোভী, স্বার্থপর, জনবিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তিকে বিধানসভা বা লোকসভায় পাঠানো। এক কথায়, ভারতের 'গণতন্ত্র' এক ভোটসর্বস্ব রাজনীতি। কিন্তু এই ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে ভোট দেন কতজন? সদ্য 'স্বাধীন' ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে (ডিসেম্বর ১৯৫১—ফেব্রুয়ারি ১৯৫২) ভোট দিয়েছিলেন শতকরা ৪৫.৬৭ জন ভোটার; দ্বিতীয় নির্বাচনে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৫৭) ভোটদাতার এই সংখ্যা বেড়ে হয় শতকরা ৪৭.৮৪ জন; তৃতীয় নির্বাচনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৬২) এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৫.৪২; চতুর্থ নির্বাচনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭) এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৬১.৩০; পঞ্চম নির্বাচনে (মার্চ ১৯৭১) ছিল শতকরা ৫৫.২৯ জন।[১২] এমন-কি ১৯৭৭ (মার্চ)-এর ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচনে অর্থাৎ যার মাধ্যমে ইন্দিরার পতন আর জনতার জয় তথা ভারতের

'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' জন্মলাভ করেছিল, তাতেও শতকরা ৬০.৫৪ জন ভোটার অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৩] সুতরাং ভারতের প্রায় অর্ধেক ভোটারের কাছে গণতন্ত্রের ঢক্কানিনাদ পৌঁছোয়ই না। আর শুধুমাত্র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাটাই যথেষ্ট নয়। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ নির্বাচনের পর গৃহীত এক হিসেবে দেখা যায় যে শতকরা ৭১ জন ভোটার নির্বাচন প্রসঙ্গে নিরুৎসাহ ছিলেন; নির্বাচনের ইস্যু সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণাই ছিল না। ভোটারদের মধ্যে যাঁরা নির্বাচনী হট্টগোলে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন অথবা কোনো প্রার্থীকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাও রাজনীতি-সচেতন ছিলেন না। তাঁরা এ কাজ করেছিলেন অরাজনৈতিক কারণে।[১৪] অন্যান্য নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণের কারণও এই তথ্য থেকেই অনুমান করা যায়।

সুতরাং যে গণতন্ত্রে বহু ভোটার অংশ নেন না, বা নিলেও অরাজনৈতিক কারণে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তাকে বৃহত্তম তো দূরের কথা, সঠিক অর্থে গণতন্ত্রই বলা যায় না। টিঙ্কার সাহেব পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করেছেন।[১৫] আমাদের মতে এই পার্থক্য মৌলিক। ভারতের হাভাতে ভোটারের মতোই ভারতের 'গণতন্ত্রও' অপুষ্ট এবং ক্লিষ্ট! প্রচলিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব নয় একথায় বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। বর্তমান শাসকদল ও দিল্লির গদির অন্যান্য দাবিদারদের প্রত্যেকেই প্রায় গান্ধীবাদী। মার্ক্সবাদের বিকল্প হিসেবে এঁরা গান্ধীবাদকে খাড়া করেছেন (যদিও গান্ধীর মধ্যযুগীয় অবাস্তব কুসংস্কারাচ্ছন্ন দর্শনকে হুবহু মেনে চলা এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়)। ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের তত্ত্বের মূল উৎস হোলো গান্ধীর চিন্তাভাবনা। একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে, গান্ধীর 'রামরাজ্যই' আজকের 'গণন্ত্রতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র'! নিঃসন্দেহে এর সবচেয়ে বড় প্রবক্তা বাপুর অফিসিয়াল উত্তরাধিকারী জহরলাল নেহরু, তাঁর কন্যা, এবং তাঁর দল।

ভারতের গণতন্ত্র যে ইংরেজের সৃষ্ট একথা আমরা আগেই বলেছি। এবার ভারতের সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এক অর্থে ভারতের সমাজতন্ত্রের স্রষ্টাও ব্রিটিশ-স্রাম্রাজ্যবাদ। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর মহাত্মা গান্ধীর স্নেহভাজন মানসপুত্র পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁর সোস্যালিস্ট ইমেজকে আরও বড় ক'রে তুলে ধরবার জন্য ভারতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে লাগেন। ১৯৫৪ সালে নেহরুর নেতৃত্বে শাসক কংগ্রেস দল ভারতের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। ১৯৫৯ সালে লোকসভার অধ্যক্ষ মহাশয় ভারতের নিজস্ব ট্র্যাডিশনের ওপর ভিত্তি ক'রে 'ডেমোক্রেটিক কমিউনিজম' গ'ড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের সঙ্গে সাম্যবাদের সমন্বয় করা যেতে পারে— এতে কোনো ক্ষতি নেই।[১৬] কিন্তু 'ডেমোক্রেটিক কমিউনিজম' শব্দযুগলকে কংগ্রেস মহল থেকে বেশি প্রচার করা হয়নি। এর পরিবর্তে কংগ্রেসনেতারা সমাজতন্ত্রের কথাই জোর দিয়ে বলেন। কমিউনিজম শব্দটিই অনেকের আতঙ্ক সৃষ্টি করে; অন্যদিকে কমিউনিজমের তুলনায় 'সমাজতন্ত্র' অনেক বেশি সহনীয়, কারণ বাপুই 'সমাজতন্ত্র' বা 'সোস্যালিজম' শব্দটিকে পপুলার ক'রে যান, যদিও তিনি 'অহিংস কমিউনিজম'-এর কথাও বলেছিলেন। তাই সদ্য 'স্বাধীন' ভারতে ইংরেজের উত্তরাধিকারী রাজনৈতিক এলিট সম্প্রদায় সম্ভবত ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদলের তাত্ত্বিক এবং

এটলি মন্ত্রীসভার সদস্য এফ. এম. ডারবিন সাহেবের ঝুলি থেকে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' ব্যাপারটি আত্মসাৎ করেন। ১৯৬৪ সালে কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর অধিবেশনে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর কথা ঘোষণা করা হয়। এসময় পণ্ডিত নেহরু শিল্পপতিদের এক সম্মেলনে বলেন যে, (ভারতে) সমাজতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে একই অর্থ বহন করে। এদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই[১৮]। এর আগেই ১৯৬২ সালে FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)-র এক সভায় জহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে, ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ (সমাজের পক্ষে) কল্যাণকর এবং ব্যক্তিমালিকানার সংকোচন (সমাজের পক্ষে) ক্ষতিকর।[১৯]

'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর প্রকৃত অর্থ হোলো গণতন্ত্রের (পুঁজি বৃদ্ধি করার অধিকার) সঙ্গে পরিকল্পিত অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পদ্যোগের বিকাশ সাধন, বা এক কথায় মিশ্র অর্থনীতি। শাসকরা অনবরত প্রচার করতে থাকেন যে, জাতীয়করণ রাষ্ট্রীয় পুঁজি বৃদ্ধি এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-মারফৎই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। এই মিশ্র অর্থনীতির ওপর ভিত্তি ক'রেই ১৯৭৬ সালে ভারতে পুরোপুরি 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়। ভারতের শাসকরা প্রচার ক'রে থাকেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গ'ড়ে তোলা মানেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিৎ যে, রাষ্ট্রের মালিকানায় পুঁজি বিকাশের ট্র্যাডিশন ব্রিটিশ-শাসনেরই অবদান। 'সদ্য স্বাধীন' ভারতে ১৯৪৮ সালে গৃহীত শিল্পনীতি রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিপুঁজির অবাধ বিকাশের কথা ঘোষণা করে। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির সঙ্গে ১৮৪৪-'৪৫ সালে গৃহীত বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীর শিল্পনীতির যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়[২০]। সংক্ষেপে বলা যায় 'স্বাধীন' ভারতের নেতারা 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার প্রথম অনুপ্রেরণা পান বিদায়ী বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকেই[২১]।

খুব সহজবোধ্য কারণেই এই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য হোলো ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ ত্বরান্বিত করা। স্বয়ং ঘনশ্যাম দাস বিড়লা মহাশয়ই মার্কিন পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করেন যে, ভারতে 'পাবলিক সেক্টরগুলি' ব্যক্তিপুঁজি (বৃদ্ধির) 'জেনারেটর' হিসেবে কাজ করতে চলেছে[২২]।

এই 'সমাজতন্ত্রে' তাই পুঁজিপতির অবাধ অধিকার রয়েছে শ্রমিক-শোষণ করার, জোতদার-মহাজনের অধিকার রয়েছে কৃষক-শোষণ করার, সাম্রাজ্যবাদের অধিকার রয়েছে জনসাধারণকে শোষণ করার, এবং রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে দমন-পীড়ন চালাবার— কিন্তু গরিব মানুষের কোনো অধিকার নেই। ব্রিটিশ-প্রসূত 'গণতন্ত্র' আর 'সমাজতন্ত্র' আজ 'এশিয়ার মুক্তি সূর্যের' ক্রোড়ে স্থান লাভ করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাজেও ব্রিটিশের এই দুই 'কীর্তির' বড় আদর!

আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কল্যাণে বড় বড় শহরে চল্লিশ হাজার মানুষ শুধুমাত্র রক্ত বিক্রি ক'রে বেঁচে আছেন, এই দেশে দশ লক্ষ মানুষের পেশা হোলো ভিক্ষা, এই দেশে গ্রামাঞ্চলে শতকরা চল্লিশজন এবং শহরাঞ্চলে শতকরা পঞ্চাশজন মানুষ মাসে মাত্র কুড়ি টাকা বা আরও কম উপার্জন করার সুযোগ পান[২৩]। গোপাল নায়েকার বলেছেন, "আমার জীবনের একমাত্র আশা হোলো অনেক খাবার খাওয়া— আর কিছু নয়"[২৪]। গোপাল নায়েকার একজন ভূমিহীন কৃষক, এবং অবশ্যই একজন ভোটার— কিন্তু ভারতের

গণতান্ত্রিক সমাজবাদেব অন্তর্লীন মাহাত্ম্যকে এবচেয়ে ভালো ভাবে বোধহয় আর কেউই প্রকাশ করতে পারেননি। গোপাল নায়েকাবের মতোই ভারতের কোটি কোটি মানুষ জীবনে একদিনও পেট ভ'রে খেতে পান না। কিন্তু ভারতের কোটি কোটি মানুষ বিদ্রোহ কবেন না কেন (অবশ্য 'স্বাধীন' ভাবতে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্তেব গৌববোজ্জ্বল সংগ্রামের কথা আমরা বিস্মৃত হচ্ছি না)? কেন এদেশে জনতার শক্তি নির্দ্ধারক ভূমিকায যেতে পারছে না? ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরাচক্রেব পতনের পর 'নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ' এই নির্বাচনকে 'টোট্যালিটেরিয়ান' শাসনের উপযুক্ত ঠ্যাঙানি ব'লে বর্ণনা করে[৫]। কিন্তু সেই 'ঠ্যাঙাড়ে' ভোটাররাই আবার ইন্দিরাচক্রকে ফিবিয়ে আনলেন (রাজনৈতিক সচেতনতা যতই নিম্নমানের হোক না কেন। অবশ্য একথাও ঠিক যে, জযপ্রকাশ নারায়ণেব মতো ক্যারিজম্যাটিক নেতার সমর্থন না থাকলে জনতার জয়লাভ হয়তো সম্ভব হোতো না!) এবই-বা কারণ কী? এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হ'তে পাবে; এবং এর সম্ভাব্য উত্তব দেবেন বাজনৈতিক কর্মীবা। আমরা কেবল সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর উত্তব দেবাব চেষ্টা কববো। এবং এখানেই আমরা অ্যাপ্টাব সাহেবের সাহায্য নেবো, অর্থাৎ ভাবতবর্ষে 'রাজনৈতিক ধর্মেব' সক্রিয় উপস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা অ্যাপ্টার সাহেবের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

ভারতবর্ষে প্রভুশ্রেণীর শাসন অবৈধ, এব প্রধান কারণ— এই শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উত্তরাধিকারী। এখানে ন্যায় এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়ালে শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্র হিংস্রভাবে দমন-পীড়ন চালায। সাধারণ মানুষ পুলিশ-মিলিটারি-আইন-আদালত-আমলা-গোমস্তা ইত্যাদিকে ভয় করেন। সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয়, তাঁরা ভাবেন এসব স্বাভাবিক। একজন গরিব মানুষ যখন অনাহারে মারা যান তখন সাধারণ মানুষ এ ঘটনা নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। এমন-কি একজন দবিদ্র মানুষও তাঁব দারিদ্র্যকে স্বাভাবিক ব'লেই মনে কবেন। মালিক যখন মজুব ছাঁটাই করেন, তখন সাধাবণ মানুষ মনে করেন এটাই তো হয়ে আসছে অর্থাৎ স্বাভাবিক। কৃষক যদি জোতদার-মহাজনেব স্বার্থের প্রতিকূল কাজ কবেন, তখন সাধারণ মানুষ ভাবেন এটা অন্যায়, পুলিশ এসে গুলি চালালে তাঁরা ভাবেন এটাই স্বাভাবিক। এককথায যেটা উচিৎ নয সেটাকেই সাধারণ মানুষ উচিৎ ব'লে মনে করেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা— সমস্ত কিছুকেই সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক বা বৈধ ব'লে মনে করেন। এই সমাজের সমস্ত কিছুর প্রতি আনুগত্যই হোলো শান্তিপূর্ণ জীবনের চাবিকাঠি। কিন্তু শুধুমাত্র দমন-পীড়ন চালিযে বা ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা বা শাসক-এলিটের একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগের অধিকার (অর্থাৎ মালিকশ্রেণীর শাসন) টিকতে পারে না। তাঁরা তাই অন্য ভূমিকাতেও অভিনয় ক'রে থাকেন। রাষ্ট্র কল্যাণব্রতী, বাষ্ট্র নিরাপত্তা দেয়, রাষ্ট্র আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখে— রাষ্ট্র তাই নিরপেক্ষ, অলঙ্ঘনীয়, পবিত্র, অমোঘ।

সাধারণ মানুষের মনে চিন্তাভাবনায় আর কর্মে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাব প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করার জন্য সমগ্র উপরিকাঠামো কাজ ক'বে চলেছে। সমাজ এবং শাসনের বৈধতা প্রশ্নাতীত করার জন্য শাসকরা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার ক'রে থাকেন, যেমন ইস্কুল-কলেজ, সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিভিন্ন স্তরেব মানুষেব

জন্য বিভিন্ন 'সাব কালচার'— যার স্থূল সমষ্টি হোলো প্রধানত শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতি বা 'শাসক সংস্কৃতি', এবং ধর্ম ইত্যাদি। এর মধ্যে ধর্মাশ্রয়ী-সংস্কৃতি ছাড়া অন্যান্য মাধ্যমগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এতসব 'দাওয়াই' সত্ত্বেও কিন্তু সমাজবিপ্লবের আশঙ্কা থেকে যায়। শাসকরা তাই বিভিন্ন শ্রেণীর বা স্তরের (বিশেষত শ্রমজীবীশ্রেণীর) মানুষের মননে এবং কর্মে নিজেদের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করার জন্য শাসনব্যবস্থার বৈধতার (অর্থাৎ প্রভুত্ব) উপর জোর দিয়ে থাকেন। 'বুর্জোয়াদের কার্ল মার্ক্স' ম্যাক্স হেবেবার শাসনের বা প্রভুত্বের বৈধতার ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন[১৮]। তিনি প্রভুত্বের তিন রকম উৎসের কথা বলেছেন ঃ ক্যারিজম্যাটিক, ট্র্যাডিশনাল, র‍্যাশনাল-লীগাল। ভারতবর্ষের শাসক-এলিট শ্রেণী-শাসন বজায় রাখার জন্য (দমন-পীড়ন ছাড়াও) তিনটি উপায়ই ব্যবহার ক'রে থাকেন, এবং এখানেই ম্যাক্স হেবেবারের বিশ্লেষণের সঙ্গে অ্যাপ্টার সাহেবের 'রাজনৈতিক ধর্মের' সাদৃশ্য অনুভব করা যায়।

ক্যারিজম্যাটিক নেতা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি 'বীর', যাঁর সম্মোহন করার ক্ষমতা রয়েছে, যিনি কোনো দুর্দশাগ্রস্ত জাতি বা সম্প্রদায়কে দুর্দশা থেকে 'মুক্তি' দেবার ক্ষমতা রাখেন, নামেই যাঁর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব রয়েছে, এ কারণে যাঁর বিরোধিতা থাকে না বা থাকলেও অত্যন্ত কম; এবং যিনি অন্ধ যুক্তিহীন আনুগত্য লাভ ক'রে থাকেন। আমাদের মতে ভারতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্যারিজম্যাটিক নেতা হলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী।

ট্র্যাডিশনাল নেতা হলেন ঐতিহ্যবাহী। যেমন কোনো ধর্মগুরু, কোনো রাজা, বা মতিলালের পুত্র জহরলাল, জহরলালের কন্যা ইন্দিরা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সঞ্জয় গান্ধী অথবা রাজীব গান্ধী। আমাদের দেশে গুরুর পুত্র বা শিষ্য গুরু হন, নেতার পুত্র নেতা হন, এবং 'বড় বংশের ছেলে' বিশেষ খাতির পান।

র‍্যাশনাল-লীগাল নেতৃত্ব আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ যে নেতৃত্ব 'যুক্তি অনুসারী'। যেমন নির্বাচন-মারফৎ মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, বা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের পরিবর্তে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হলেন। (এখানে বলা উচিৎ খাঁটি র‍্যাশনাল-লীগাল নেতৃত্ব একমাত্র বুর্জোয়া সমাজেই সম্ভব)।

ভারতবর্ষে যেহেতু গণতন্ত্রের নির্মোক ব্যবহার করা হয় তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে— এখানে রাজনৈতিক নেতাদের নেতৃত্ব বা প্রভুত্ব র‍্যাশলাল-লীগাল; কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, বাজনৈতিক এলিট নির্বাচনী-রাজনীতিতে ধর্ম এবং ধর্মগুরুদের ব্যবহার ক'রে থাকেন। অর্থাৎ এঁরা ট্র্যাডিশনের ওপর অনেকাংশে নির্ভর ক'রে থাকেন, ভোটারদের ট্র্যাডিশনাল চিন্তাভাবনা এক্সপ্লয়েট ক'রে থাকেন এবং এ জন্য ট্র্যাডিশনাল নেতাদের দ্বারস্থ হন।

শাসক-এলিট রাজনৈতিক-ট্র্যাডিশনও গ'ড়ে তোলেন। এ ব্যাপারে শ্রীমতি ইন্দিবা গান্ধীর সবচেয়ে বড় পুঁজি হোলো কংগ্রেসের ইমেজ। ভারতের 'স্বাধীনতা আন্দোলন'-এর সঙ্গে কংগ্রেসের নাম যুক্ত। তাই নির্বাচন-যুদ্ধে কংগ্রেসের বিভিন্ন পোস্টাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোলো গান্ধীজী নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধীর চিত্র ও উপযুক্ত স্লোগান-সম্বলিত পোস্টার—

মহাত্মা গান্ধী (পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা), জহরলাল নেহরু (স্বাধীনতা + গণতন্ত্র + অর্থনৈতিক প্রগতি) এবং ইন্দিরা গান্ধী (গণতন্ত্র + ধর্মনিরপেক্ষতা + সমাজতন্ত্র)।[১১]

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম প্রধান কৌশল হোলো নিজেদের সম্পর্কে ক্যারিজম্যাটিক ইমেজ গ'ড়ে তোলা। এ কাজে সবচেয়ে সফল ছিলেন গান্ধী এবং 'স্বাধীন' ভারতে— নেহরু, জয়প্রকাশ নারায়ণ, এবং অবশ্যই শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারত সরকারের জয়লাভ এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব শ্রীমতি ইন্দিরাকে 'বীরের' পর্যায় উন্নীত করেছিল। রাতারাতি তিনি 'এশিয়ার মুক্তি সূর্য' হয়ে গেলেন। সে-সময় তাঁর অনুগামীদের একটি প্রিয় বিজ্ঞপ্তি ছিল— "ভারতে এখন একটিমাত্র রাজনৈতিক দল এবং সে দলের নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী!" এর অর্থ নির্বাচন-মারফৎ ক্ষমতা দখল ক'রে টোটালিটেরিয়ান শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমতি ইন্দিরার জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। পাকিস্তানবিরোধী জাতিয়তাবাদ আর শ্রীমতি গান্ধী তখন একাকার, তাঁর প্রতাপ তখন নিরঙ্কুশ; আর চারদিক কাঁপানো 'বন্দেমাতরম্'-এর 'মা'-টি তখন শ্রীমতি ইন্দিরা!

প্রভুত্বের বৈধতা আদায়ের তিনটি উৎস ব্যবহার করলেও নেতাদের প্রতিশ্রুতি (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থাৎ 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ') এবং জনসাধারণের প্রাপ্তির মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে, ফলে কর্তৃত্বের ভূমিতে ফাটল ধরে, জনসাধারণের অপ্রাপ্তির ফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

[শ্রেণীবিভক্ত] সমাজে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সর্বদাই একটা 'গ্যাপ' থাকে (যা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থের সংঘাত), অ্যাপ্টারের মতে এই 'গ্যাপ' পূরণ করে 'রাজনৈতিক ধর্ম' (পৃষ্ঠা ৬১)। বস্তুত, জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ অসমর্থ। আর, এজন্যই শাসকরা এক বিশেষ 'ইডিয়লজি' হাজির করেন— যা ব্যক্তিকে বোঝাতে চায় যে, তাঁর স্বার্থ আর সমগ্র সমাজের স্বার্থ অভিন্ন। কিন্তু কোনো সাধারণ ইডিয়লজি, যেমন— 'গান্ধীবাদ', এ কাজ করতে পারে না। (গান্ধীবাদের যথাযথ অনুসরণ সম্ভব না হ'লেও ভারতে এখনও শাসকদের সবচেয়ে শক্তিশালী 'আদর্শ' হোলো গান্ধীবাদ)।* ভারতের শাসকদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হোলো 'ভারত বোধ' গ'ড়ে তোলার সমস্যা, যার মূল কারণ অবশ্যই বর্তমান ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা। তাই, অন্তত ভারতে 'রাজনৈতিক ধর্ম' আর 'ভারত বোধ' গ'ড়ে তোলার প্রচেষ্টা একাকার। ভারতের শাসকরা সেকুলারিজম-এর কথা বলেন অথচ বাস্তবে এঁরা ব্রিটিশের পরিত্যক্ত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিই অনুসরণ ক'রে থাকেন,[১২] যার উদ্দেশ্য ধর্মান্ধতায়, বিশেষত হিন্দু-ধর্মান্ধতায় উৎসাহ যোগানো। ভারতবর্ষে 'ভারতবোধ'

---

* ১৯২৯ সালে 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীর কাঠগড়া থেকে প্রদত্ত বিবৃতিতে' মুজফ্ফর আহ্মেদ বলেন, "সাদা কথায় মিঃ গান্ধী বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের 'আলিঙ্গন বদ্ধ হতে প্রস্তুত' হচ্ছেন।" তিনি গান্ধী ও কংগ্রেসের 'স্বরাজকে' 'ধোঁকাবাজী পূর্ণ' স্বরাজ ব'লেও উল্লেখ করেন। দ্রষ্টব্যঃ নন্দন, কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ স্মরণ সংখ্যা (একাদশ বর্ষ, নবম ও দশম সংখ্যা) ১৩৮০; পৃষ্ঠা ১৮০২, ১৮০১। আজকের বামপন্থীরাও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান কাণ্ডারী রূপে 'জাতির পিতাকে' বরণ ক'রে নিয়েছেন।

গ'ড়ে তোলার প্রয়াসে ধর্মের ব্যবহার ব্রিটিশ আমল থেকেই চ'লে আসছে, কিন্তু তখন যা ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা-উৎস, আজ তা উৎপীড়নের যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী শাসন বজায় রাখার উপযুক্ত 'সিম্বলিক ফোর্স' হোলো 'রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা', 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা', 'গরিবী হটাও', 'সমাজতন্ত্র', 'বিশ দফা কর্মসূচি' ইত্যাদি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক বাগাড়ম্বরের (আপাতভাবে র‍্যাশনাল অংশ) সঙ্গে হিন্দুত্বের আস্ফালন— 'সনাতনী হিন্দু আদর্শের' (নন-র‍্যাশনাল অংশ) এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। (এখন হিন্দুত্বের আস্ফালন তুঙ্গে উঠেছে, 'রামরাজ্য' আগতপ্রায়, সংবিধান অমান্য ক'রে 'গুজরাট লাইনের' হুমকি, দেশের দেউলিয়া অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনের অন্তিমে পৌঁছেছে, 'বিলগ্নীকরণের' জাদুমন্ত্রে আকাশের চাঁদ হাতে আসবে।) শাসকদের প্রচারিত 'ভারতবোধ'-এর মূল ভিত্তি হোলো সনাতনী হিন্দুত্ব আর পাকিস্তান বিরোধিতা! —তাই তাঁরা প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবের দুস্তর ফারাক পূর্ণ করার জন্য শক্তিশালী এক 'সিম্বলিক ফোর্স' উপস্থিত করেন, যা সর্বদা র‍্যাশনাল নয় কিন্তু কোনো কোনো সময়ে এর র‍্যাশনাল উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এই 'সিম্বলিক ফোর্সকেই' অ্যাপ্টার 'পলিটিক্যাল রিলিজিয়ান' বলেছেন (পৃষ্ঠা ৬১)। টিঙ্কার সাহেব বলেছেন, ভারতীয় গণতন্ত্রের সাধারণ দাওয়াই হোলো বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে প্রাচীন ভারতের সামাজিক (শ্রেণীগত) ঐক্য এবং সুসম্পর্কের ('গৌরবময়' ঐতিহ্যকে) উন্নীত করা[১০]। শাসকদের প্রচারিত 'মহান ভারত' অবশ্যই প্রাচীন ভারত— মীথিক্যাল ভারত। ভারতবর্ষে এখনও পুরোনো আমলের 'সমাজ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলিকেই ব্যবহার করা হয়[১১]। এর অধিকাংশই ধর্মবোধ বা ধর্মীয় সংস্কারভিত্তিক; যেমন পাপ, পুণ্য, পরলোক, জন্মান্তর, অদৃষ্টবাদ, জাতিপ্রথা (Caste system), বর্ণপ্রথা ইত্যাদি। ভারতে 'হিন্দু রাজনীতির' ভিত্তি,— জাতিপ্রথা যা শ্রেণীগত ঐক্য গ'ড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। মহাজনের প্রাপ্য সুদ পরিশোধ না করলে কৃষকরা পাপের ভাগী হবেন; দারিদ্র্য বা সমাজে নিচু স্থান আসলে বিধাতা-নির্দেশিত, তাই তাকে মেনে চলা উচিৎ; উচ্চবর্ণের ভূস্বামী অধিকতর পুণ্যবান প্রভু, তাঁর সেবা নিম্নবর্ণের কৃষককে পারলৌকিক মুক্তির পথ দেখায়— ইত্যাদি সবই প্রাচীন ভারতের আদর্শ। সর্বোপরি রয়েছে উপনিষদের মহান বাণী ঃ "পরের ঐশ্বর্যে লোভ করিও না" —যা গান্ধীজীর কমিউনিজম বা 'অছিবাদ'-এর মূল তত্ত্ব[১২]। বস্তুত, এই ধরনের সনাতনী আদর্শই 'রাজনৈতিক ধর্মকে' পরিপুষ্ট করে।

অ্যাপ্টার সাহেব রাজনৈতিক ধর্মের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন (পৃষ্ঠা ৮২-৮৩)। প্রথমত— রাজনৈতিক ধর্মের প্রচারকরা প্রচার ক'রে থাকেন রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থা (আইন এবং বিচার সমেত) পূত, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক। দ্বিতীয়ত— রাষ্ট্র পবিত্র অতএব অলঙ্ঘনীয়, তাই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজে প্রত্যেকের ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করা উচিৎ (অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিলোপ সাধনের প্রচেষ্টা), রাষ্ট্র ও সমাজের এই ভাবমূর্তি থেকে শাসক ও শাসনের বৈধতা আদায় করা হয়, এবং তাকে বহু গুণে বাড়িয়ে তোলা হয়। রাজনৈতিক ধর্মে শাসনের (গৌরবময়) অতীত সন্ধান করা হয় এবং তা প্রচার করা হয়, যেমন 'রামরাজ্য'-এর প্রতিষ্ঠা অথবা বেদ বা গীতার যুগে ফিরে চলো (জয়প্রকাশ নারায়ণ, বিনোবা ভাবে, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাধাকৃষ্ণন

প্রমুখ এমন-কি 'সেকুলার' হিসেবে পরিচিত জহরলাল নেহরুও বেদ-বেদান্তের মধ্যে ভারতের সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন) ইত্যাদি স্লোগান! আর ন্যাশনাল অতীত হোলো 'মহাত্মা গান্ধী', 'কংগ্রেস এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতা স্বাধীনতা এনেছেন'— অতএব শাসকদলের শাসন অবিসংবাদী হওয়া উচিৎ! তৃতীয়ত— 'রাজনৈতিক ধর্মে' সমগ্র জাতি এবং দেশের এক বা একাধিক শত্রু খোঁজা হয় (যাকে 'স্কেপ গোট' হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সম্প্রতি শাসকবর্গের প্রচারিত 'স্কেপ গোট' হোলো সন্ত্রাস! সন্ত্রাসবাদী!)। সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশে পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই ভিলেন বা শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যে বা যারা বর্তমান দুর্দশার জন্য দায়ী। কিন্তু ভারতে বর্তমান দুর্দশার জন্য ব্রিটিশকে দায়ী করা হয় না, কারণ তাহলে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি জনসাধারণের সুপ্ত ঘৃণা আর ক্রোধ জাগরিত হবে, জনসাধারণ তখন মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে চাইবেন। তাই এখানে রাষ্ট্রনায়কদের কাছে শত্রু হোলো (কিছুদিন আগে পর্যন্ত শত্রু ছিল চীন ও পাকিস্তান, এবং পাকিস্তান তো আজও) অস্পষ্টতায় ভরা কিছু বাগাড়ম্বর, যেমন— প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপন্থী ইত্যাদি। শ্রীমতি গান্ধী অবশ্য মাঝেমাঝে 'বিদেশী শক্তির' কথা বলেন কিন্তু সরকারের তরফ থেকে তাকে চিহ্নিত করা হয় না। 'নাম না জানা' শত্রুর প্রতি দোষারোপের ফলে সাম্রাজ্যবাদ মালিকশ্রেণী ও সামন্তশ্রেণী কিন্তু আড়ালেই থেকে যায়।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে 'মুক্তি' জাতির পুনর্জন্ম। এই পুনর্জন্ম— নবজাতকের বিশুদ্ধতার মতোই পবিত্র (পৃষ্ঠা ৭৯)। তাই স্বাধীনতা এক পবিত্র ঘটনা, এক ধর্মীয় ঘটনা (পৃষ্ঠা ৮২)। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় হিন্দুত্বের এক বিচিত্র ভূমিকা দেখা গেছে। মুসলমান এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে 'মুক্ত' পবিত্র ভারতভূমিতে স্বাধীনতার অভিষেক হিন্দুত্বের মহিমায় অনুরঞ্জিত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত 'নব ভারতে' ক্ষমতা হস্তান্তরের উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে শুভলগ্ন খোঁজা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে পুরোহিতরা পৌরহিত্য করেছিলেন এবং নবজাতকের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন।

'রাজনৈতিক ধর্মে' রাষ্ট্রের নবজন্মের 'এজেন্ট' হলেন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি রাষ্ট্রের জন্মের 'ধাত্রী' (পৃষ্ঠা ৮৩)। যেমন ভারতবর্ষে 'স্বাধীনতা' বা 'নবজন্মের' 'ধাত্রী' হলেন মহাত্মা গান্ধী, জাতির পিতা! এবং তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারা। মহাত্মা গান্ধীর পরেই হলেন জহরলাল নেহরু; বিলেতে ঘুরে আসার চাকচিক্য থাকলেও তিনি গান্ধীর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, অতএব 'স্বাধীনতার অবতার'![৩]

'পলিটিক্যাল রিলিজিয়ানের' সঙ্গে 'চার্চ রিলিজিয়ানের' কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে (আমাদের বিবেচনায় হিন্দুধর্মের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আরও বেশি)। 'রাজনৈতিক ধর্মেও' 'প্রফেট'-এর নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। তিনি জাতির পিতা, শিক্ষক, এবং জাতির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পৌরাণিক দেব-দেবীর সমতুল্য, দেব-দেবীর মতোই পূজ্য (পৃষ্ঠা ৯২, ৮৭)। ভারতবর্ষে নিঃসন্দেহে এই স্থান গান্ধীর। তাঁর গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুত্ব একসময় ভারতের কোটি কোটি ধর্মান্ধ মূঢ় অজ্ঞ মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি আর মোহ উদ্রেক করেছে, এখনও করে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে ঃ

জনসাধারণ শ্রদ্ধা করেন মহাত্মাকে; [তিনি] অপার্থিব শক্তির ধারক, ধর্মবোধের উৎস[৩২]। এখানেই গান্ধীর 'গান্ধীত্ব'। আমাদের দেশের মতো অনগ্রসর, ধর্মান্ধ, দুঃখী দেশে গান্ধীজী আজও শাসকদের সবচেয়ে বড় অবলম্বন; সামাজিক সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। তাই দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই তথাকথিত সেকুলার ভারতে গান্ধীভক্তদের প্রচারের ফলে গান্ধী হয়ে ওঠেন 'দশম অবতার', পুরাণে বর্ণিত কল্কি।

'রাজনৈতিক ধর্মে' এক বা একাধিক শত্রুর স্থান থাকে, যেমন থাকে— ধর্মের প্রচারকের স্থান, সাধুসন্তের স্থান। 'রাজনৈতিক ধর্ম' সাধারণ ধর্মের মতোই কর্তৃত্বপরায়ণ এবং সেই সঙ্গে রহস্যময়তা আর অতীন্দ্রিয়বাদের প্রচারক (পৃষ্ঠা ৮৭)। এই অতীন্দ্রিয়বাদে 'অবজেক্ট' ঈশ্বর নন, পবিত্রতায় আবৃত শ্রেণীশাসন এবং মাধ্যম,— হিন্দুত্বে অটল বিশ্বাস। তাই ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সাম্রাজ্যবাদের প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা আর ক্রোধকে বিপথগামী ক'রে শ্রেণী-শাসনের বশীভূত করার কাজে উঠে-প'ড়ে লাগলেন 'ধর্মপ্রাণ' রাজনৈতিক নেতারা, যেমন— রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লবভাই প্যাটেল, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ; এবং বিভিন্ন পলিটিক্যাল সাধুরা— এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিনোবা ভাবে, আনন্দময়ী, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, জয়দেব বাবা (চরণ সিং-এর সমর্থক) ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রমুখ। গঙ্গাবিধৌত পুণ্য ভূমিতে শাসকের বন্দুক আবৃত হোলো বেদ-বেদান্ত-চন্দন-পুষ্প-বিল্বপত্রে। অসংখ্য মানুষকে হত্যা করলেও গান্ধীর উত্তরসূরীরা অহিংসা আর ত্যাগের মন্ত্র ভুললেন না, গান্ধীর 'রামরাজ্যে' সাবেকী বর্ণপ্রথার পাশাপাশি এক নতুন 'বর্ণপ্রথা' জন্মলাভ করলো, পুঁজিপতি আর সামন্ত অর্থাৎ 'বৈশ্য' হলেন রাজা, বুদ্ধির কারবারী অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ' হলেন বেতনভোগী সভাসদ, শ্রমিক কৃষক অর্থাৎ 'শূদ্র' হলেন গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পিলসুজ। আর রাষ্ট্রশক্তি তার ক্ষাত্রতেজ নিয়ে হোলো 'বৈশ্য রাজের' রক্ষক!

'শক্ত মানুষ' 'বীর' লালবাহাদুরের পর গান্ধী-অবতারের লাইন সার্থকভাবে প্রয়োগ ক'রে আবির্ভূত হলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। রাষ্ট্র-পরিচালিত দমন-পীড়ন আচ্ছাদিত করার জন্য রাজনৈতিক ধর্মের প্রচারও বাড়িয়ে দেওয়া হোলো। জরুরি অবস্থার সময় তিনি বন্দিতা হলেন 'ভারতমাতা' রূপে,— জাতির পিতার সার্থক উত্তরাধিকারীণী। ইন্দিরা গান্ধীকে চিত্রিত করা হোলো, দূর্গা, সীতা, ভারতমাতা রূপে। তাঁর রুদ্রাক্ষের কণ্ঠহার আর নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবার পবিত্রতা— ধর্মান্ধ জনসাধারণের কাছে তাঁর ইমেজ আরও বড় ক'রে তুলে ধরলো, স্তাবকেরা সম্মিলিত স্বরে উচ্চারণ করলেন— "ইন্দিবাই ভারত, ভারতই ইন্দিরা" আর তিনি উচ্চারণ করলেন 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'; ঋষি বিনোবা ভাবের কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো "জরুরি অবস্থা মহাভারতের অনুশাসন পর্ব।" মুক্তিসূর্যের উত্তাপে উত্তপ্ত উদ্বুদ্ধ যুবনেতা ঘোষণা করলেন— "কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।" অনুগামীদের গর্জনে ভারতের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। সাময়িক বিরতির পর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আবার ভারতের কর্ণধার। তিনি এখনও দারিদ্র্য রূপী "অসুরের বিরুদ্ধে সংগ্রামরতা"; অন্যদিকে হিন্দুত্বের সবচেয়ে বড় রক্ষাকর্ত্রী। তিনি ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছেন এবং হিন্দুগুরুদের হাত করেছেন; শুধু তা-ই নয়, গো-হত্যার প্রতিবাদে অনশনরত বিনোবা ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মীতা জ্ঞাপনের জন্য একদিন অনশনও করেছেন।[৩৩] এর ফলে 'মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক'

তাঁর প্রতি বিরূপ হচ্ছে ব'লেও অনেকে মনে করছেন। তাই এখন তিনি 'হরিজন ভোটব্যাঙ্ক'-এর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে তিনি হিন্দুদের চোখে এখনও পুণ্যবতী রাজনীতিক, অস্পৃশ্যদের ত্রাণকর্ত্রী তথা 'ভারতবোধের উৎস'।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীত্বের অন্যতম দাবিদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখরও সুদীর্ঘ পদযাত্রা মারফৎ গ্রামাঞ্চলে নিজেকে ক্যারিজম্যাটিক লীডার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর কাছেও বর্তমান গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। আগামী নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করলেও, রাজনীতির চরিত্র পাল্টাবার ক্ষমতা তাঁর হবে না, যা তিনি এখন প্রচার করছেন[৩৪]।

দিল্লির মসনদে কাণ্ডারী পাল্টালেও 'রাজনৈতিক ধর্মের' প্রচার অব্যাহত থাকবে, কারণ 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদের' পক্ষে তা অপরিহার্য। যতদিন ভারতে শ্রেণীশাসন বজায় থাকবে ততদিনই 'রাজনৈতিক ধর্মের' প্রচারও থাকবে বড়জোর তার রূপ পাল্টাতে পারে; এবং তা প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংগঠন গ'ড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। কোয়েস্টলার বলেছেন ঃ হিন্দুসমাজে এক মূলোৎপাটনকারী বিপ্লবের পরেই ভারতে গণতন্ত্র— পাশ্চাত্যের অর্থে— কার্যকরী হ'তে পারবে।[৩৫] কিন্তু ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বস্তুগত উপাদানগুলি আজও অনুপস্থিত। এখন প্রতিষ্ঠিত হবে নয়াগণতন্ত্র, তাই আমরা বলতে পারি 'বৈশ্য শাসন' এবং 'হিন্দু সাম্রাজ্যের' ভিত্তি সামন্ততন্ত্রের মূলে আঘাত করলেই 'রাজনৈতিক ধর্মও' দুর্বল হয়ে পড়বে। এর জন্য শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র করার প্রয়োজন রয়েছে, আর প্রয়োজন রয়েছে এক 'পলিটিক্যাল পেট্রিয়টিজম' বা 'রাজনৈতিক দেশপ্রেম' গ'ড়ে তোলার। ভারতের মতো 'প্লুরাল সোসাইটিতে' হিন্দুজাতীয়তাবাদের প্রভাবমুক্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক দেশপ্রেমের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে, কারণ এই জাতীয়চেতনাই সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতাকে পরাস্ত করতে পারে। শাসকদের প্রচারিত কৃত্রিম 'ভারত বোধ' বা 'সিম্বলিক ফোর্স' এ কাজে অক্ষম। তাই শ্রেণীসংগ্রামের সাহায্যকারী প্রক্রিয়া হিসেবে ভারতে সেকুলারিজমের পক্ষে আন্দোলন গ'ড়ে তোলা উচিৎ। ধর্মনিরপেক্ষতা শ্রমজীবী মানুষকে ধর্মান্ধ ক'রে রাখার পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী। প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীতে প্রকৃত সেকুলারিজম-এর চর্চা ও প্রচার মারফৎ শ্রমজীবী মানুষ 'রাজনৈতিক ধর্মের' প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারবেন। সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী ব্যক্তিদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।

১। বর্তমান আলোচনা লিখিত হবার পর ভারতের স্বাধীনতার ৩৬তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত ভাষণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে এই ভাষণ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক— "স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'গণতান্ত্রিক সমাজে হিংসার কোনো স্থান নেই।' তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'সকলকেই ঐক্য ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করতে হবে। যেখানে যখন অনৈক্য ও শৃঙ্খলাহীনতা মাথা চাড়া দেবে, তখনই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দিয়ে তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে হবে। আমাদের সদাসতর্ক থাকতে হবে এবং দেশের ঐক্যের শক্তিগুলিকে জোরদার করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'

জৈল সিং বলেন, 'সমাজ ধর্মীয় গুরু ও নেতাদের সম্মানের স্থান দিয়েছে। জাতীয় ঐক্য

জোবদার করা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে এঁদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে...।' অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন. 'জনগণের স্বেচ্ছা-সম্মতির ভিত্তি যোজনাব মাধ্যমে উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পথটিই ভারত বেছে নিয়েছে। অর্থনৈতিক যোজনার তিনটি দশকে দেশ বিভিন্ন দিকে যথেষ্ট উন্নতি করেছে....। এ সমস্তই অর্জিত হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোর মধ্যে।'...."

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫.৮.১৯৮৩

২। একটি পুস্তকের বিজ্ঞাপন— "ভারত লঙ্কায় প্রথম সংহতিপূর্ণ অখণ্ড ধর্মরাজ্য স্থাপনা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। আজও ভারতে এক সংহতিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ গ'ড়ে তোলার জন্যে শ্রীমতি গান্ধী অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে চলেছেন.... প্রত্যেক ভারতীয়র অবশ্যপাঠ্য উপন্যাস।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.৪.১৯৮৪

৩। শাসকদের প্রচারিত 'ভারত বোধ' হিন্দু-ধর্মাশ্রয়ী হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় পাঞ্জাবের আন্দোলনও সেকুলার হ'তে পারছে না। আকালীদের দাবিগুলির একটি ধর্মীয় আবরণ থাকায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী "অন্ধ সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়ে পাঞ্জাবে রক্তগঙ্গা" বইয়ে দিচ্ছেন। "হরিয়ানা সুরক্ষা সমিতি প্রভৃতির মতো হিন্দু-সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে তিনি প্রকাশ্যেই মদত যোগাচ্ছেন।" (রাজেন্দ্র সিং; আকালী আন্দোলনে দু'মুখী চরিত্র ঃ সত্তর দশক; এপ্রিল-জুন ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৩)। ধর্মাশ্রয়ী 'ভাবত বোধের' প্রচার প্রতিহত করার জন্য এর বিরোধীরাও ধর্মাশ্রয়ী জঙ্গী আন্দোলন গ'ড়ে তুলছেন। এর ফলে সমস্ত ধর্মের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য বা সংহতি গ'ড়ে ওঠার প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

সূত্র নির্দেশ

1. Radio Broadcast, 1929, quoted in Edward Mc Nell Burns. Ideas in Conflict. London, Methue & Co. Ltd. 1966. p 171.
2. David E. Apter. Political Religion in the New Nations in Clifford Geerts (ed). Old Societies and New States. The Quest for Modernity in Asia and Africa. New Delhi, Amerind Publishing Co. Pvt Ltd 1971. pp. 57-104.
3. John H. Kautsky. The Language of Politics in Under Developed Countries in Arthur J. Vidica and Ronald M. Glassman (ed). Conflict and Control-Challenge to Legitimacy of Modern Governments. London, Sage Publications Ltd 1979. p. 257.
4. Yogendra Singh. Modernisation of Indian Tradition. Faridabad, Thompson Press (India) Limited. 1977, p. 117.
5. K. M. Panikkar. The Foundations of New India. London, Goerge Allen & Unwin Ltd. 1963. p. 169.
6. E. Malcolm House. India Under the Impact of Western Political Ideas. In S. P. Aiyar and R. Srinivasan (ed). Studies in Indian Democracy. Bombay, Allied Publishers Private Ltd. 1965. p. 26
7. Taya ZinKin. Nehruism : India's Revolution Without Fear Ibid. p. 736
8. E Malcolm House op cit. pp. 13-14

9 C R. M Rao The Levels of Indian Politics A Problem of Authoritarian Tradition and Democratic Modernity In S P Aiyar and R Srinivasan op cit. p 135
10. Yogendra Singh op cit. p. 159
11 Moin Shakir Politics of Minorities. Some Perspectives Delhi, Ajanta Publications (India). 1980 p 36
12 S. L Shakdher (ed). The Sixth General Election of Lok Sabha New Delhi, Oxford & IBH Publishing Company. 1977 p 3.
13. Ibid. p 20.
14. Dilip Hiro. Inside India Today. London, Routldgo & Kegan Paul. 1976. p. 67
15 Hugh Tinker. Tradition and Experiment in Forms of Government In C. H. Philips (ed) Politics and Society in India. London, George Allen and Unwin Ltd 1963. p. 185
16. Ruddar Dutt and K. P M Sundharam, Indian Economy, New Delhi, Niraj Prakashan. 1966. p 185
17 Speaker of the Lok Sabha Future of Asian Democracy, Indian Bureau of Parliamentary Studies, New Delhi, 1959. pp 89-90 quoted in Hugh Tinker op cit. p. 171.
18. Dutt and Sundharam. op. cit p 109
19. Dilip Hiro. op. cit. p. 109.
20 Ibid. p 108
21 Ibid. p. 108.
22. Ibid. p. 109.
23. Moin Shakir. op cit. p. 36
24 Quoted in Dilip Hiro op cit. p. 3.
25. Vide S. L Shakdher op cit. p 186
26 Joseph Bensman. Max Weber's Concept of Legitimacy : An Eevaluation. Vidica and Glassman. op. cit. pp. 17-48
27. Dilip Hiro. op. cit. p. 63.
28 Hugh Tinker. op. cit. p 178
29. A R. Desai. Recent Trends in Indian Nationalism. Bombay, Popular Prakashan. 1973. p. 119.
30. M. N. Roy. Secularism, Indeed In V. K Sinha (ed). Secularism in India. Bombay. Lalvani Publishing House. 1968. p. 156.
31. Clifford Geertz. The Integrative Revolution. In Clifford Greetz. op. cit. p. 141.
32. M. N. Roy. op. cit. p. 153.
33. Syed Shahabuddin. Mrs. Gandhi and the Muslim Vote. Sunday, March 20, 1983. p. 36.
34. Sunday. July 3, 1983.
35. Arthur Koestler. Quoted in C. Von Furen Harimaindorf. Caste and Politics in South Asia. In C. H. Philips. (ed). op. cit p. 69

[সত্তর দশক, জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৮৪]

ধর্মান্ধতা ও নির্বাচনী রাজনীতি

তখন সারা দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে। সপুত্র ইন্দিরাকীর্তনে যখন সরকারি প্রচারমাধ্যমগুলি পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে, তখন এম. এফ. হুসেন নামের এক চিত্রকর এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। তিনি শ্রীমতি ইন্দিরাকে দুর্গা সীতা ও ভারতমাতা রূপে চিত্রিত ক'রে তিনটি ছবি আঁকলেন। হুসেন সাহেবের ভাগ্যে তাঁর এই প্রভুভক্তির জন্য কী পুরস্কার জুটেছিল তা আমাদের জানা নেই, তবে বহু ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এই ছবি তিনটি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হয়েছিল, এমন-কি প্রদর্শিত হয়েছিল খোদ মার্কিন মুলুকেও।[১] ব্যাপারটি অনেকের কাছে আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ মনে হ'তে পারে, কিন্তু 'দ্বিতীয় চিন্তায়' বোঝা যাবে, ভারতের রাজনীতিতে 'মাদার কাল্ট'-এর ব্যবহার আজও সেকেলে হয়ে যায়নি। প্রয়োজন পড়লেই ভারতের শাসকরা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্টভাবে 'মাদার কাল্ট'-এর ব্যবহারও ক'রে থাকে। বিশেষ ক'রে 'জরুরি অবস্থা'র সময় যখন ইন্দিরা-চক্রকে, বিশেষত, শ্রীমতি ইন্দিরাকে একমেবাদ্বিতীয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জোর প্রচেষ্টা চলছে। প্রকৃতপক্ষে, "ইন্দিরাই ভারত, ভারতই ইন্দিরা"— এই চরম প্রতিক্রিয়াশীল স্লোগান জনসাধারণের মননের গভীরে প্রবেশ করানোর জন্যই ইন্দিরা-চক্র এ ধরনের ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল এবং এ কাজে দাসমনোভাবাপন্ন একজন মুসলমানকে নিয়োগ করেছিল। কারণ স্বদেশে তো বটেই, বিশেষ ক'রে, বিদেশেও এতে ক'রে প্রচার করা যাবে যে— ভারতের শাসকরা কতদূর 'সেকুলার' আর উদার-সহিষ্ণু; এবং ভারতের মুসলমানরা কতখানি সুখে-শান্তিতে আছে, যার ফলে একজন মুসলমান হিন্দু-প্রধানমন্ত্রীকে 'দেশমাতা' রূপে কল্পনা করছেন।

বস্তুতপক্ষে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ভারতের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসে কোনো নতুন ঘটনা নয়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বর্ণ, জাতি (কাস্ট), আর শ্রেণী-শাসনের জন্য (উভয় উভয়ের পরিপূরক) ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। সহস্র ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা; আর সহস্রাতীত বিধিনিষেধ, আপ্তবাক্য, আচারসংস্কার সমন্বিত হিন্দুধর্মের অচলায়তন— তার বিপুল সংখ্যক শাখাপ্রশাখা নিয়ে প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতীয় সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে, রুদ্ধ করেছে। হিন্দুধর্ম বস্তুত যে-কোনো সামাজিক আলোড়নকে প্রাথমিক পর্যায়েই বিনষ্ট করেছে অথবা তার নিজস্ব বিপুলায়তনের মধ্যে গ্রাস ক'রে নিয়েছে। তাই বিদ্রোহীরা— হয় পতিত হয়ে গেছেন, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন, নতুবা অচিরেই সমস্ত প্রগতিশীলতা হারিয়ে 'অবতারে' পরিণত হয়েছেন। ভারতীয় সমাজে নিঃস্ব নিরন্ন শ্রমজীবী মানুষকে নির্বিবাদে নির্বিচারে শোষণ করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল ধর্ম, ইহকালে ভাগ্যদেবতার নির্বন্ধের দোহাই আর পরকালে 'অক্ষয় স্বর্গবাসের' প্রতিশ্রুতি. বর্তমানেও এর বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়েছে ব'লে মনে হয় না। পরনির্ভরশীল বিকৃত ধনতান্ত্রিক

বিকাশের ফলে মান্ধাতার আমলের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি আজও বহুলাংশেই অক্ষত রয়ে গেছে; বড়জোর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের শহুবে মোড়ক পরানো হয়েছে। শহবাঞ্চলেও তাই আজ লটারির টিকিট জ্যোতিষী আর শনিঠাকুরের কারবার সমান লয়ে বেড়ে চলেছে। আর অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে 'অমুকবাবা' বা 'তমুক ব্রহ্মচারীদের' প্রতাপ।

ভারতীয় সমাজে বিকৃত ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরও পূর্ণ বিকাশ হয়নি। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণীগুলি এক নির্বাচনপ্রথাও লাভ করেছে। রাজনৈতিক দলগুলির কাছে যার মূল কথা হোলো 'যেনতেনপ্রকারেণ' ভোট সংগ্রহ করা। কাজেই রাজনীতি-ব্যবসায়ী এলিট-সম্প্রদায় নির্বাচনের মরশুমে জনসাধারণের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি পালনের শপথ গ্রহণেব সঙ্গে সঙ্গে নিছক ভোট সংগ্রহের জন্যই জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসকেও কাজে লাগিয়ে থাকেন। এ কাজে তাঁরা প্রধান দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 'গুরু', 'অবতার', 'ইমাম', 'মোল্লা' প্রমুখদের দ্বারস্থ হন অথবা মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের আমদানি করেন। এ কাজে 'গান্ধীবাদী' বা 'মার্ক্সবাদী' কোনো দলই পিছিয়ে নেই। ব্রিটিশ আমলের সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার অবসান ঘটলেও স্বাধীন ভারতের সুচতুর শাসক-এলিট সুকৌশলে, 'সেকুলারিজম'-এর নামে 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতি আজও প্রয়োগ ক'রে চলেছেন। রাজনীতি-ব্যবসায়ী ছোটবড় রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হোলো ভারতের বর্তমান সমাজব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা— অর্থাৎ যে-কোনো প্রগতিশীল রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের বিরোধিতা করা। এ কারণে ভাবতের শাসক-শোষকরা খুব 'সঙ্গতভাবেই' ধর্মান্ধতাকে প্রশয় দিয়ে থাকে, ধর্মান্ধতাকে সযত্নে লালিতপালিত করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিয়ে থাকে। শুধু তা-ই নয়, এদের প্রায় সমস্ত কাজের জন্যই এরা 'নৈতিক সমর্থন' খোঁজে ধর্মের কাছে অথবা 'ধর্মগুরুদের' কাছে। তাই 'জরুরি অবস্থা' জারি করার নৈতিক সমর্থন জোগান 'হাফ্ অবতার' বিনোবা ভাবে এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক দল 'মুসলিম লীগ'; বেলুড় মঠের মহারাজ প্রধানমন্ত্রীর মহত্ত্বের 'সার্টিফিকেট' দেন; আর অত্যাধুনিক ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রী রুদ্রাক্ষমালা শোভিতা হয়ে গ্রামাঞ্চলে সফর করতে যান; অথবা রাজ্যের 'স্পীকার' কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতিষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন; ধর্মপ্রাণ মার্ক্সবাদী নেতা নিজেকে প্রথমে মুসলমান এবং পরে কমিউনিস্ট ব'লে প্রচার করেন; ওদিকে 'মার্ক্সবাদী কালী পুজো'র প্যাণ্ডেলে লেনিন সাহেব বিক্রি হয়ে যান নগদ অষ্টআনা মূল্যে! শুধু তা-ই নয়, সময়বিশেষে যাঁরা উচ্চনিনাদে 'সেকুলারিজম'-এর (অর্থ না-বুঝেই) কথা বলেন-- তাঁরাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, এমন-কি রাজনৈতিক জীবনেও, গোঁড়ামী কু-সংস্কার এবং ধর্মান্ধতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। এর মানে কি এঁরা সবাই পরম ধার্মিক? আসলে, রাজনৈতিক নেতারা ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু জনসাধারণের কাছে "আমি তোমাদেরই লোক" ব'লে নিজেকে জাহির করার জন্য। তাই প্রধানমন্ত্রীর চিতাভস্ম 'পুণ্য সলিলে' বিসর্জিত হয়, গোঁড়া হিন্দুমতে যুবনেতার নশ্বর মরদেহ ঘৃতকর্পূরচন্দনকাষ্ঠ সহযোগে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়, অথবা 'সেকুলার' রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীমহোদয়া সাতান্ন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট গোমতেশ্বরের মূর্তির মাথায় বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন।

কোটি কোটি নিরন্ন, বুভুক্ষু, ধর্মভীরু জনসাধারণের সঙ্গে 'কমিউনিকেশনে' এর চেয়ে ভালো রাস্তা আর কী হ'তে পারে?[১] আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জনৈক প্রতীচ্যবাসী মন্তব্য করেছিলেন, ভারতবর্ষ একটি "ধর্মীয় মহাদেশ, রাজনৈতিক নয়।"[২] এই পর্যবেক্ষণ আজও প্রায় সমানভাবেই সত্যি। এহেন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' চরমতম সাফল্যের পর।[৩] ক্ষমতা হস্তান্তরের পর শাসক-এলিট 'সেকুলারিজম'-এর আদর্শ পালনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ভারতের সংবিধানে এ সম্পর্কে কয়েকটি ধারাও যোগ করা হয়, সংক্ষেপে যার মূল কথা হোলো রাষ্ট্র কোনো ধর্মমত পোষণ করবে না; রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিককে (অথবা সংগঠনকে) তাঁর নিজস্ব ধর্মমত পালন এবং প্রচার করার স্বাধীনতা দেবে; রাষ্ট্রের বিচারে সকল ধর্মাবলম্বী নাগরিক সমান; রাষ্ট্র কোনো ধর্মের প্রচারে বা প্রসারে উৎসাহ দেবে না, বা এর জন্য কোনোরকম কর ধার্য করবে না; অথবা ধর্ম পালন বা প্রচারের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না; এবং রাষ্ট্রের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে না। সংবিধানে এমত নির্দেশ থাকলেও সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা লোপ করা ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করা হোল না। অর্থাৎ ভারতীয় 'সেকুলারিজম'— ধর্ম আর রাজনীতিকে পৃথক করার কোনো প্রচেষ্টাই করলো না, কেবলমাত্র সমস্ত ধর্মকে 'সমমর্যাদা' দান করলো।[৪] এবং এই নীতির আবরণের মধ্যে গোঁড়ামী আর ধর্মান্ধতাকে চিরস্থায়ী করার সব-ক'টি ব্যবস্থা করা হোলো সাংবিধানিক ব্যবস্থার সাহায্যেই।

ভারতে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের সাহায্যে, যার নির্লজ্জ প্রতিফলন ঘটে নির্বাচনী রাজনীতির খেলায়, শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা প্রধানত দু'টি উদ্দেশ্য চরিতার্থ ক'রে থাকেন। প্রথমত, শ্রেণীস্বার্থের পরিবর্তে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত স্বার্থ বা ধর্মীয় আনুগত্যের দোহাই পেড়ে শোষিত জনসাধারণের মধ্যে অনৈক্য এবং বিভেদ-বিদ্বেষ তৈরি করা, এ কাজে শাসকশ্রেণীর দ্বিতীয় সারির প্রতিনিধি অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় সংস্থাগুলি প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন যোগায়, যার অনিবার্য ফল হোলো দাঙ্গা; দ্বিতীয়ত, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সত্তা ও 'স্বার্থকে' অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়ের মতাদর্শ প্রচার করা এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিকাশ বিনষ্ট করা। অর্থাৎ ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের যখন শেখানো হয় তাঁরা 'মুসলমান', তখন তাঁদের 'ইনগ্রুপ ফীলিং' বৃদ্ধি পায়, যার ফলে তাঁরা ভাবেন, তাঁরা হিন্দুদের থেকে আলাদা, অর্থাৎ হিন্দুদের প্রতি তাঁদের 'আউটগ্রুপ ফীলিং' জোরদার হয়। ধর্মের 'ইন্টিগ্রেটিভ ফাংশন' বা একীভূতকরণের ক্রিয়ার ফলে 'মুসলমান ঐক্য' দৃঢ় হয় এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাঁদের সামাজিক দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। মুসলমান কৃষক তখন মুসলমান জোতদারকে জোতদার হিসেবে দেখেন না,— স্বধর্মে বিশ্বাসী 'মিত্র' হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হন। পক্ষান্তরে মুসলমান কৃষক হিন্দু কৃষককে শ্রেণীমিত্র হিসেবে না দেখে 'হিন্দু' হিসেবে দেখেন এবং হিন্দু জোতদারের শোষণ অত্যাচার তখন তাঁর কাছে শ্রেণীশত্রুর শোষণ অত্যাচার হিসেবে না দেখা দিয়ে 'হিন্দুর' শোষণ অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায়। তখন তিনি আশ্রয় খোঁজেন শ্রেণীমিত্র হিন্দুকৃষকের কাছে নয়, ধর্ম এবং স্বধর্মীদের কাছেই, কারণ তাঁর মতে ধর্ম হোলো শোষিত প্রবঞ্চিত মানুষের শেষ

আশ্রয়স্থল। এর ফলে সমগ্র সমাজের সঙ্গে (যাব প্রধান অংশই হিন্দু) মুসলমানেব বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। এভাবেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাব পটভূমি স্বাধীন ভারতের প্রথম দিন থেকেই তৈরি হয়ে আছে— বিভিন্ন কারণ সৃষ্টি ক'রে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়।

সম্প্রতি বেতারের খবরে জানা গেল প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষকদের উপদেশ দিয়েছেন শিশুদের মনে ধর্মচেতনার বিকাশ ঘটাতে। ব্যাপারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মভীরু মানুষকে শাসন করা সহজ, তাই শাসকশ্রেণী চায় সাধারণ মানুষ মন্দির মসজিদ কোরাণ অবতার ইমাম ভাগ্য পুনর্জন্ম নিয়ে দিন কাটাক, আর এই সমাজব্যবস্থা টিকে থাকুক, টিকে থাকুক মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে। সংবিধান যে-কোনো ধর্মের প্রচারে বা প্রসারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে, আর শাসকশ্রেণী এ কাজটি করেছে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে, কারণ ভারতীয় সমাজকাঠামোর প্রধান স্তম্ভই হোলো বর্তমান ভূমিব্যবস্থা এবং এই ভূমিব্যবস্থার পরিপূরক মতাদর্শগত শক্তি হোলো ধর্ম। তাই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনসাধারণকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা আর ধর্মীয় গোঁড়ামীর অন্ধকারে রেখে দিয়ে শুরু হোলো মহান ভারতের গণতন্ত্রের অভিযান! অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইতিহাসকে কলুষিত করলেও ধর্মের রাজনীতি অব্যাহত থাকলো; এবং তা রাজনৈতিক নেতাদের মুনাফা লোটার একটি সহজ উপায় হয়ে উঠলো।

'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' বিজয় লাভের পর, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশবিভাগের পর ভারতের হতচকিত মুসলমানরা আবিষ্কার করলেন 'হিন্দুস্থানে' তাঁরা 'সংখ্যালঘু'। প্রতিবেশী হিন্দুদের কাছে তাঁদের প্রাপ্য হোলো ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস আর সংশয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুত্বের নবজোয়ার মুসলমানদের ভীতি আর আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠলো। 'সংখ্যাগুরুর' আত্মঘোষণা যেখানে[৫] প্রবল, 'সংখ্যালঘুর' দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে সঙ্কীর্ণ এবং আত্মমগ্ন হ'তে বাধ্য। হিন্দুত্ববোধের জয়ঢাক তাই মুসলমানদের 'ইনগ্রুপ ফীলিং' বৃদ্ধি করলো। আক্রমণাত্মক হিন্দুত্ববোধের প্রতিক্রিয়ায় এক রক্ষণাত্মক ইসলামবোধের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। অবিভক্ত ভারতের মতো স্বাধীন ভারতবর্ষেও তাই 'হিন্দু আইডেনটিটি' আর 'মুসলমান আইডেনটিটি' বিনষ্ট হোলো না। একদা জিন্না সাহেবের 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' এবং দেশবিভাগের বিরোধী এম.আর.এ. বেগ সাহেব এ প্রসঙ্গে বলেন, "...স্বাধীন ভারতে হিন্দুদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আত্মঘোষণা থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'মুসলমান আইডেনটিটি' বজায় রাখা হয়..."।[৬] আর এই 'মুসলিম আইডেনটিটি' বজায় রাখার জন্য ভারতের মুসলমানরা আঁকড়ে ধরলেন ধর্মান্ধতা, আলিগড়, উর্দু, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, আর 'প্যান ইসলামিক' দৃষ্টিভঙ্গি। একদিকে সংখ্যালঘুর স্বাভাবিক হীনমন্যতা, সঙ্কীর্ণতা, এবং 'প্যান ইসলামিক' দৃষ্টিভঙ্গি; অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের উন্নাসিকতা, ঘৃণা, আর অবিশ্বাস ভারতের মুসলমানদের এক গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত করলো। অন্য কথায় বলা যায় যে, তাঁরা আগে মুসলিম— না আগে ভারতীয়,— এই জটিল প্রশ্নের আবর্তে পতিত হলেন। অনেকেই মনে করলেন খাঁটি মুসলমান থাকতে গেলে ভারতীয় হওয়া যায় না, এবং ভারতীয় হ'তে গেলে খাঁটি মুসলমান থাকা যায় না। বেগ সাহেবের কথায়, "মুসলমানরা শারীরিকভাবে ভারতে বাস করেন, কিন্তু তাঁদের মন বাঁধা থাকে পশ্চিম এশিয়ায়. "

হিন্দুসাম্প্রদায়িকতা একে দেশদ্রোহী এবং ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে চিত্রিত করলো;— ফলে হিন্দুসম্প্রদায়িকতা বিস্তার লাভ করলো এবং আরও সংহত হোলো। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানরা নিজেদের আরও গুটিয়ে নিলেন ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার মধ্যে। দু'পক্ষের মধ্যে একপক্ষ সাম্প্রদায়িক হ'লে (এখানে সাম্প্রদায়িক কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা মুসলমানের ছোঁয়া জল খান না, বা মুসলমানের ঘরে তৈরি খাবার খান না তাঁরাও সাম্প্রদায়িক, যেমন— মহাত্মা গান্ধী!) অপরপক্ষও যে সাম্প্রদায়িক হবে— এ তো সরল সত্য। কাজেই 'মুসলমান অস্তিত্বের' কাছে মূল প্রশ্ন দাঁড়ালো, 'আমরা' বনাম 'ওরা'। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাও এই দর্শন থেকে মুক্ত হ'তে পারলেন না। হিন্দুদের আচরণ মুসলমানদের ভুলতে দিলো না যে, তাঁরা 'মুসলমান'। অপরদিকে ইসলাম-ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি এবং মোল্লা-ইমামের দল ও সুবিধাবাদী হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা (আসগর আলী ইঞ্জিনীয়ার তাঁর প্রবন্ধে মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের অসৎ দুর্নীতিগ্রস্ত ও সুবিধাবাদী বলেছেন।[৮] এ প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের লেখা একটি চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ "এম.এল.এ., এম.পি., কিংবা মন্ত্রীগণ মুসলমান হ'তে পারেন কিন্তু তাঁরাই মুসলমান সমাজের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন এবং করছেন। মুসলমান-ধর্মাবলম্বীদের সুখসুবিধার চেয়ে নির্বাচনের সময় এই সম্প্রদায়ের জোটবদ্ধ ভোটের দিকেই এইসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধিক মনোযোগ। পাঁচ বৎসর পর পর স্বধর্মী 'ভাইবেরাদারদের' দুঃখ-দুর্দশায় চোখের পানি ফেলতেই— তাঁদের যত কেরামতি!"[৯] 'ইসলামবোধ', 'মুসলমান সমস্যা' ও 'মুসলমান স্বার্থের' জিগির তুলে হিন্দু-সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখলেন। ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানরা পরিণত হলেন 'ভোট ব্যাঙ্কে'— যার সমর্থন ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই মসনদে আসীন হওয়া সম্ভব নয়।

আসগব আলী ইঞ্জিনীয়ার মুসলমানদের ত্রিবিধ সমস্যার কথা বলেছেন,— (ক) ধর্মীয়, (খ) সাংস্কৃতিক-শিক্ষাগত ও ভাষাগত, এবং (গ) অর্থনৈতিক।[১০] অতএব নির্বাচনের মরশুমে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই মুসলমান-জনসাধারণের কাছে 'কসম' খেয়ে থাকে যে, মুসলমান সমস্যার সমাধান করা হবে। রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সেকুলারিজমের পরম অর্থ হোলো মুসলমানদেব ঘরোয়া ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ না করা, অর্থাৎ 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' সংশোধন না করা। 'মুসলিম ভোট' হারাবার আশঙ্কায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই এ ব্যাপারে হাজার প্রতিশ্রুতি উদ্‌গীরণ ক'রে থাকে। 'মুসলিম আইডেনটিটির' দ্বিতীয় প্রতীক হোলো উর্দু এবং আলিগড়। যদিও কোনো কোনো মুসলমান লেখক বলেছেন যে, 'উর্দু সেন্টিমেন্ট' বজায় রাখা হয় শুধুমাত্র ভোট সংগ্রহের জন্য; তা সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন উর্দু হচ্ছে মুসলমানদের ভাষা,[১১] (যা সম্পূর্ণ ঠিক নয়), অতএব উর্দুকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে হবে। রাজনৈতিক নেতারা বহুদিন থেকেই 'উর্দু সেন্টিমেন্টকে' ভোটের ক্ষেত্রে একটা 'ইস্যু' ক'রে তুলেছেন।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংখ্যালঘু চরিত্র' বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিও তো আসলে 'মুসলমান ভোট' সংগ্রহের একটি অন্যতম উপায়।

ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন মানুষকে পেট ভ'রে খাওয়ানো বর্তমান সমাজকাঠামোয়

কারো পক্ষেই সম্ভব নয়; তাই ভোটপ্রার্থীরা এক পৃথক— মূল সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন এক 'মুসলিম দারিদ্র্যের' সন্ধান পান; এঁরা চান, মুসলমানরা 'মুসলমানই' থাকুক— অর্থাৎ 'মুসলিম আইডেনটিটি' বজায় থাকুক এবং কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামে মুসলমানরা যেন অংশ গ্রহণ না করে।

ভোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'প্যান ইসলামিক' চেতনাও কখনো কখনো কাজ ক'রে থাকে। এবং তা ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতিকেও প্রভাবিত ক'রে থাকে। এটা বোঝা যায় আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকে কারমাল সরকারকে স্বীকৃতি দানেব ব্যাপারে ইন্দিরা সরকারের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখে। ইন্দিরা সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সোভিয়েত ঘেঁষা এটা অনেকেই স্বীকার করবেন, এর প্রমাণ কম্পুচিয়ার হেং সামরিন সরকারকে স্বীকৃতি দান। কিন্তু 'মুসলমানদের দেশ' আফগানিস্তানে বিধর্মী সোভিয়েতেব মাতব্বরী ভারতের মুসলমানরা ভালো চোখে দেখেন না। এর ওপরে কারমালকে স্বীকৃতি দিলে ভারতের মুসলমানদের 'প্যান ইসলামিক' চেতনা আহত হবে এবং ইন্দিরা তাঁদের বিরাগ ভাজন হবেন। কারমালকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে ইন্দিরা সরকারের দ্বিধাদ্বন্দ্বের অন্যান্য কারণও আছে, কিন্তু 'মুসলমান ভোট' একটি অন্যতম কারণ।

সাধারণভাবে মুসলমান জনসাধারণ নির্বাচনের সময এমন দল বা প্রার্থীকেই মনোনীত ক'বে থাকেন, যাঁর হাতে তাঁদের চিন্তাধারা অনুযায়ী 'মুসলমান আইডেনটিটি' ক্ষুণ্ণ হবে না (হিন্দুদের মধ্যে 'কাস্ট ভোট' এইভাবে সংগ্রহ করা হয়)। তাই সব রাজনৈতিক দলই চেষ্টা করে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাতে, অথবা— মুসলমান ধর্মগুরু বা রাজনৈতিক নেতাদের আমদানি করতে। তাই 'সেকুলার' ইন্দিরা গান্ধী অথবা 'সেকুলার' মোরারজী দেশাইদেব কাছে দিল্লির ইমাম বুখারী অথবা মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদেব এত কদর!

স্বাধীন ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারেব সামগ্রিক আলোচনা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এর জন্য একাধিক ব্যক্তির দীর্ঘকাল ব্যাপী অনুসন্ধান এবং গবেষণা প্রয়োজন। আমরা শুধুমাত্র এর সাধারণ দিকটি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করবো। ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু রিপোর্টের ভিত্তিতে আমাদের রাজ্যে ধর্মান্ধতা ও রাজনীতির সম্পর্কের ইতিবৃত্ত বুঝবার চেষ্টা করবো।

বিভিন্ন দিক থেকে ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচন ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল ক'রে আছে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই এই নির্বাচনে ধর্ম এবং ধর্মগুরুদের নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে;— যেমন শ্রীমতি গান্ধী দিল্লির শাহী ইমামকে কব্জা করতে পেরেছিলেন এবং শ্রীযুক্ত চরণ সিং 'জয়দেব বাবা'র আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গেও ভোটের লড়াইয়ে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়; এ কাজে শ্রীমতি ইন্দিরার দল আর 'স্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী' মার্ক্সবাদীরাও সুকৌশলে ভোটাবদের ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করে।

প্রথমেই ধরা যাক ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রের কথা। সংখ্যাগরিষ্ঠ না হ'লেও শতকরা ৩৫ জন মুসলমান এখানে। কাজেই এই কেন্দ্রে 'মুসলমান ভোট' একটি উল্লেখযোগ্য 'ফ্যাক্টব'।

মুসলমান ভোট পাবার আশায় কংগ্রেস(ই.) এই কেন্দ্রে একজন মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করায়। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সি.পি.আই.(এম.)-এর প্রার্থী হিন্দু হ'লেও তাঁর পার্টি রাজ্যস্তরে খ্যাতিমান কোনো হিন্দু রাজনীতিককে না এনে স্থানীয় মুসলমান নেতাদের আমদানি করে। ভোটের ক্ষেত্রে এই ধরনেব নেতারা 'মিডলম্যান'-এব কাজ ক'রে থাকেন। মুসলমান ভোটারদের সঙ্গে 'কমিউনিকেশন'-এর জন্য মার্ক্সবাদের চেয়ে তাঁদের 'ইনগ্রুপ ফীলিং' অনেক বেশি কার্যকরী। সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "সি.পি.আই.(এম.)-ও তাদেব ডায়মণ্ডহারবারের এম.এল.এ. আবদুল কায়ুম মোল্লার প্রভাবের উপর অনেকখানি নির্ভর করছে। একথা ঠিক যে, কায়ুম অনেক মুসলমান ভোট সি.পি.আই.(এম.)-এব শিবিরে এনে দিতে পারবেন। এছাড়া ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রের বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন সি.পি আই.(এম.) নেতা এম সৈয়দ, রজ্জাক মোল্লা প্রমুখেবা।"[১২]

অপরদিকে কংগ্রেস(ই.)-র একজন স্থানীয় নেতা সাংবাদিককে জানান, "আমরা এবার জিতবো কেন জানেন? কারণ আমাদের প্রার্থী এবার মুসলমান। আমাদের দাবি ছিল এবার মুসলমান প্রার্থী দিতে হবে।" অর্থাৎ কংগ্রেস(ই.)-র কাছেও কোনো প্রার্থীব রাজনৈতিক গুণাবলী প্রধান ব্যাপার নয়, প্রধান ব্যাপার হোলো তাঁর ধর্মীয় পরিচয়।

এরপর মালদহ কেন্দ্রের কথা ধরা যাক। মালদহ কেন্দ্রে ভোটারদের মধ্যে শতকরা ৪১ জন মুসলমান। অতএব কংগ্রেস(ই.) এই কেন্দ্রে একজন জবরদস্ত মুসলমান প্রার্থী দাঁড করালো। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টরাও পিছিয়ে থাকলেন না। তাঁরা এই কেন্দ্রে জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জীদেব নিয়ে তো গেলেনই, কিন্তু হিন্দু কমিউনিস্টের পক্ষে 'মুসলমান ভোট' সংগ্রহের আশায় তাঁরা 'মুসলমান কমিউনিস্টদের' দিয়ে সভা-সমিতি করালেন,— "সি.পি.আই.(এম.) রাজ্য সবকারের মুসলমান মন্ত্রীদের এই কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছেন। গত কয়েক দিনে বিধানসভার স্পীকার মনসুর সাহেব থেকে শুরু ক'রে মন্ত্রী আবদুল হালিম, মহম্মদ আমিন, ও বারি সাহেব একাধিকবার ঘুরে এসেছেন।"

এখানেও মার্ক্সবাদীদের একই কৌশল, বিপক্ষ দলের 'মুসলমান প্রার্থীর' সঙ্গে পাল্লা সমান করার জন্য 'মুসলমান কমিউনিস্টদের' আমদানি।

এই কেন্দ্রের কংগ্রেস (ই.)-র প্রার্থী সাংবাদিকমশাইকে জানালেন, "আমি সি.পি.আই.(এম.)-কে চ্যালেঞ্জ ক'রে বলছি— যদি 'হিন্দু ভোট' কম পেয়ে আমি জয়লাভ করি তবে সেদিনই পদত্যাগ করবো। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম.... আমার কর্মী ও সমর্থকদের শতকরা ৭০ ভাগই হিন্দু।"[১৩] হায়! ভোটে জয়লাভের পর এ সমস্ত হিসেবনিকেশ আর কেউ করেন না। ভাবতে অবাক লাগে এই দলের নেত্রীই— শাহী ইমাম বুখারী সাহেবের কাছ থেকে সেকুলারত্বের সার্টিফিকেট জোগাড় করেন এবং কোলকাতা হাওড়া সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধর্মীয় নেতাটিকে দিয়ে প্রচার-কাজ পরিচালনা করেন, যদিও অনেক জায়গায় ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর উপস্থিতি ছাড়া ইন্দিরাজীর প্রচার-কাজ সম্পূর্ণ হয় না,— ভারতের সব ভোটার তো আর বরকত সাহেবের মতো খাঁটি 'সেকুলার' নন!

জঙ্গীপুর কেন্দ্র মুসলমানপ্রধান অঞ্চল, ভোটদাতাদের শকতরা ৫৫ ভাগ মুসলমান।

সুতরাং কংগ্রেস (ই) এই কেন্দ্রে 'মুসলমান প্রার্থী' দাঁড় করালো, আর "কংগ্রেস(ই.)-এর হাজি সাহেবকে ঠেকাতে সি.পি.আই.(এম) মাদ্রাসা শিক্ষক আবেদিন সাহেবকে বেছে" নিলো। একই সঙ্গে মাদ্রাসায় শিক্ষাদানকারী ও মার্ক্সবাদ-চর্চাকারী এই প্রার্থীর পক্ষে সি.পি.আই.(এম.)-এর জেলা সম্পাদক সাংবাদিকমশাইকে জানালেন, "আমাদের প্রার্থী শুধু মাদ্রাসা শিক্ষকই নন, তিনি রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ডেরও সদস্য। সুতরাং সি.পি.আই.(এম) প্রার্থী জয়ী হবেই।"[১৪] —আদা এবং কাঁচাকলার কী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান! কংগ্রেস(ই) প্রার্থী পরম ধার্মিক হ'তে পারেন, কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামীর ডিপো মাদ্রাসার শিক্ষক ও রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ডের সদস্য কী ক'রে মার্ক্সবাদী হন, রাজনৈতিক-দর্শনে তিনি কতটা সত্যনিষ্ঠ— এ প্রশ্ন অসঙ্গত নয়।

আমাদের আলোচনায় 'মুসলমান ভোট' সংগ্রহের বিভিন্ন উপায়ের কথাই এসেছে, কিন্তু 'হিন্দু কাস্ট ফীলিং' বা মুসলমান-মনোভঙ্গির মতো খৃষ্টানদের মধ্যেও 'ইনগ্রুপ ফীলিং' আছে এবং রাজনৈতিক নেতারা খৃষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রায় একই উপায় অবলম্বন করেন। এমনই একটি কেন্দ্র হোলো আলিপুরদুয়ার, আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে ভোটারদের ৯০ শতাংশই খৃষ্টান। তাই 'মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী' আর.এস.পি. 'খৃষ্টান প্রার্থী' দাঁড় করালো, কংগ্রেসও খৃষ্টান প্রার্থীই বেছে নিলো; কিন্তু কংগ্রেস(ই.)-র হিন্দু প্রার্থী। সাংবাদিকের কথায়, "আলিপুরদুয়ারের খৃষ্টানদের ভোট কাড়াকাড়িতে আর.এস.পি. প্রার্থী এবং কংগ্রেস প্রার্থী দু'জনেই ধর্মগুরু গীর্জার ফাদারদের নামিয়েছেন। আর হিন্দু হ'লেও .." কংগ্রেস(ই.) প্রার্থীর "কর্মীদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টান। তাঁরা প্রচার করছেন: দ্যাখো, ইন্দিরা গান্ধী খৃষ্টানদের কত ভালোবাসেন! তাই কোলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেস(ই.)-এর সদর দপ্তরের দোতলা বাড়িটা মাদার টেরেসাকে তিনি দান ক'রে দিয়েছেন।"[১৫] —ধন্য ভারতের সেকুলারিজম! ইন্দিরা গান্ধীর 'সেকুলারিজম'-এর ছত্রছায়ায় ইমাম বুখারী, জয়গুরু, আর টেরেসা একাকার হয়ে যান! বহু প্রচারিত সেকুলার রাষ্ট্রের রাজনীতিকদের নির্বাচনী রাজনীতিতে জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস এক্সপ্লয়েট করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় না। এমন-কি কমিউনিস্টরাও টিকি-পৈতে-পাদ্রী-মাদ্রাসা-মার্ক্সবাদ একই সঙ্গে চালিয়ে যান।

আমরা আগেই বলেছি, ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান এবং গবেষণা প্রয়োজন। কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতির প্রক্রিয়ায় দলমতনির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলি ভোট সংগ্রহের জন্য ভোটারদের, বিশেষত অ-হিন্দু (জাতিপ্রথায় কণ্টকিত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন 'কাস্ট গ্রুপ'-এর চিন্তা-চেতনাকে এক্সপ্লয়েট করা হয়) ভোটারদের ধর্মবিশ্বাস-সঞ্জাত স্বার্থ-চেতনাকে যে বিভিন্নভাবে এক্সপ্লয়েট ক'রে থাকে, আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাতে পারে।

আশঙ্কা হয়, ভারতবর্ষে প্রচলিত নির্বাচন প্রথা যতদিন টিকে থাকবে, ভোটের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ততদিনই টিকে থাকবে, আর ভারতীয় সেকুলারিজম-এর আবরণের মধ্যে 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতিও অব্যাহত থাকবে। কারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হ'লে ধর্মীয় উন্মাদনাও কমবে না এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারও বন্ধ হবে না।

ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ এবং হিন্দুদের মধ্যে জাতিদ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। লক্ষ্ণৌর ইমাম আবু তৈয়েব আহ্‌মেদ বলেছেন— "প্রত্যেক রাজনীতিকই 'সেকুলারিজম'-এর কথা বলেন এবং তা প্রচার করেন, কিন্তু রাজনীতিকরা জনসমক্ষে এক কথা বলেন এবং কাজে তার বিপরীতটি করেন। রাজনীতিকরা যদি কিছু (প্রচার) ক'রে থাকেন, তা হোলো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা।"[১৬] সুতরাং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমনের দায়িত্ব কিন্তু সচেতন জনসাধারণকেই নিতে হবে। কারণ এটি জনসাধারণের সমস্যা; আর জনসাধারণের কোনো সমস্যার সমাধানই শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি রাজনৈতিক দলগুলি করতে চায় না বা পারে না।

ভারতে একজন মুসলমান রাষ্ট্রপতি হ'তে পারেন, একজন মুসলমান 'কালী পুজো কমিটির' সম্পাদক হ'তে পারেন, বা একজন হিন্দু-যুবক গো-মাংস খেতে পারেন,[১৭] কিন্তু এগুলি প্রমাণ করে না ভারতবর্ষে সেকুলার সমাজ সৃষ্ট হয়েছে। এলিট সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মুসলমান রাষ্ট্রপতি বা প্রাক্তন অস্পৃশ্যদের নেতা বাবু জগজীবন রাম কোনো অর্থেই জনসাধারণের কাছের লোক নন। এঁরা শাসকশ্রেণীগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন,— শ্রমিক, কৃষক, চামার, চণ্ডাল, বা নিরন্ন মুসলমানের প্রতিনিধি নন।

সত্যিকারের সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে উঠতে পারে একমাত্র শ্রেণীসংগ্রাম তথা গণআন্দোলন মারফৎ। তখন হিন্দু আর 'হিন্দু' থাকবেন না, মুসলমান আর 'মুসলমান' থাকবেন না। তাঁরা হবেন গণসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী শ্রমজীবী মানুষ! এ কাজে বাধা দিচ্ছে এবং দেবে পণ্ডিত-পুরোহিত-মোল্লা-ইমামের দল;— এরই একটি নজীর আলোচনা করা যেতে পারে। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত 'জামাত-এ-ইসলামী-হিন্দ্'-এর ষষ্ঠ সর্বভারতীয় 'ইজতেমা'-এ দেশ-বিদেশের বহু প্রতিনিধি যোগদান করে। এই অনুষ্ঠানে আমীর-এ-জামাত মৌলনা মহম্মদ ইউসুফ ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যের কথা, সেকুলারিজম-এর কথা, এবং সমাজতন্ত্রের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতের মুসলমানরা এক বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে আছেন, এ ব্যাপারে তিনি সাম্প্রদায়িক শক্তি, পুলিশ, এবং প্রশাসনকে অভিযুক্ত করেন। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় হিন্দু পুলিশ ও হিন্দুকর্তারা যে বিভিন্নভাবে হিন্দু-সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সাহায্য ক'রে থাকে, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮] কিন্তু ইউসুফ সাহেব যখন বলেন, মুসলমানদের সম্যকভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ যে, কমিউনিজম ইসলামকে জাতীয়জীবনেও সহ্য করে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সহ্য করে না,[১৯] তখন তাঁর সঙ্গে একজন হিন্দুগুরু, 'অবতার', বা 'বাবা'র কোনো তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধর্মগুরুদের একই প্রচেষ্টা— সমাজজীবনের অগ্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি করা।

'মুসলমানরা' কথাটাই অস্বস্তিকর এবং অবৈজ্ঞানিক। তাঁরা 'হোমোজিনিয়াস কমিউনিটি' নন! উৎপাদন-উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কই বস্তুত কোনো ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট করে, তাঁর ধর্ম নয়। ভারতের মুসলমানরাও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অধিবাসী; তাই তাঁদের মধ্যেও আছে শোষক-শোষিত, শ্রমিক-কৃষক-কারিগর-জোতদার, মন্ত্রী, আর ভোটে খাটা ক্যাডার। তাই ভারতের দরিদ্র শোষিত হিন্দুরাই দরিদ্র মুসলমানের প্রকৃত মিত্র;— মুসলমান

রাষ্ট্রপতি বা আরবের কোনো 'টাকার কুমীর' নন। "মুসলমানদের উভয় সঙ্কট হোলো কী ক'রে ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক দিকেব মধ্যবর্তী 'গর্ডিয়ানগ্রন্থী' ছিন্ন করবেন, যা তাঁদের পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অনুভূতিগত 'নাভিরজ্জু' ছিন্ন করতেও সক্ষম করবে এবং এ সত্ত্বেও তাঁরা মুসলমানই থাকবেন।"[২০] আমাদেব মতে একমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মিলিত গণআন্দোলনই ভারতের শ্রমজীবী মুসলমানদের এই উভয় সঙ্কট থেকে মুক্তি দিতে পারে। শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলন-ভিত্তিক ঐক্যই ভারত পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

ভারতবর্ষের সমাজ একটি খাঁটি 'প্লুরাল সোসাইটি', কিন্তু এখানে জাতীয় সংস্কৃতি ব'লে যা চালানো হয় তা প্রধানত রক্ষণশীল হিন্দু-সংস্কৃতি। আকাশবাণী বা টেলিভিশন-এর বেদ-বাইবেল-কোরাণ পাঠ মারফৎ সমস্ত ধর্মকে 'সম মর্যাদা' দানের প্রচেষ্টা একদিকে হাস্যকর, অন্যদিকে ক্ষতিকর,— এ হোলো দ্বি-জাতি তত্ত্বের আধুনিক রূপ। তাই 'সেকুলার' সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠতে পারে গণসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার মারফৎ। ইদ বা দুর্গা পুজো নয়;— পয়লা মে, পয়লা বৈশাখ ও পঁচিশে বৈশাখ, ভাবতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে, বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বা ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা তথা হিন্দু-মুসলমান শ্রেণীসংগ্রামী ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের জন্ম অথবা আত্মাহুতি দিবস পালন.... ইত্যাদি প্রকৃত সেকুলার অনুষ্ঠান হ'তে পারে। ব্রিটিশ ভাবতেব অসংখ্য গণসংগ্রাম দেশপ্রেম ও শ্রেণীস্বার্থ-ভিত্তিক হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বার বার প্রমাণ করেছে, প্রমাণ কবেছে— সাধারণ মানুষ চিরকালই অসাম্প্রদায়িক। ১৯৩০ সালে পেশোয়াবেব গণজাগবণে 'রয়েল গাড়োয়ালী রাইফেল্‌স্'-এর হিন্দু সৈনিকরা সংগ্রামরত নিরস্ত্র মুসলমান জনসাধারণের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি হন। মহাত্মা গান্ধী এই সৈনিকদের শপথভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রে তীব্র নিন্দা করলেও এই মহান দেশপ্রেমিক সৈনিকরা তাঁদেব বিচারের সময় বলেন, "আমরা আমাদের নিরস্ত্র ভাইদের ওপর গুলি চালাবো না।" তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হুকুম অস্বীকার ক'রে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। এই ইতিহাস হোক পথনির্দেশিকা,— তেলেঙ্গানা, তেভাগা আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, আর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের স্মৃতি সজীব থাকুক আমাদের চেতনায়,— শ্রমজীবী মানুষই ইতিহাস তৈরি করেন।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১। আনন্দবাজার পত্রিকা; ২.৮.১৯৭৭
২। Vide, Moin Shakir. Religion and Politics. Role of Islam in Modern India Economic and Political Weekly. Annual Number, 1979. p 469
৩। Paul Brass, Language Religion and Politics in North India, Delhi 1975 p. 16
৪। Moin Shakir, op. cit, p. 471.
৫। Ibid, এবং Mohammad Ghouse, Secularism Socity and Law in India Delhi 1973 Chapter III.
৬। M R A. Baig. The Muslim Dilemma in India Delhi 1974 p 112

৭। Suman Dubey, Bhabani Sengupta, Prabhu Chawla and Sumit Sethi Muslims Politics of Insecurity India Today, September 1-15, pp 16-22

৮। Asghar Ali Engineer What Have the Muslim Leaders Done? Economic and Political Weekly, June 17, 1978 pp. 985-986.

৯। আজকাল, ২৫ ৪ ১৯৮১

১০। Asghar Ali Engineer op cit. p 985

১১। M R.A Baig op. cit p III

১২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ ১২.১৯৭৯

১৩। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩.১২.১৯৭৯

১৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮.১২.১৯৭৯

১৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০.১২.১৯৭৯

১৬। Suman Dubey and others op. cit p 19

১৭। Hossainur Rahaman. Being Muslims in India Give and Take of Secular Harmony The Statesman. 9.9.1980.

১৮। Mohammad Ghouse op cit Chapter IV.

১৯। Syed Majeedul Hasan Indian Muslims Find Themselves In Danger Sunday March 22, 1981. p 45.

২০। M R A. Baig. op. cit p. 125

[মধ্যাহ্ন ১৯৮১]

'সেকুলার' ভারতে রাজনৈতিক হিন্দুত্ব

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে দেশভাগ আর সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিজয় লাভের পর কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত আর অশ্রুর কথা বিস্মৃত হয়ে স্বাধীন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর অজ্ঞেয়বাদী নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু নেতারা স্বাধীন ভারতে 'সেকুলারিজম'-এর আদর্শ পালনের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভারতের কাণ্ডারীরা জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত যে নীতি অনুসরণ করেন তাকে বলা উচিৎ 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি' বা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'— তা 'সেকুলারিজম' নয়। এক মার্কিনী পণ্ডিত এই নীতিকে বলেছেন 'মালটি রিলিজিয়াস কালচারাল পলিসি'।[১]

আমাদের বিচারে ভারতরাষ্ট্রকে 'সেকুলার রাষ্ট্র' বলা ভ্রান্তিকর; কারণ কোনো সেকুলার রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মসজিদ ভাঙা, বা দশটি ঘোড়া বলি দিয়ে 'মানব কল্যাণে অশ্বমেধ যজ্ঞ'[২] সম্পন্ন হওয়ার মতো অপকর্ম কখনোই সংঘটিত হ'তে পাবে না, যা না-কি মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তনের নামান্তর।

কিছুদিন আগেও শাসকবর্গ সেকুলারিজমের অপব্যাখ্যা ক'রে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই শব্দগুচ্ছের ব্যাপক প্রচার করতেন নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য। প্রকৃত সেকুলারিজমের পরিবর্তে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল এর ছত্রছায়ায় সমস্ত রকমের ধর্মান্ধতা আর গোঁড়ামিকে আশ্রয় দান করা। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই আপ্তবাক্যের পরম অর্থ ছিল বিভিন্ন পন্থায় আধ্যাত্মিকতার চর্চা। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "ভারতে 'সেকুলারিজম'-এর অর্থ ধর্মবিরোধিতা বা নাস্তিকতা নয়, এমন-কি তা ইহজাগতিক ভোগবিলাসের ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করে না। এখানে 'সেকুলারিজম'-এর তাৎপর্য হোলো সর্ববিধ আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ— যা বিভিন্ন পন্থায় অর্জন করা যেতে পারে।"[৩]

ভারতের সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডঃ জাকির হুসেন বলেন, "এক সেকুলার প্রজাতন্ত্রে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে কারণ সেকুলার প্রজাতন্ত্রেই হৃদয়ের প্রসারতা, সহিষ্ণুতা, এবং উভয়কে ধারণ করার মতো মনোভঙ্গি থাকে....। সেকুলার প্রজাতন্ত্র ধর্মবিরোধী প্রজাতন্ত্র নয়। এই প্রজাতন্ত্র সহিষ্ণু, উদার ও নিরপেক্ষ, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মমতের সাথে জড়িত নয়, অথচ জাতীয় জীবনের মূল্যবান উপাদানগুলির বিকাশে তৎপর।"[৪]

শাসক-এলিট 'সেকুলারিজম'-এর নামে ধর্মনিরপেক্ষতার এই আদর্শ প্রচার করলেও এবং 'জীবনের পরমার্থ' অন্বেষণের বিভিন্ন পন্থার সরব উপস্থিতি ও বিভিন্ন পন্থায় ঈশ্বর

উপলব্ধির অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হ'লেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐক্য বা সহজ সম্পর্ক আজও স্থাপিত হয়নি। সরকারি প্রশ্রয়ে মুসলমান নিধন বা দাঙ্গাহাঙ্গামা ইত্যাদি স্বাধীন 'সেকুলার' প্রজাতন্ত্রের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস আজও টিকে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ শাসকদের অনুসৃত 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি' অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা বা সমস্তরকমের ধর্মান্ধতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ যোগানোর নীতি।

ভারতের সংবিধানে তথাকথিত 'সেকুলারিজম'-সংক্রান্ত ধারাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি হোলো— যে-কোনো ব্যক্তি অবাধে তাঁর ধর্ম পালন প্রচার ও প্রসার করার স্বাধীনতা পাবেন। সংবিধানে প্রদত্ত সমস্ত ধর্মকে সমমর্যাদা দানের নীতি কোনোমতেই ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার কথা বলে না।

১৮৮৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে নরমপন্থী নেতারা তাঁদের সংগঠনকে 'জাগতিক স্বার্থ সাধন'-এর সংগঠন ব'লে অভিহিত করেন এবং বিভিন্ন ধর্মের রাজনীতিবিদ্‌দের একই সংগঠনে মিলিত হবার দৃষ্টান্তকেই 'সেকুলার রাজনৈতিক আন্দোলন' হিসাবে বর্ণনা করেন। ১৯২৮ সালে 'মতিলাল নেহরু রিপোর্টে' কংগ্রেসের সেকুলারিজম-সংক্রান্ত নীতি স্পষ্ট আকার ধারণ করে। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়েব ধর্মাচরণের অবাধ অধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথ। ১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রত্যেক নাগরিক তাঁর ধর্ম পালন প্রচার ও প্রসার করার পূর্ণ অধিকার পাবেন। ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, রাষ্ট্র 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি' বা 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নীতি অনুসরণ করবে।[৫]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, ব্রিটিশ-ভারতে কংগ্রেসের নেতারা 'সেকুলারিজম'-এর অর্থ করেছিলেন বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের অবাধ অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান ও রাষ্ট্রের তরফ থেকে 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি' বা 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নীতি পালন। এখানে বলা উচিৎ জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত কংগ্রেসী নীতি কোনোক্রমেই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ধর্মীয় নীতির বিরোধী ছিল না। ধূর্ত ব্রিটিশ প্রকৃতপক্ষে 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতিই অনুসরণ করতো; যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ও তাতে ইন্ধন যোগানো। ব্রিটিশের ঘোষিত নীতি ছিল সমস্ত রকমের ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং কুসংস্কারে উৎসাহদান। সাম্রাজ্যবাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি হিন্দুর গো-রক্ষা আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং মুসলমানের গো-হত্যায় প্ররোচনা দিতো এবং উভয় সম্প্রদায়কেই সরকারি সমর্থন যোগাতো। কোম্পানি-সরকার ১৮১০ সালে বাঙলায় বিভিন্ন মন্দির ও ১৮১৭ সালে মাদ্রাজে মন্দির-মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইন পাশ করে। ব্রিটিশ-ভারতে সাম্রাজ্যবাদ অভূতপূর্ব শোষণ-লুণ্ঠন ও দমন-পীড়ন চালালেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈবীতা সৃষ্টি করার জন্য ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামীর রক্ষাকর্তা ও উৎসাহদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 'নেটিভদের উন্নতির' জন্য এই একটিমাত্র বিষয়েই শ্বেতপ্রভুদের ছিল শ্যেনদৃষ্টি। অন্ধকার ভারতে আধুনিকতা ও সভ্যতার বার্তাবাহী ইংরেজ— হিন্দু-মুসলমানেব ধর্মীয় উৎসবে চিবাচবিত মধ্যযুগীয় আড়ম্বব ও জাঁকজমকের ব্যবস্থা কবে।

'রমজান মাস'-এর সূচনায় অযথা আয়োজন; বর্ষার প্রারম্ভে নারকেল ফাটিয়ে ঋতু বন্দনা: অথবা কৃষিকর্মের অনুকূল আবহাওযা কামনায় পুরোহিতের পূজার্চনার ব্যবস্থা— ইত্যাদি ছিল 'সদাশয়' ইংরেজ বাহাদুরের কৌশল। ১৮৪১ সালে ব্রিটিশ-পুঁজিবাদের রিফর্মিস্ট চিন্তার কারণে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামী-পূর্ণ আড়ম্বর থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি-সরকার ও ব্রিটিশ-অফিসারদের দূরে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার এক আদেশ জারি করে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের রীতি অনুসারে মন্দির-মসজিদে 'অর্থসাহায্যের নীতি' অব্যাহত থাকে; কারণ এর ফলে নেটিভদেব আনুগত্য অর্জন করা যাবে।

এক মার্কিনী পণ্ডিত ভারতরাষ্ট্রের 'সেকুলারিজম'-এর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে বলেছেন, "ব্রিটিশের 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটির' নীতি আধুনিক ভাবতের 'সেকুলার' রাষ্ট্রের (আদর্শের) অন্যতম ভিত্তিভূমি।" তিনি যথার্থই বলেছেন। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের শাসকবর্গ ব্রিটিশের পরিত্যক্ত 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটির' নীতিই (একটু নিম্নমাত্রায় মাত্র) অনুসরণ ক'রে চলেছেন। এঁদের উদ্দেশ্য হোলো সমস্ত রকমের ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব এবং অনৈক্য সৃষ্টি করা। আজকের শাসকবর্গ অর্থাৎ হিন্দু-পুনরুত্থানবাদীরা নির্লজ্জভাবে, নগ্নভাবে এই ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বিসর্জন দিয়ে হিন্দু-সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গাকারীদের পক্ষাবলম্বন কবেছেন।

এই পরিস্থিতিতে আমরা বিশেষ জোর দিয়েই বলতে পারি যে— ভারতবর্ষে আমূল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন না ঘটলে প্রকৃত 'সেকুলারিজম'-এর প্রতিষ্ঠা বস্তুত অসম্ভব। ধর্মের এমন সর্বব্যাপী অস্তিত্ব বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো দেশেই (অন্তত পশ্চিম দুনিয়ায়) দেখা যায় না। এখানে মানুষের 'জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত' প্রতিটি পদক্ষেপই ধর্মের নিগড়ে বাঁধা। ভারতের সমাজে কোনোকিছুই ধর্মবিরোধী অথবা অধর্মীয় নয়। হিন্দু বা মুসলমান— উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। জাতপাতের নিগড়ে বাঁধা হিন্দু-সমাজ সম্পর্কে রোনাল্ড সেগাল লিখেছেন,— এ ধরনের সমাজ শাসন করা সহজ, কিন্তু (এর) পরিবর্তন ঘটানো কঠিন।[৮] এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই যে, ভারতের শাসন-শক্তি বর্তমানের শোষণ-দমন-পীড়নমূলক সমাজব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন চান না।

স্বাধীন ভারতের সমাজকাঠামোর প্রধান স্তম্ভ হোলো বর্তমান ভূমিব্যবস্থা; আর এই ভূমিব্যবস্থার পরিপূরক মতাদর্শগত শক্তি হোলো ধর্ম, বিশেষত হিন্দুধর্ম। তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতের শাসকরা সমস্তরকমের ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। এই ধর্মান্ধতার ফলেই নমশুদ্র বা অন্ত্যজ দরিদ্র মানুষেরা ব্রাহ্মণ ভূস্বামীকে বর্ণশ্রেষ্ঠ দ্বিজ অথবা অধিকতর পুণ্যবান, প্রভু, সমাজকর্তা রূপে দেখেন। ব্রাহ্মণের অধীনে তাঁর দাসত্ব তাঁকে 'মুক্তির' পথ দেখায়; আর— তখন তাই উচ্চবর্ণের শোষণ-শাসন-অত্যাচার তাঁর কাছে 'স্বাভাবিক', হয়ে দাঁড়ায়। আজও আমরা অর্থাৎ বর্ণহিন্দুরা 'প্রাক্তন অস্পৃশ্য' মেথরকে 'তুই' ব'লে সম্বোধন করি,— এতে সেই মেথর কিছু মনে করেন না।

মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যেও মুসলমান-কৃষক কিন্তু মুসলমান-জোতদারকে 'স্বধর্মে বিশ্বাসী মিত্র' হিসেবে দেখেন। অথচ হিন্দু-ধনীর শোষণ-অত্যাচার তাঁর কাছে 'হিন্দুর শোষণ-অত্যাচার' হয়ে দাঁড়ায়— আর তখন সমগ্র হিন্দুসমাজকে তিনি অবিশ্বাসের চোখে

দেখেন। বস্তুত, উভয় সম্প্রদায়ের এই পারস্পরিক অবিশ্বাসই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমি এবং নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িকতাব সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ। এতে ইন্ধন যোগায় শাসক-এলিটের 'রিলিজিয়াস নিউট্রালিটি' বা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এবং নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মবিশ্বাসের ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের (শ্রেণীস্বার্থের বিপরীত) ধারণা।

অদূর অতীতের শাসকদের সঙ্গে বর্তমান শাসকদের তফাৎ হোলো, এঁরা মুসলমান জনসাধারণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ক'রে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উগ্রতা ব্যবহার ক'বে, প্রকাশ্যেই গণহত্যা সংঘটিত করছেন,— স্বেচ্ছাচারী এক হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করাই এঁদের উদ্দেশ্য। স্বল্প আয়াসেই এঁরা গুজরাটে বর্তমান গণহত্যা সংঘটিত করেছেন, হিন্দু ধর্মান্ধতাকে উন্মত্ত করছেন; এর কারণ পরাধীন ভারতের মতো স্বাধীন ভারতেও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ তাঁদের শাসনকালে— ধর্মীয় অন্ধতা গোঁড়ামী আর কুসংস্কারের কর্ষণ করেছেন; নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন দিয়েছেন। বর্তমানের তাণ্ডবকারী হিন্দুত্বের অভিভাবকরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও দ্বি-শত বর্ষব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছিন্নতাকে ব্যবহার ক'রে এক বর্বর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করছেন। এক 'প্লুরাল সোসাইটিতে' মধ্যযুগীয় অন্ধতাকে আর নিষ্ঠুরতাকে ধর্মের আবরণ মারফৎ বৈধতার রূপ দিয়ে বিধর্মীকে 'দ্বিতীয় শ্রেণীব নাগরিকে' পরিণত করছেন;— আর "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে"ই কাঁদছে। বলা বাহুল্য, স্বাধীন ভারতে এই লজ্জাজনক ইতিবৃত্তের মূল খুঁজে পাওয়া যাবে বিভাগ-পূর্ব রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে। রক্ত আর অশ্রুতে ভেজা সদ্যস্বাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য উচ্চবর্ণ-উচ্চবিত্ত-উচ্চশিক্ষিত কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ জ্যোতিষীদেব সঙ্গে পরামর্শ ক'রে শুভলগ্ন খোঁজেন একজন ধর্মান্ধ গোঁড়া হিন্দুর মতোই। এর কারণ ব্রিটিশ-ভারতের কংগ্রেস-রাজনীতি আদৌ সেকুলার ছিল না, ধর্মান্ধতা থেকে নেতারাও মুক্তি লাভ করেননি, সাধারণের অন্ধতার কথা তো বলাই বাহুল্য।

ভারতের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনকারী বিপ্লব মারফৎ আসেনি ব'লেই বাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলির 'সেকুলারাইজেশন' ঘটেনি। তাই সেকুলার দেশ গ'ড়ে তোলার 'বাসনা' থাকলেও বাস্তবে শাসক-এলিট এক ধর্মাশ্রয়ী শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার 'পবিত্র' কর্মভার গ্রহণ করেন।

১৯৫৩ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম কুম্ভমেলা সরকারি তত্ত্বাবধানে উদ্‌যাপিত হয়। পুণ্যসলিলে অবগাহনের জন্য প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ সেদিন মেলাপ্রাঙ্গণে সমবেত হন। তাঁদের ধর্মোন্মাদনা ছিল অবর্ণনীয়! সেকুলার দেশের রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছিলেন পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রী।' সরকারি ব্যয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার প্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও ভিড়ের চাপে প্রয়াগের পুণ্যভূমিতে পাঁচশত মানুষ প্রাণ হারান এবং কয়েক সহস্র মানুষ আহত হন। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ 'অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে' তথা অন্নের অভাবে মারা যান; অচিকিৎসা-কুচিকিৎসা, বন্যা, খরা, অথবা শৈত্যপ্রবাহে মারা যান,— কিন্তু তীর্থস্থানে মৃত্যু এদেশে সুকৃতির পরিণাম হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি-ধন্য কুম্ভমেলাস্থলে পাঁচ শতাধিক তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়তো সুকৃতির ফল বলা হবে; আর, বোধহয এ কারণেই 'সেকুলার' রাষ্ট্রের সরকার জনসাধারণের জন্য

দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতে না পাবলেও বহু অর্থব্যয়ে তেরো হাজার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট তুষারতীর্থ অমরনাথ সমেত অন্যান্য তীর্থযাত্রার পথ সুগম করেন দরাজ হাতে।

মধ্যযুগে মুসলমান লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত সোমনাথের মন্দিরের পুনর্গঠন সরকারি উদ্যোগে সদ্যস্বাধীন ভারতে হিন্দু অভ্যুত্থানের আর একটি নজীর। তৎকালীন উপ প্রধানমন্ত্রী 'লৌহমানব' সর্দার প্যাটেল শপথ করেন সোমনাথ মন্দিরের পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নেবেন না। মন্দির পুনর্গঠন কল্পে অর্থসংগ্রহের জন্য 'গো-বলয়ের' প্রাণকেন্দ্র উত্তরপ্রদেশে এক পরোক্ষ কর-ব্যবস্থা চালু করা হয়। এ প্রসঙ্গে জনৈক মুসলমান লেখক লেখেন,— "পরোক্ষভাবে সমস্ত হিন্দু এবং অ-হিন্দু, একেশ্বরবাদী, বহুদেববাদী, ও নাস্তিক সকলকেই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের 'সেকুলার' রাষ্ট্রের সরকারকে প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের পুনর্গঠনের জন্য এই ধর্মীয় খাজনা দিতে হোলো।" ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এই হিন্দু অনুষ্ঠানে এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গমের মূর্তি স্থাপন করেন, জনৈক খৃষ্টান লেখক এ প্রসঙ্গে লেখেন,— "ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ পুনর্গঠিত দেবালয়ে দেব-মূর্তি স্থাপনের সময় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা সম্পর্কে বাণী দেন।"

আমাদের 'পবিত্র' সংবিধানে ১৯৭৬ সালে 'সেকুলার' শব্দটি সংযোজিত করেন 'সেকুলার' প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। তিনি 'আলোকপ্রাপ্ত' নেহরুর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তীর্থস্থান ভ্রমণ আর হিন্দু-ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করার ব্যাপারে তাঁর পূর্বসুরীদের ছাড়িয়ে যান। হিন্দু ধর্মান্ধতায় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যায়, "মন্দিরে ইন্দিরা : হরিদ্বার, ৯ই নভেম্বর— প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আজ কঙ্খলে ঐতিহাসিক দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবের মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন। মন্দিরে প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে তিনি পূজার্চনায় নিরত ছিলেন। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানান মানব কল্যাণেই এই পূজা। এর আগে ১৯৭৮ সালে পুত্র সঞ্জয়কে নিয়ে তিনি প্রথম ঐ মন্দিরে যান। প্রধানমন্ত্রী আজ মা আনন্দময়ীর আশ্রমেও গিয়েছিলেন, সেখানে ছিলেন এক ঘণ্টা। ইন্দিরার পিতা জহরলাল নেহরু এবং মাতা কমলা নেহরু দু'জনেই মা আনন্দময়ীর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন— শ্রীমতি গান্ধী এসে নামেন ভেল-এর হেলি প্যাডে। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ভি.পি. সিং ও অর্থমন্ত্রী ব্রহ্ম দত্ত।" ১৯৮২-র ডিসেম্বরে পালঘাটের হেমাম্বিকা মন্দিরে 'সেকুলার' ইন্দিরাজী শ্রীশ্রী দুর্গামাতার 'শ্রী হস্ত' পূজা করেন। মন্দির কর্তৃপক্ষ একটি রৌপ্য নির্মিত পাত্রে এক স্বর্ণনির্মিত 'শ্রী হস্ত' শ্রীমতি গান্ধীকে উপহার দেন। 'শ্রী হস্ত' শ্রীমতি গান্ধীর দলের নির্বাচনী প্রতীক; 'সেকুলার' ভারতের 'সেকুলার' প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজন পড়লেই ধর্মান্ধতার বন্দনা করেন আর ধর্মগুরুবাও তাঁদের মৌরসীপাট্টা আর প্রভুভক্তি বজায় রাখার জন্য ক্ষমতাবান রাজনীতিককে অজ্ঞ ও ধর্মভীরু জনসাধারণের মননে ধর্মের 'রক্ষাকর্তা' রূপে প্রতিষ্ঠা করেন সুকৌশলে।

১৯৮৩ সালের জানুয়ারিতে খোদ কোলকাতাতেই ভারতের ধর্মপ্রাণ রাষ্ট্রপতি জৈল সিং কালীঘাটের মন্দিরে দুইশত টাকা প্রণামী প্রদান পূর্বক কালীর শ্রীচরণে শাস্ত্রমতে পূজা দেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে 'মা কালীর সিঁদুরে রঞ্জিত' করা হয় এবং পূজার ফুলের মালা

পরানো হয়। সমবেত জনসাধারণ ধর্মপ্রাণ রাষ্ট্রপতির নামে 'জিন্দাবাদ'. ও মায়ের নামে চিৎকার ক'রে ওঠেন "কালী মাঈ-কি জয়"।[১০]

যে দেশে হাজার হাজার মানুষ রক্ত বিক্রি ক'রে বেঁচে আছেন, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের পেশা হোলো ভিক্ষা, যে দেশে কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধা নিয়ে রাতে ঘুমাতে যান; সেখানে মানব কল্যাণের জন্য 'র‍্যাশনাল', অর্থাৎ যুক্তিবাদী, বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেওয়াটাই জরুরি— পূজার্চনা অথবা ধর্মস্থানে প্রণামী প্রদান নয়।

ইন্দিরা গান্ধী 'শহীদ' হবার পর তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত রাজীব গান্ধী মহাশয় প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত হন। তিনিও তাঁর পূর্বসুরীদের লালিত 'ট্রাডিশনটি' বজায় রাখেন। অর্থাৎ 'সেকুলার' দেশের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান রাজনীতিক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুত্বের কাছে তিনিও আত্মনিবেদন করেন। রাজীব গান্ধীর তোষামোদ করার জন্যই কংগ্রেস নেতা নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী— "মা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর কাছে" প্রধানমন্ত্রীর শতায়ু কামনা ক'রে প্রার্থনা করেন।[১১] 'সেকুলার' রাজীব এর সমালোচনা করেননি। বরং ১৯৮৮ সালে মার্ক্সবাদীদের উদ্দেশে বলেন, "ধর্মে অবিশ্বাসী সমাজবাদীদের এদেশ থেকে আমরা নির্মূল করবোই।"[১২] গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে এ ধরনের মন্তব্য আদৌ প্রশংসনীয় নয়। প্রকৃত সমাজবাদীরা ধর্মান্ধতাকে পরিত্যাগ ক'রেই এগিয়ে চলেন। প্রকৃত সেকুলার পরিবেশে তাঁদের সম্মানীয় স্থানই থাকে।

বহু বিজ্ঞাপিত 'সেকুলার' রাষ্ট্রের 'সেকুলার' নেতাদের অতি-ভক্তির কারণই হোলো জনমানসে নিজেদেরকে ধর্মান্ধতার রক্ষাকর্তা রূপে প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে ধর্মভীরু ভোটার-সাধারণ ধার্মিক, ভক্ত, পূণ্যার্থী নেতাদের হাতেই শাসনক্ষমতা তুলে দেন সরল বিশ্বাসে।

অনেক সময় বলা হয়ে থাকে, রাষ্ট্রনায়করা ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকেন ব্যক্তি হিসেবে, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে নয়। কিন্তু এই অজুহাত যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ নয়। কারণ, প্রথমত, এ ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সময় নেতারা রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে থাকেন; এবং দ্বিতীয়ত, অশিক্ষিত ধর্মান্ধ জনসাধারণের চোখে ভক্তিমতী পূজারিণী এবং ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রী একাকার হয়ে যান।

প্রকৃত সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি— যুক্তিবাদী; তাই শাসকবর্গ চান না জনসাধারণের মধ্যে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে উঠুক, এ কারণেই তাঁরা হিন্দু-ধর্মান্ধতা-প্রশ্রয়দানকারী এক ধর্মীয় নীতি অনুসরণ ক'রে চলেন। দারিদ্রপীড়িত জনসাধারণের ধর্মাশ্রয়ী চিন্তা— বৈষম্যমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অটুট রাখে; তাঁরা মনে করেন ধর্মভীরু (ভোটপ্রার্থী) নেতা কোনো অন্যায় বা অবিচার করতে পারেন না। এতে সুবিধা হয় স্বদেশী-বিদেশী ধনপতিদের।

ভারতের সমাজের প্রধান সংস্কৃতি হোলো রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি। দূরদর্শনে প্রদর্শিত ফিল্মী মহাকাব্যের অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও জাদুকরী প্রভাব, আর এর রেশ থাকতে থাকতেই 'রাম জন্মভূমি'র দাবি এই বক্তব্যের সারবত্তাই প্রমাণ করে। এর থেকে বোঝা যায় জনসাধারণের ইহজাগতিক আশা-আকাঙ্খা-দাবি-দাওয়া থেকে দৃষ্টি সরাবার জন্যই দূরদর্শনের পর্দায় দেখা যায় অবতার এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্তা শ্রীরামচন্দ্র দুষ্ট রাক্ষস রাবণকে পরাভূত করেন।

রাষ্ট্র অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতা তথা 'মাল্টি রিলিজিয়াস কালচারাল পলিসি'র প্রশংসা ক'রে (অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানে) এক ভারতীয় পণ্ডিত রাজনীতিবিদ লিখেছেন, "ভারতের সেকুলার রাষ্ট্র— হিন্দুপ্রতিষ্ঠান বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে, মুসলিম চরিত্রের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ধর্মীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রভূত অর্থসাহায্য দিয়ে থাকে।" বস্তুতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্র 'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' অথবা 'বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে' এবং ধর্মীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় সাহায্য[১৩] বিভিন্ন ধর্মীয় 'আইডেনটিটিকেই' পরিপুষ্ট করে, যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠার অন্তরায়! ব্রিটিশ নীতির ভারতীয় রূপ— কেবলমাত্র ধর্মান্ধতাকেই আশ্রয় দেয় না, বা এর পৃষ্ঠপোষকতা করে না— এই নীতি প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাতেও উস্কানী দেয়। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন গণতান্ত্রিক 'সেকুলার' প্রজাতন্ত্রের লজ্জা— বাবরি মসজিদের ধ্বংস সাধন। মসজিদ ধ্বংস, আর এরপর দাঙ্গা হত্যা আর সংঘর্ষ প্রমাণ করে— ব্রিটিশের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার নিরসন করতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ রাষ্ট্র বা সরকার সেকুলার হ'লে সমাজে 'সেকুলারাইজেশন'-এর শর্ত সৃষ্টি হবে কারণ উভয়ে উভয়ের পরিপূরক, তখন এক ধর্মীয় সম্প্রদায় অপর এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ঘরে আগুন দেবেন কেন? এর থেকে বোঝা যায় 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' ভূত আজও আমাদের ঘাড় থেকে নামেনি, আর নেহরু-প্যাটেল-রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ— 'সেকুলার' সাজার বাসনায় রাজনীতির কৌশল মারফৎ জনসাধারণের সঙ্গে তঞ্চকতাই ক'রে গেছেন।[১৪] এ কারণেই তাণ্ডবকারী গো-ভক্ত ধার্মিকের দল ইট পুজো করতে পারেন রামমন্দির নির্মাণকল্পে!

কার্ল মার্ক্সকে 'সোসিওলজি অব রিলিজিয়ান' বা ধর্মের সমাজতত্ত্বের জনক বলা যায়। তিনি বলেন, ধর্মান্ধ মানুষ এক "Inverted World Consciouness" বা 'বিপরীত জগৎ চেতনা'য় আচ্ছন্ন থাকেন, যা বিভ্রান্তিকর। স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধ'রে শাসনক্ষমতায় থাকলেও মার্ক্সবাদীরা প্রকৃত সেকুলারিজম প্রচার ও প্রসারের আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেননি। মার্ক্সীয় সমাজবিজ্ঞানের ধর্ম-সংক্রান্ত-নির্দেশগুলির প্রচার ও প্রসার বাঞ্ছনীয়।

ভারতের সমাজে ধর্মান্ধতা কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নেহরু খুব সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, "আমরা ব'লে থাকি যে আমরা সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদপ্রথা, প্রাদেশিকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে, কিন্তু আমরা ভালোভাবেই জানি যে আমাদের ভেতরটায় কত বিষ জ'মে রয়েছে। আমাদের মধ্যে কে, আমি বা আপনি, এই বিষাক্ত চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত?"[১৫]

এই পরিস্থিতিতে কোনো কোনো 'হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন' প্রকাশ্যেই রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা তথা 'সমস্ত ধর্মকে সমমর্যাদা দান'-এর নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে,— যেমন 'হিন্দু মহাসভা' প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে— সাম্প্রদায়িকতা হোলো আশীর্বাদ"। আর.এস.এস.-এর তাত্ত্বিক গুরু গোলওয়ালকার মহাশয় গণতন্ত্রের আদর্শকে নাকচ ক'রে বলেন, "ভারতবর্ষে অ-হিন্দুদের হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে, হিন্দুধর্মকে সম্মান

ও শ্রদ্ধা করা শিখতে হবে, তাদের বিদেশীয়ানা পরিত্যাগ করতে হবে, নতুবা তাদের এদেশে হিন্দু জাতির পদানত হয়ে সমস্ত সুযোগসুবিধা ও দাবি ত্যাগ ক'রে এমন-কি নাগরিক অধিকার ছাড়াই বসবাস করতে হবে।'' এই দেশভক্ত মানুষটি আরো বলেন— ''মুসলমানেরা ভারতবর্ষের শত্রুদের (অর্থাৎ পাকিস্তানের মুসলমানদের) সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে, তারা নিজেদের 'শেখ' আর 'সৈযদ' নামে পরিচয দেয়, বিপদের মধ্যে নিজের মাতৃভূমিকে পরিত্যাগ ক'রে শত্রুশিবিরে যোগ দেয়'', ইত্যাদি ইত্যাদি।[১৬]

এই উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার রোধে 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' প্রমুখ ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু কোনো দীর্ঘস্থায়ী বিতর্ক বা রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যায়নি। শুধুমাত্র বিভিন্ন 'আইডেনটিটি' লালনপালন করলেই সেকুলার হওয়া যায় না; ইমাম বুখারীর কৃপা লাভ করলেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে জব্দ করা যায় না।

ফলত হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা দিনে দিনে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করেছে, আর বিযবৃক্ষটি হয়েছে নধরকান্তি। ১৯৫১ সালে 'জনসঙ্ঘ', ১৯৬৪ সালে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ', ১৯৬৬ সালে 'শিবসেনা', ১৯৪৮ সালে 'অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ', এবং অবশেষে ১৯৮০ সালে 'ভারতীয় জনতা পার্টি'র আবির্ভাব হয়েছে— আর ভারতবর্ষের সমাজ-রাজনৈতিক জীবন কলুষিত হয়েছে। এঁরা দেশের মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও হরণ ক'রে ত্রিশ শতাব্দী পূর্বেকার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অনুরূপ এক 'হিন্দু প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে চান।[১৭]

কুসংস্কার আর ধর্মান্ধতায় পরিপূর্ণ 'হিন্দু ভারতে' বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা'র হুঙ্কারে এক শ্রেণীর মানুষ প্রভাবিত হয়ে পরিষদকে স্বাগত জানান।[১৮] বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে স্বাগত জানান 'সেকুলার' নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও— কিছু 'মিডল কাস্ট' ভোট তাঁর ঝুলিতে পূর্ণ করার জন্য।[১৯] ওদিকে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' ইতিহাসকে অস্বীকার ক'রে, যে-কোনো যুক্তিতর্ককে অগ্রাহ্য ক'রে— 'রাম জন্মস্থান' পুনরুদ্ধারের দাবি জানায়।

১৯৭৬ সালে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'রামায়ণ'কে কবির কল্পনা ও আদ্যন্ত কল্পিত কাহিনী ব'লেই অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে শ্রীরামচন্দ্র কোনো ঐতিহাসিক পুরুষ নন, তাঁর কালও নির্ণয় করা যায় না।[২০]

কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পদতলে 'সেকুলার' রাজীব গান্ধী আত্মসমর্পণ ক'রে ১৯৮৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি 'বাবরি মসজিদ'-এর তালা খুলে দেন— হিন্দু ভক্তদের তুষ্ট করার জন্য; আর ২৫শে ফেব্রুয়ারি লোকসভায় 'মুসলিম নারী বিল' পেশ করেন। স্বাভাবিকভাবেই দেশের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি হয়।

১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯-এর মধ্যে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ', 'ভারতীয় জনতা পার্টি', এবং 'শিবসেনা'র মতো রাজনৈতিক দলগুলি প্ররোচনামূলক ও উত্তেজক বিবৃতি মারফৎ সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বিষিয়ে তোলে। ১৯৮৯-এর নির্বাচনের পূর্বে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ— দেশের প্রতিটি গ্রামে ইটপুজো (অর্থাৎ 'রামশীলা') করাব অভিসন্ধি গ্রহণ করে এবং 'রামমন্দির' নির্মাণকল্পে শোভাযাত্রা সহকারে এই 'রামশীলা' অযোধ্যায় আমদানী করার 'পবিত্র' ইচ্ছা গ্রহণ করে। 'ভারতীয় জনতা পার্টি' এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এবং

মুসলমান সম্প্রদায়েব বিরুদ্ধে উত্তেজক স্লোগান দেয় আব 'সেকুলাব' সবকাবের নিদ্রা গভীরতর হয়। দিল্লিব এই সবকার নভেম্বরের ৯ তাবিখে বাবরি মসজিদেব অদূরেই রাম মন্দিরের 'শিলান্যাস'-এর অনুমতি দেয। এব ফলে কংগ্রেসের মুসলিম ভোট হাতছাড়া হয়, নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয ঘটে।

সাধারণ নির্বাচনে বি.জে.পি-র ফল যথেষ্ট ভালো হয়।[১১] এমন-কি পশ্চিমবঙ্গেও এবা প্রায় পাঁচ লক্ষ ভোট হাতিয়ে নেয়।[১২] বি.জে.পি.-ব সমর্থন নিয়েই ভি.পি. সিং দিল্লিব মসনদে আসীন হন। পরিস্থিতিকে নিজেদেব কাজে লাগায বি.জে.পি.। ভাবতের বহু প্রচারিত 'সেকুলারিজম' অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাব সুযোগ নিয়ে বি.জে.পি. এক 'রাম রথ' যাত্রার আয়োজন কবে, হিন্দু অন্ধতা লাগামছাড়া উন্মাদ হয়ে ওঠে। বাল্মীকীব 'মানসপুত্র' হয়ে ওঠেন হিন্দুত্বেব রক্ষাকর্তা 'জাতীয বীব'। আব বাববেব কপালে জোটে গালমন্দ, 'বিদেশী আক্রমণকাবী', 'আগ্রাসী বিধর্মী'— যাঁর সন্তান হলেন তাবৎ মুসলমান। উল্লেখ্য— পশ্চিমবঙ্গেও এই বথযাত্রা সম্পন্ন হয় কোনো বাধাবিপত্তি ও প্রতিরোধ ছাড়াই।

দশম সাধাবণ নির্বাচনে বি.জে.পি. একশোর বেশি আসন পায এবং লোকসভায দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ইমাম বুখারী মার্ক্সবাদীদেব অনুরাগী হয়ে পড়েন, এবং বর্ষীয়ান হিন্দু ব্রাহ্মণ মার্ক্সবাদী নেতা নাম্বুদ্রিপাদ নিজেকে 'হিন্দু' বলেন হিন্দুতাণ্ডবেব আগুনে জলসিঞ্চন করার উদ্দেশ্যে।[১৩]

বি.জে.পি. আর বিশ্ব হিন্দু পবিষদ— 'জাতীয সংহতি' আর 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যেব' 'আষাঢ়ে গল্পকে' নির্বাসনে পাঠিয়ে হিন্দুতাণ্ডবের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে চলে; মুসলিম-মনন তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই সন্ত্রস্ত হয়ে পৃথক মুসলিম আইডেনটিটিব দিকে ঝুঁকে পড়ে। অবশেষে ১৯৯২ সালেব ৬ই ডিসেম্বব কংগ্রেস সবকারেব নাকের ডগায় উন্মাদ হিন্দু-ধর্মান্ধবা ঐতিহাসিক 'বাবরি মসজিদ' ধুলোয় মিশিয়ে দেয। স্বাধীন ভারতেব 'সেকুলারিজম' অর্থাৎ ধর্মনিবপেক্ষতাব অসারতা প্রকট হয়ে পড়ে। সারা দেশে শুরু হয সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ফলে প্রায় দু'হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

এরপর থেকেই কংগ্রেস দল ভারতীয় 'সেকুলারিজম' অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাব হট্টবরে মূল গায়েনের ভূমিকায অবতীর্ণ হয। প্রকৃত 'সেকুলারিজম'-এব অর্থ চর্চার কথা অনুক্তই থেকে যায়।

এরপর আর কোনো সবকার, দল, বা নেতা— কেউই আর 'সেকুলাবিজম'-এর পক্ষে কোনোরকম আন্দোলনের কথা বলেননি। ববং এই সুযোগে 'হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি' সংহত হয়, এবং সমস্ত লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে ক্রমে আবো বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক এ.আব. দেশাই বলেন, "ব্রিটিশ আমলের মতোই— এ যুগেও শোষিত নিপীড়িত দরিদ্র মানুষ— যাঁরা তাঁদের শ্রমশক্তি বিক্রি ক'বে বেঁচে আছেন, সেই (শ্রমজীবী) জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য গ'ড়ে ওঠাব পথে অন্তরায সৃষ্টি করার জন্যই সাম্প্রদাযিকতাকে ব্যবহার করা হয়।"[১৪] সমাজবিজ্ঞানী দেশাই-এব এই পর্যবেক্ষণেব সারবত্তা প্রমাণিত হয়— সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক বর্তমান সরকারেব নির্লজ্জ আচরণে! এই সবকাব সংবিধান অমান্য ক'রে প্রকাশ্যেই সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে, সাম্প্রদায়িক উগ্র

এদের মূল ধন;— তাই গুজরাটের গণহত্যায় উল্লসিত ভুঁইফোঁড় নেতা সগৌরবে ঘোষণা করেন, "গোধরার পরে গুজরাত জুড়ে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে, তাতে ইসলামী শক্তিগুলি যথেষ্ট ধাক্কা খেয়েছে। —এই প্রতিক্রিয়া আসলে হিন্দু জাগরণের ফল।" মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর শ্রীচরণে মাতৃভূমি বন্ধক দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার এই প্রবক্তা ও প্রচারকরা ক্ষুধার্ত অথচ ধর্মান্ধ 'হিন্দু ভারতকে' স্বপ্ন দেখান এক মহিমাময় 'পুণ্য ভূ'র!

গুজরাটের সাম্প্রতিক দাঙ্গা প্রমাণ ক'রে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী-সমেত পুলিশ-প্রশাসন পুরোটাই কেমন আপাদমস্তক সাম্প্রদায়িক, হত্যাকারী। 'ডলার পুষ্ট' বিশ্বায়ন আর কম্পিউটারের যুগে ব'সে এক বিধ্বস্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "হিন্দুদের ধর্মনিরপেক্ষতা শিখতে হবে না। মুসলিম-খৃষ্টানরা যখন এদেশে আসেনি, তার আগে থেকেই হিন্দুরা ধর্মনিরপেক্ষ। ছোটখাটো ঘটনা ভুলে মূলে গিয়ে দেখুন, সহিষ্ণুতাই হিন্দুদের ধর্ম।" অথবা বলেন, "হিংসা কেন শুরু হোলো, তা ভুলে যেতে পারি না, সবরমতী এক্সপ্রেসের নির্দোষ যাত্রীদের জিন্দা জ্বালিয়ে দেওয়ার ফলে গুজরাট (দাঙ্গা) হয়েছে.... পরে যা হয়েছে— তা নিন্দনীয়, কিন্তু আগুন প্রথমে লাগালো কে?"

আমরা স্বাধীনতার পর অর্ধশতক ধ'রে সেকুলারিজম-এর নামে বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ ক'রে এসেছি। আর এ কারণেই বহুবিজ্ঞাপিত 'সেকুলার' রাষ্ট্রের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গদি চেপে ব'সে থাকার স্থূল বাসনায় এরকম অবিবেচকের মতো (ভ্রান্তিজনক তো বটেই) মূঢ় উক্তি করতে পারেন! এ যেন পেশীশক্তিব দম্ভ আর আস্ফালন!

কেবলমাত্র গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অপসাবণ চাইলেই বিরোধীদের দায়িত্ব কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। দেশের মঙ্গল চাইলে ঐকান্তিকভাবে প্রকৃত সেকুলারিজম-এর চর্চা করতে হবে। এতে হয়তো মন্ত্রী হওয়া যাবে না কিন্তু সুস্থ সামাজিক রাজনৈতিক আবহাওয়া তৈরি হবে। সাম্রাজ্যবাদের অনুচর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ কাজ করতে পারবে না, তাই এগিয়ে আসতে হবে হিন্দু-মুসলমান শ্রমজীবী শ্রেণীকেই, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিচুতলার মানুষদের ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীসংগ্রাম ও আন্দোলন আশু প্রয়োজন। প্রয়োজন অতি প্রাচীন 'পবিত্র' হিন্দু অতীতের যথাযথ মূল্যায়ন, "....বহু দেবদেবী, বিচিত্র পুরাণ, এবং অন্ধ লোকাচার-সঙ্কুল আধুনিক বৃহৎ বিকারের নাম হিন্দুত্ব"।[২৫] এই হিন্দুত্বকে, প্রাচীন বা আধুনিক, যা-ই হোক না কেন, অস্বীকার করতে হবে, সমূলে উৎপাটিত করতে হবে— এবং তারপরেই বন্ধ হবে মানুষ মারার অর্থনীতি, রাজনীতি।

একদা মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেছিলেন, "সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা এবং অন্ধ বিশ্বাসের (সামাজিক) পরিবেশে মেকী গণতন্ত্রের আড়ালে কার্যত এক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে।" ভারতের আদবানী-অটল-মোদী অলঙ্কৃত গণতন্ত্র কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎবাণীর যথার্থতাই প্রমাণ করে।[২৬]

তথ্যসূত্র

১। Mckim Marriott. 'Cultural Policy in New States; in Clifford Greetz (ed.). Old Socities and New States. New Delhi 1971. p. 36

২। আনন্দবাজার পত্রিকা; ৩.৪ ২০০২

৩। S. Radhakrishnan quoted in Ved Prakash Luthera The Concept of the Secular State and India. Calcutta 1964. p 160.

৪। Ibid. p. 165.

৫। Hossainur Rahaman Hindu-Muslim Relations in Bengal 1905-1947 Bombay 1974 p. 103

৬। Ronald Segal. The Crisis of India Bombay 1963. p. 42.

৭। ভারতবর্ষ; ফাল্গুন ১৩৬০; পৃষ্ঠা ৪০৪

৮। Smith. op. cit.

৯। আনন্দবাজাব পত্রিকা; ১০ ১১ ১৯৮০

১০। আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৪.১২ ১৯৮২

১১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ ০১ ১৯৮৩

১২। আনন্দবাজার পত্রিকা; ০২ ০৮ ১৯৮৭

১৩। K M Panikkar The Foundatios of New India London 1963 p. 167.

১৪। Minoo Massani. The Statesman May 01,1983

১৫। Mohammad Ghouse. Secularism Society and Law in India Delhi 1973.

১৬। Golwalkar. Bunch of Thoughts Bangalor 1980. pp 233-247
গোলভালকার মহাশয়েব কথাই অতিসম্প্রতি প্রাঞ্জল ক'বে বুঝিয়ে দিযেছেন এক 'হিন্দু',— "নিরাপত্তার স্বার্থেই সংখ্যাগুরুদেব সঙ্গে সংখ্যালঘুদের সদ্ভাব বেখে চলা উচিৎ।" আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩ ০৩ ২০০২

১৭। Balraj Madhok. 'In Search of a Hindu State' The Statesman 15 7.1989.

১৮। কিছু 'আধা-সাধু আধা-রাজনীতিক' তৎপর হয়ে ওঠেন এবং অচিরেই রামচন্দ্র পরমহংস মহাশয়ের দাবিমতো ". বাজপেয়ীর দল ২ থেকে ২০০" হয়ে যায় "আমাদেব জোরে।" আনন্দবাজার পত্রিবা ৫.৩.২০০২

১৯। Asghar Ali Engineer (ed). Introduction: Babri Masjid— Ramjanam Bhoomi Controversy. Delhi 1990. p 10.

২০। Asghar Ali Engineer. Lifting the Veil. Communal Violence and Communal Harmony in Contemporary India Hyderabad 1995. p 75.
বাবর মসজিদ ধ্বংস কবলে এব উল্লেখ সমসাময়িক কোনো রচনায় অথবা স্বল্পকাল পরে বচিত 'তুলসীদাসী রামায়ণে' নেই কেন? অথচ বাবর যে অশ্লীলতার অভিযোগে জৈন সম্প্রদায়ের এক নগ্নমূর্তি ভেঙেছিলেন একথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।
বাবর তাঁর পুত্রকে গো-হত্যা থেকে বিরত থাকার উপদেশও দিয়েছিলেন। তিনি একজন ধর্মান্ধ উগ্র-হিন্দুবিদ্বেষী হ'লে এমত ঘটতো না।
হিন্দু-মননে উগ্র-হিন্দুবিদ্বেষী হিসাবে ধিকৃত সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের দৃষ্টিতে 'জিন্দা পীর' রূপে বন্দিত আওবংজেব মানবতার প্রশ্নে 'সতীদাহ' প্রথা রদ করেন। আজকেব 'মন্দিরওয়ালারা' একথা জানতে পাবলে (আসলে তাঁরা সবই জানেন) হয়তো বাদশাহ্ আলমগীরের উর্দ্ধতন চোদ্দ পুরুষের 'পিণ্ডি চট্‌কে' কংগ্রেসী সেকুলারিজম— অর্থাৎ 'pseudo-secularism' তথা 'সংখ্যালঘু তোষণেব' বাপান্ত ক'রে তাঁদের 'নেড়ে-

নিকেশের' কর্মসূচি রূপায়ণের যজ্ঞে 'বাড়তি প্রেরণা' লাভ করবেন। কিন্তু ইতিহাস একথাও বলে যে বাদশা আলমগীর অশ্লীলতার অভিযোগে এক নগ্ন ফকিরের প্রাণদণ্ড দেন। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়-এর 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' (কলিকাতা, ১৯৩০)। মুসলমান ঐতিহাসিক আজীজ আহ্‌মেদ রচিত Studies in Islamic Culture in the Indian Environment. (Oxford 1964), ও হিন্দু ঐতিহাসিক হরবন্‌স্ মুখিয়ার 'Mediavel Indian History and the Communal Approach', (Romila Thapar, Harabans Mukhia and Bipan Chandra [ed] New Delhi 1981) ইত্যাদি সহজলভ্য পুস্তকগুলি পাঠ করার আবেদন রাখছি 'অসাধু-সাধু' ও 'হিন্দু-সহিষ্ণুতার' মূর্ত প্রতীকদের!

২১। The Statesman, 5 1.1990

২২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ ১ ১৯৯০

২৩। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ ২ ১৯৯১

২৪। A R. Desai : State and Society in India Bombay 1975 p¼ 139.

২৫। রবীন্দ্রনাথ, 'সমাজ', ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

২৬। M. N Roy. 'The Secular State', in V K Sinha (ed). Secularism in India Bombay 1968 p. 150
মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ধারণা, হিটলারের জার্মানী ও মুসোলিনী শাসিত ইটালী ছিল, 'সেকুলার', কিন্তু একথা মেনে নেওয়া যায় না; কারণ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ না হ'লে, সেকুলার সমাজও তৈরি হয় না। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "একদিন ফরাসী বিদ্রোহ ঘটেছিল অসাম্যের তাড়নায়.. তাই সেদিনকার বিপ্লবের সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল " (রাশিয়ার চিঠি)। এই ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক যুগব্যাপী মানুষের মুক্তি-ভাবনা, তথা যুক্তিবাদ ও ধর্মহীন বিশ্বের বিষাণ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় শ্রমজীবীর চেতনায়, চিন্তায়, হৃদয়ে। হিটলার-মুসোলিনী-ফাঙ্কোদের শাসনকালে মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও ছিনিয়ে নেওয়া হয় চরমতম হিংস্রতায়, ব্যাভিচারে। ঈশ্বরের নির্বাসনের প্রকৃত অর্থ মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের পথ সুগম করা, মানবতার উৎকর্ষ ঘটানোর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। গণতন্ত্রকে বন্দী ক'রে মানবতার মুক্তি সাধন অসম্ভব!

[নবান্ন, বর্ষা সংখ্যা ১৪০৯/অগাস্ট ২০০২]

এই রচনাটি ১৩৮৯/১৯৮২, 'লোকায়তিক' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় বর্তমান 'সেকুলার ভারতে ধর্মীয় নীতি' নামে প্রকাশিত হয়। পরিমার্জন ও পরিবর্দ্ধন ক'রে পরবর্তীকালে 'নবান্ন' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

'সেকুলারিজম' ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা

আমাদের দেশে একটি রীতি আছে, তা হোলো— মুসলমান সম্পর্কে কোনো আলোচনায় (একমাত্র যুক্তিহীন কটূক্তি ছাড়া) কোনো হিন্দুই সচরাচর প্রবৃত্ত হ'তে চান না। এর অন্যতম প্রধান কারণ— হিন্দু সম্প্রদায় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সামাজিক দূরত্ব, এবং কোনো সম্প্রদায়ের অপর সম্প্রদায় সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব। যদি কোনো মুসলমান— হিন্দু সম্প্রদায়ের বিন্দুমাত্র সমালোচনা করেন তবে অধিকাংশ হিন্দুই তাকে ল্যাঠৌষধি দেবার জন্য রব তুলবেন। বর্তমান লেখক জন্মসূত্রে হিন্দু; সুতরাং তাঁর কপালেও অসহিষ্ণু বা উগ্র-সম্প্রদায়িক ইত্যাদি গালমন্দ জুটতে পারে। এই ঝুঁকি নিয়েই আমরা ভারতের 'সেকুলারিজম'-এর মধ্যে ক্রিয়াশীল মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি অনুধাবন করার চেষ্টা করবো।

তথাকথিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এতগুলি দশক কেটে গেছে। হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে অধিকাংশ হিন্দুর দৃষ্টিতে মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়ই প্রধান। আজও হিন্দুরা নিজেদের 'হিন্দু জাতি' এবং মুসলমানদের 'মুসলমান জাতি' হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। বহু প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিজেদের পৃথক জাতি হিসেবে দেখেন অর্থাৎ দেশবিভাগ-পূর্ব চিন্তাতেই তাঁরা আচ্ছন্ন। স্বাধীন 'সেকুলার' ভারতে হিন্দুসম্প্রদায় মুসলমানদের 'যবন', 'নেড়ে', ইত্যাদি বিশেষণ আরোপ ক'রে থাকেন এবং প্রায় একইভাবে মুসলমনারাও হিন্দুদের 'কাফের', 'মূর্তি-পূজক' ইত্যাদি ভাবতেই অভ্যস্ত। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, সামাজিক দূরত্ব ইত্যাদি টিকে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ— ভারতের শাসক-এলিটের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি। এঁদের অনুসৃত 'সেকুলারিজম' একদিকে ক্ষুধার্ত অজস্র হিন্দু মানুষের কর্ণকুহরে 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'-এর পবিত্র সুর প্রবেশ করানোর যাবতীয় ব্যবস্থাই উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে থাকে; অন্যদিকে মুসলমানের সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধ চিন্তায় ও তার প্রকাশে উৎসাহ দেয় বা সস্নেহে মৌনতা পালন ক'রে থাকে।

অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিত রাষ্ট্রের তরফ থেকে বিবিধ ধর্মান্ধতা ও নিষ্ক্রিয় সাম্প্রদায়িকতা পুষ্টি সাধনই 'সেকুলারিজম'-এর পরাকাষ্ঠা ব'লে মনে করেন। পানিক্কর বলেছেন, "ভারত সেকুলার রাষ্ট্র— হিন্দু প্রতিষ্ঠান বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে, মুসলিম চরিত্রের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং ধর্মীয় সংস্থা পরিচালিত বহু প্রতিষ্ঠানে প্রভূত অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। (এই রাষ্ট্র) মুসলমানদের মক্কায় বাৎসরিক তীর্থযাত্রার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে, (এই রাষ্ট্র) আধা-সরকারি তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান তীর্থস্থানে পরিচালনকার্য নির্বাহ ক'রে থাকে এবং মন্দির মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মস্থানের পুনর্গঠনে বিভিন্নভাবে সাহায্য ক'রে থাকে।"[১] সুতরাং 'সেকুলার' ভারতে কর-ভারে জর্জরিত নিরন্ন মানুষের শ্রমলব্ধ অর্থ তাদের 'পারলৌকিক মুক্তির' কাজে ব্যয়িত হয়। যে-দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তক্ষয়ী ইতিবৃত্ত জড়িয়ে রয়েছে, সে-দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতায় রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে অর্থসাহায্যের অর্থই হচ্ছে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক আইডেনটিটি পরিপুষ্ট করা। স্বাধীনতার পর এই

সাম্প্রদায়িক সমাজে হিন্দুরা মুসলমানকে 'ক্ষমা' করতে পারলো না, মুসলমানরা হিন্দুকে 'বিশ্বাস' কবতে পারলো না।

খণ্ডিত ভারতের জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দু-মুসলমানের আহত চেতনাকে মূলধন ক'রে এবং রাষ্ট্রেব ধর্মীয় নীতি ও সংবিধান প্রদত্ত ধর্মপ্রচার ও ধর্মপালনের অধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে সক্রিয় হয়ে ওঠে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংস্থা ও বিচ্ছিন্নতার প্রবক্তারা। হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হুঙ্কারের প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা পৃথক আইডেনটিটির জিগির তুলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠেন। 'মুসলমান ঐক্যের' আহ্বান জানিয়ে সাম্প্রদায়িকরা সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়ার পক্ষে দাঁড়ান এবং সাধারণ দরিদ্র হিন্দুর জীবনযাপনের প্রবাহ থেকে সাধারণ দরিদ্র মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন রাখার সর্ববিধ কাজে উৎসাহ দেবার কৌশল অবলম্বন করেন। এই প্রক্রিয়াকে 'ইসলামাইজেশন'[২] বলা যেতে পারে, যার উদ্দেশ্য ধর্মান্ধতা আর নিষ্ক্রিয় সাম্প্রাদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে মুসলমান জাতির সংহতি দৃঢ় করা।

সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা প্রচার করেন— কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে বা সম্প্রদায়গত কারণেই মুসলমানরা একটি পৃথক অস্তিত্ব সম্পন্ন 'মোনোলিথিক হোমোজিনিয়াস কমিউনিটি'; অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায় শ্রেণীহীন স্তরহীন স্বার্থদ্বন্দ্বহীন এক সমজাতিক সম্প্রদায়। সমাজজীবনের অন্যান্য দিকগুলি, যেমন— ভাষা, প্রাদেশিক সত্বা, ভৌগোলিক প্রভাব, খাদ্যাভ্যাস, শিল্প-সাহিত্য, বা ধর্মহীন-সংস্কৃতি ইত্যাদি নিতান্তই গৌণ ব্যাপাব। ভারতের বা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিশ্বের মুসলমানরা একটি সাধারণ ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐক্যেব বন্ধনে ধৃত। এবং এ কারণেই তাঁরা (বিশ্বব্যাপী) একটি পৃথক জনগোষ্ঠী। ভারতে মুসলমান সাম্প্রদায়িকদের উদ্দেশ্যই হোলো— হিন্দু প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে মুসলমানদেরকে 'খাঁটি মুসলমান' ক'রে তোলা।[৩] এর অর্থই হচ্ছে— ইসলামীকরণের ডাক দিয়ে শ্রমজীবী মুসলমানদের মননে সাম্প্রদায়িক মনোভাব উজ্জীবিত করা এবং হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের শ্রেণীগত ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করা। অবিভক্ত ভারতে সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা যেমন দ্বি-জাতি তত্ত্বেব ধ্বনি তোলেন, এবং ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক জাতি (nation) গঠনের বার্তা প্রচার ক'রে পাকিস্তান লাভ করেন; বর্তমানের মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা মুসলমান-সংহতি গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সেই একই পথ অনুসরণ ক'রে চলেন। এঁরা প্রচার করেন, মুসলমানরা (বিশ্বব্যাপী) একটি জাতি— যার পবিত্র কর্তব্য সমগ্র মানবজাতিকে পথ দেখানো।[৪] আজকের ভারতবর্ষে মুসলমানবা একটি পৃথক জাতি (nation)— এই দাবি অনিবার্য ভাবেই হিন্দু-সাম্প্রদায়িকদের 'হিন্দু জাতীয়তাবাদকে' পুষ্ট করে, একে আরও আক্রমণাত্মক হ'তে সাহায্য করে; এবং খুব সহজবোধ্য পথেই উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক দূরত্ব, পারস্পরিক অবিশ্বাস আর বিদ্বেষে ইন্ধন যোগায়। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধান দু'টি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, রাজনৈতিক স্বার্থ ইত্যাদি মূলগতভাবে ভিন্ন এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এক এবং অখণ্ড এ যুক্তিও যথেষ্ট দুর্বল ও অর্থহীন! কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে কেরালা বা বাঙলার মানুষের বিশেষ কোনো ফারাক নেই— কারণ তাঁদের ধর্মবিশ্বাস এক! বাস্তবত একথা সমাজবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞান সম্মত নয়,— প্রকৃতপক্ষে অলীক, ভিত্তিহীন!

প্রায় একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "....চীনের মুসলমানও মুসলমান, পারস্যেরও

তাই, আফ্রিকারও তদ্রূপ। যদিচ চীনের মুসলমান সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না তথাপি একথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের ধর্মমতের অনেকটা হয়তো মেলে কিন্তু অন্য অসংখ্য বিষয়েই মেলে না; এমন-কি, ধর্মমতের মোটামুটি বিষয়ে মেলে কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ে মেলে না।" আবার— "....যাহাতে বাঙলার হিন্দুত্ব দূষিত হয় তাহাতে পাঞ্জাবের হিন্দুত্ব দূষিত হয় না, যাহা দ্রাবিড়ের হিন্দুর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে— তাহা কান্যকুব্জের হিন্দুর পক্ষে লজ্জাজনক।" রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন আজও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। আজকের ভারতে 'হিন্দুজাতি' এবং এর বিপক্ষে 'মুসলমান জাতির' ধ্বনি অসার অবাস্তব এক সামাজিক-রাজনৈতিক অপরাধ!

ওপার বাঙলার লেখক বদরুদ্দীন উমর বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের মুরশেদী মারফতী গান এদেশের গ্রাম্য মুসলমানের অন্তরকে নাড়া দেয়। কিন্তু এসকল গানের মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলি বিশুদ্ধ কোরাণীয় ধর্মতত্ত্বের বহির্ভূত এবং অনেক সময় তার বিরোধী। এখানকার মুসলমানদের ধর্মীয় ধারণা এবং সামাজিক রীতিনীতির অনেক কিছুর মধ্যেই হিন্দু-পৌত্তলিকতা এবং হিন্দুদের সামাজিক রীতির প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে.... ভারতীয় হিন্দুর সাংস্কৃতিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভারতীয় মুসলমানের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনের ধারণাকে প্রমানাভাবে অলীক কল্পনা ব'লেই মনে হয়।"[৫]

পৃথিবীর কোনো দেশেই মুসলমানরা একটি 'মোনোলিথিক হোমোজিনিয়াস' জনগোষ্ঠী নন।[৬] যে-কোনো মুসলমান-সমাজে শ্রেণীবিভাগ এবং অর্থনৈতিক অসাম্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানের কাছে ইসলামের ব্যাখ্যাও একরকম নয়। মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলিতে— শাসকশ্রেণীর ইসলাম এবং শাসিতশ্রেণীর ইসলামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়।[৭] ভারতেও মুসলমান-কৃষক ও মুসলমান-জোতদারের স্বার্থ এক নয়, সংস্কৃতি এক নয়, ইসলাম-উপলব্ধিও এক ধরনের নয়। মুসলমান রাষ্ট্রপতি অথবা মন্ত্রীর সঙ্গে গ্রাম্যপথের এক্কা চালানো গাড়োয়ানের ইসলাম-উপলব্ধির মধ্যে বিস্তর দূরত্ব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এই বিভেদকে অস্বীকার করার অর্থ ধর্মের দোহাই দিয়ে বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত ও বর্ণ তথা জাতি (Caste) শাসিত সমাজকাঠামোর পক্ষে সওয়াল করা। আজও গ্রামবাঙলার মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-জাতিপ্রথার অবশেষ লক্ষ করা যায়। একজন সৈয়দ বা কাজী যে সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, দারিদ্র্যপীড়িত একজন 'জোলা' বা 'মালো' তা পান না। এই বৈষম্যের কারণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়। বিবেকানন্দ লেখেন, "ভারতবর্ষের গরিবদের মধ্যে মুসলমান এত বেশি কেন? তরবারির সাহায্যে এদের ধর্মান্তবিত করা হয়েছে বলাটা বাজে কথা। তারা মুসলমান হয়েছে সেই সব জমিদার.... এবং সেই সব পুরোহিতের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য।" ব্রাহ্মণশাসিত বর্ণপ্রথা বা জাতিপ্রথার অবশেষের অনাচার আজও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। ধর্মগুরুর শাস্ত্রবাক্য বা মোল্লা-মৌলবীদের ফতোয়া-মারফৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিপরীতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংহতি আর ঐক্যের আহ্বান এ কারণেই! আজকের ভারতে শ্রেণী-নির্বিশেষে মুসলমান-ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান অনিবার্যভাবেই 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' বা 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের' হিন্দু-জাতীয়তার দাবিকে পরোক্ষে সমর্থন জোগায়।

ভারতে মুসলমান-সাম্প্রদায়িকরা ধর্ম এবং রাজনীতির পৃথকীকরণের বিপক্ষে। এঁরা মনে

করেন মুসলমানদের উচিৎ 'ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা'র জন্য কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালানো;[৮] কারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা ক্ষমতা ছাড়া ইসলামকে পূর্ণরূপে কল্পনা করা যায় না এবং ধর্মকে পূর্ণরূপে পালন করা যায় না। রাজনৈতিক ক্ষমতা ইহজাগতিক বস্তু নয়, তা হোলো অপার্থিব বস্তু।[৯] সুতরাং বহু প্রাণের মূল্যে এবং বহু সংগ্রামের বিনিময়ে ভারতের জনসাধারণ যে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছেন তা তাঁদের অর্জিত বস্তু নয়; এবং তা রক্ষা করার জন্য ও বর্দ্ধিত করার জন্য শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং উত্তাল কৃষক-কারিগরশ্রেণীর সংগ্রামের আঘাত থেকে সাম্রাজ্য অটুট রাখার জন্য ব্রিটিশ এক 'সেফটি ভাল্‌ব্' স্বরূপ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম দেয়। ঠিক একই কারণে পরবর্তীকালে এখানে সাম্রাজ্যবাদ এক সীমিত নির্বাচনী ব্যবস্থারও জন্ম দেয়,— যার ফলশ্রুতি হোলো বর্তমান ভারতের গণতন্ত্র![১০] এ সত্ত্বেও ভারতের মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে ঈশ্বরের দান ভাববার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এই গণতন্ত্রের পরিবর্তে কিছু মূঢ় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সুবিধাভোগী ধর্মগুরুর ফতোয়া-নির্ভর-শাসন প্রবর্তন করার কোনো অর্থ হয় না; তা ইতিহাসের বিরুদ্ধে যাবার অপচেষ্টা ব'লেই পরিত্যাজ্য! — "মধ্যযুগে যুগমানবের আসনে সমাসীন ছিলেন তৎকালীন মুনি-ঋষি ও নবী-আম্বিয়ারা। তাঁরা ছিলেন গুণী জ্ঞানী ও মহৎ চরিত্রের মানুষ, তবে ভাববাদী। তাঁদের আদেশ-উপদেশ পালন ও চরিত্র অনুকরণ করেছেন সেকালের জনগণ এবং তখন তা উচিৎও ছিল। কিন্তু সেইসব মনীষিরা এ যুগের মানুষের ইহজীবনের জন্য বিশেষ কিছুই রেখে যাননি, একমাত্র পারলৌকিক সুখ-দুঃখের কল্পনা ছাড়া।"[১১] ওপার বাঙলার মুক্তমনা লেখক আরজ আলী মাতুব্বরের এই সরল সহজ ইতিহাস-ব্যাখ্যার সঙ্গে আমরা অনেকটাই একমত। তবে আমরা এটাও মনে করি যে, আজকের গোঁড়ামী বিদ্বেষ আর অন্ধতাপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বোঝা বহন করার থেকে "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা"-র বার্তা-বহনকারী উদাত্ত লোকধর্ম অনেক প্রাণবন্ত। অসাম্প্রদায়িক এক জীবন দর্শন!

মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা প্রচার করেন— সর্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরের। আইন রচয়িতা একমাত্র পরমেশ্বর।[১২] এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের উপলব্ধি স্মরণযোগ্য;— "অপার্থিবকে পার্থিবের এলাকায় টেনে আনলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। আল্লার সর্বভৌমত্বকে জাগতিক ব্যাপারে টেনে আনলে যে গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয় তাতে প্রবেশের পথ পাওয়া গেলেও বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান বা বিবর্তনবাদকে অস্বীকার ক'রে বিশ্ব ও মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে যদি ধর্মীয় মতবাদও মেনে নেওয়া যায়, তাহলেও জাগতিক ব্যাপারে আল্লার সর্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার বিপদ অনেক...."[১৩] একথার সূত্র ধ'রেই আমরা বলতে পারি, পার্থিব ব্যাপারে ঈশ্বরের সর্বভৌমত্ব প্রচার করার উদ্দেশ্য জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা ও রাজনৈতিক-সামাজিক আশা-আকাঙ্খা-অভীপ্সা পূরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা।

সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা শিল্পবিপ্লব-উত্তর পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও আধুনিক প্রাগ্রসবতার বিরোধীতা করেন। এঁরা বলেন,— "....নির্বাচন-যুদ্ধে সেইসব লোকই সাধারণত জয়লাভ করিয়া থাকেন, যাহারা অর্থবল, জ্ঞানবিদ্যা, শঠতা, প্রতারণা, মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা প্রভৃতি হাতিয়াব ব্যবহার করিয়া জনগণকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হয়.... অতঃপর তাহারা জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য নহে— কেবল নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই আইন রচনা করে এবং

জনগণপ্রদত্ত-শক্তি প্রয়োগ করিয়া সে সব আইন জারি করে।"[১৪] এঁরা আধুনিক গণতন্ত্রকে 'শয়তানী গণতন্ত্র' ব'লে অভিহিত করেন এবং এর পরিবর্তে মোল্লাশাসিত এক মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখেন।

সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা প্রগতিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধীতা করেন সহজবোধ্য কারণে। মধ্যপ্রাচ্যের শেখদের নির্বোধ বিলাস আর ব্যভিচারের ভারতীয় প্রতিরূপের পক্ষেই তাঁরা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কর্মসূচি উপস্থাপিত করেন। "পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদ করা, সমস্ত মালিকানার উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করা, এবং একই কেন্দ্রবিন্দুতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ.... জমা করার মতো বড় রকমের পরিবর্তন ইসলাম চায় না।"[১৫] স্পষ্টতই হিন্দু-সাম্প্রদায়িক আর মুসলমান-সাম্প্রদায়িকদের পরম ঐক্যটি একই জায়গায়। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে ব্যাপক জনসাধারণের ওপর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, অতএব সাংস্কৃতিক শাসন-শোষণ চালাবার ক্ষমতা তুলে দেওয়া। 'সেকুলার' ভারতে দূরদর্শন-প্রচারিত ফিল্মী মহাকাব্যের চূড়ান্ত সাফল্য এবং এরপর বিভিন্ন হিন্দু পুরাণের সম্প্রচারণ সাংস্কৃতিক-শাসনের দৃষ্টান্ত;— এরই নিকৃষ্টতম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রকাশ মসজিদ ভাঙা এবং সাম্প্রতিক গুজরাট। আবার আমাদের এই 'সেকুলার' রাষ্ট্রই হিন্দুত্বের জয়ঢাক বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অথবা খৃষ্টানদের ধর্মীয় উৎসবের দিনে বা কোনো 'পবিত্র' দিনে দূরদর্শনে বা বেতারে 'বিশেষ অনুষ্ঠান' প্রচার করে।[১৬] স্পষ্টতই বোঝা যায়, এর অর্থ— ধর্মান্ধতা আর বিচ্ছিন্নতার চিন্তার প্রকোপ বৃদ্ধি করা।

উপরোক্ত মন্তব্যের সূত্র ধ'রেই বলা যায় হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের প্রচার যুক্তিহীন, গোঁড়া। এঁরা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আদান-প্রদানের ঘোরতর বিরোধী। এঁরা মনে করেন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্র এবং পুরাণভিত্তিক হওয়া উচিৎ; এবং 'হিন্দুরাষ্ট্র' যদি মুসলমানদের 'ম্লেচ্ছ' বা 'শূদ্রের' স্থান দেয়, তাহলে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই।[১৭] অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা শুধুমাত্র সাধারণ মুসলমানদের মননে ভেদবুদ্ধি আর বিদ্বেষ প্রচার ক'রেই ক্ষান্ত হন না, এঁরা প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকদের কার্যকলাপে ইন্ধন জোগান। সাম্প্রদায়িক মুসলমানের কণ্ঠে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 'সমর্থন' ব্যাপক গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুতির প্রচেষ্টা। হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হুঙ্কারের জবাবে এক সাম্প্রদায়িক যুযুধান ভঙ্গীমা!

বাস্তবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার অসম্ভাব্যতায় হতাশাগ্রস্ত সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা তাঁদের সমস্ত উদ্যম কেন্দ্রীভূত করেছেন ভারতে 'মুসলমান আইডেনটিটি'র অন্যতম প্রতীক 'মুসলমান ব্যক্তিগত আইন' সংরক্ষণের জন্য। ভারতবর্ষে বিভিন্ন বর্ণের এবং গোত্রের রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমান-ভোট হারাবার আশঙ্কায় এই আইন সংশোধনের ব্যাপারে নীরবতা পালন করে।[১৮] এদের অজুহাত হোলো 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি থেকে বিচ্যুত হ'তে হবে। সুতরাং ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয়-সম্প্রদায়কে এক মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে বন্দী রেখে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা ওড়ানোই রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে লাভজনক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যখন 'মুসলমান ব্যক্তিগত আইন' সংশোধিত হচ্ছে[১৯] তখন ভারতে 'আধুনিকীকরণ'-এর কোনো উদ্যোগ কোনো পক্ষেরই নেই। এ সম্পর্কে মুসলমান সম্প্রদায়িকদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হ'লেও

তা প্রগতির প্রতিবন্ধক। এঁরা মনে করেন— পাশ্চাত্য সমাজের অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের আইন-কানুন সেকুলার, কিন্তু ইসলামিক আইন-কানুন মৌলিকভাবেই ধর্মীয়[২০]। সুতরাং 'মুসলমান ব্যক্তিগত আইন' সংশোধনের যাবতীয় প্রচেষ্টার অর্থই ইসলাম ধর্মে হস্তক্ষেপ করা এবং তা সর্বশক্তিমান আল্লা ও প্রফেটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সমতুল্য।[২১] বেদ, উপনিষদ, গীতা, বা মনুসংহিতা অনেক হিন্দুর কাছে পবিত্র হ'তে পারে কিন্তু এসমস্ত ধর্মশাস্ত্র কোনো আদর্শ জীবনের ভিত্তি হ'তে পারে না; ঠিক একইভাবে মধ্যযুগে গ্রথিত 'মুসলমান ব্যক্তিগত আইন' আজ কোনো আদর্শ সমাজের ভিত্তি হ'তে পারে না! প্রফেটের সময়কালে ইসলাম ছিল সমতাবাদী (egalitarian), অর্থাৎ সে যুগের তুলনায় প্রগতিশীল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এমন সময় মহম্মদের আবির্ভাব হইলো.... সে সময়ে আরব-সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহু-বিবাহ, দাসী-সংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রী-পরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্য-পদবীতে আরোপণ করিলেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন, স্ত্রী বর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ-প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।"

'কোরাণ' পাঠ কবলে আমরা জানতে পারি, ক্রীতদাস মুক্ত করা অথবা দাসবালিকা বিবাহ করা ছিল সুকৃতির জ্ঞাপক। কিন্তু আজ সেই 'ট্রাইবাল' সমাজের[২২] আইন-কানুন আদর্শ সমাজের ভিত্তি হ'তে পারে না। আসলে, 'মুসলমান ব্যক্তিগত আইন' সংরক্ষণের উদ্দেশ্য— পৃথক 'মুসলমান আইডেনটিটি' বজায় রাখা।

ভারতের সমাজে হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়; এবং এ-কারণে হিন্দু-সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি অধিকতর সংহত, প্রভাবশালী, এবং আক্রমণাত্মক। মুসলমান সম্প্রদায়ের সংহতির আবেদন এ কারণেই কার্যকরী হয়।

কোনো কোনো 'সেকুলার' লেখক বলেন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক অরাজনৈতিক আন্দোলন গ'ড়ে তোলা উচিৎ[২৩]। অর্থনৈতিক সমস্যাই সাম্প্রদায়িকতার জনক; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা আর রাজনৈতিক বাতাবরণ। আমরা মনে করি পৃথকভাবে দরিদ্র মুসলমানদের সমস্যাগুলির সমাধান অসম্ভব। এবং এই প্রচেষ্টা বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক; সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা এক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সমস্যা; সতুরাং রাজনৈতিক পথেই এর সমাধান সম্ভব।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্বপ্ন দেখেছিলেন— ভবিষ্যৎ ভারতে এক 'মিশ্র সংখ্যাগুরু' এবং 'মিশ্র সংখ্যালঘু'র উদ্ভব হবে। ভবিষ্যৎ সংবিধানে, মানুষ তার সম্প্রদায়গত পরিচয়ে পরিচিত না হয়ে পরিচিত হবেন 'কৃষক' বা 'জমিদার', 'শ্রমিক' অথবা 'পুঁজিপতি' ইত্যাদি পরিচয়ে।

আজকের দাঙ্গাবিধ্বস্ত রক্তাক্ত গুজরাটের চেহারা দেখে আশঙ্কা হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের পূর্বতন শাসক-এলিটের অপদার্থতা আর বর্তমানের হত্যাকারী ও লোভী শাসকদের নির্লজ্জ ভূমিকা চিত্তে পীড়া দেয়! উন্মাদ ধর্মান্ধ এক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এখন এক সম্প্রদাযকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। মুসলমান-সাম্প্রদায়িকদের শাস্তি দিতে যাঁরা শতেক আয়োজন করেন, তাঁরাই— হিন্দু-সম্প্রদায়িকদের উচ্ছিষ্ট প্রার্থী! সন্দেহ নেই— হিন্দু-সাম্প্রদায়িকদের যথেচ্ছ তাণ্ডব রক্ষণাত্মক

মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতাকে আরও সংহত করবে, সাধারণ হিন্দু-মুসলমান দূরত্ব বাড়বে, সমাজে অস্থিরতা বাড়বে; লাভ হবে স্বদেশী-বিদেশী ধনপতিদের।

'দেশপ্রেমিক' হিন্দুত্বওয়ালদের 'বীরত্বের কাহিনী' আজ আমাদের বিমূঢ় ক'রে দেয়। যাঁরা আজ মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা তথা ইসলামের ওপর গোঁসা ক'রে মুসলমান মায়েদের নৃশংস অত্যাচার ক'রে খুন করেছেন, হিন্দু বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত ক'রে তাঁদের বলি— "....ভিন্ন পথে ঈশ্বরের অনুগামী ভাইদের যারা ধ্বংস করতে চায়.... তাদের ভালোবাসার খুব একটা দাম নেই... পৃথিবীর কোনো ধর্মের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই....."। অথবা, "....মহম্মদ সাম্যের মহাদূত। আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, 'তাঁর ধর্মে কি ভালো থাকতে পারে?' ভালো যদি না-ই থাকতো তা বাঁচলো কেমন ক'রে? ....মহম্মদের শিক্ষায় যদি ভালো কিছু না-ই থাকে তো ইসলাম ধর্ম বাঁচলো কী ক'রে? ....মহম্মদ ছিলেন সাম্যের। মানুষের ভ্রাতৃত্বের সমস্ত মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের ধর্মপ্রবর্তক পয়গম্বর।"

আজ হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা সদম্ভে ঘোষণা করেন, "গরব্-সে কহো হাম হিন্দু" আর মুসলমানদের দেশত্যাগ করাবার জন্য ধ্বনি তোলেন, "হম পাঁচ, হামারা পঁচিশ"— যা না-কি জীববিজ্ঞানের বিচারে অসম্ভব!

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়— মিথ্যার আয়ুষ্কাল অত্যন্ত সীমিত, সত্যই ভাস্বর!

বিবেকানন্দের স্বপ্নের 'শূদ্র যুগের' আকাঙ্খাতেই 'মিশ্র সংখ্যাগুরুকে' আজ শোষণ অত্যাচার আর ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে 'মিশ্র সংখ্যালঘুর' বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে। আবার বিবেকানন্দের শরণ নিয়ে বলি, "আমরা মানবজাতিকে এমন একটি অবস্থায় নিয়ে যেতে চাই— যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরাণও নেই; অথচ এই কাজটি করা সম্ভব বেদ বাইবেল ও কোরাণের সমন্বয় দ্বারাই...."।

ধর্মকে তার প্রাতিষ্ঠানিকতা আর আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বর থেকে বিমুক্ত ক'রে একান্ত ব্যক্তিগত ক'রে তোলার সার্বিক সর্বজনীন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিৎ। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সাধ্য নেই এই মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর। আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে, তাই ভবিষ্যতের নাম-না-জানা এক ধর্মহীন শিশুর আর্বিভাবের স্বপ্ন নিয়ে বলি,—

....মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধ কণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১। K M Panikkar. The Foundation of New India London 1963. p. 167
২। Yogendra Singh. Modernazation of Indian Tradition Faridabad. 1973 p. 77
৩। Ibid p.78

৪। Sadruddin Islahi. Islam at a Glance. Translated by M. Zafar Iqbal. Delhi, 1978. p. 182

৫। বদরুদ্দীন উমর; সাম্প্রদায়িকতা; ঢাকা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৩৬

৬। Moin Shakir. Politics of "Islamic Fundamentalism"; in Anwar Moazzam (ed.), Islam and Contemporary Muslim World. New Delhi, 1981. p. 14.

৭। Ibid. p. 13.

৮। Islahi. op. cit. p 145.

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রবক্তারাও একই কথা বলতেন। দ্বি-জাতি তত্ত্বের এক তাত্ত্বিক বলেছিলেন, "মুসলমানদের উচিৎ ইসলামের জন্য ভারতবর্ষ পুনর্দখল করার জন্য কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালানো, এটাই তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। F. K. Khan. Durrani. The Meaning of Pakistan. Lahore, 1944 p 146.

৯। Sadruddin Islahi op cit. p 144.

১০। Yogendra Singh. op. cit. p 117.

১১। আবজ আলী মাতুব্বর; 'আমার পরিচয়'; অরুণ সেন, আবুল হাসনাত (সম্পাদনা), বাঙালি ও বাংলাদেশ, কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩১

১২। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ; (মোঃ আবদুর রহিম, অনুবাদ), কোলকাতা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ২০

১৩। আবুল ফজল; 'মানব তন্ত্র'; অরুণ সেন, আবুল হাসনাত (সম্পাদনা), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪০

১৪। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫

১৫। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী; আজকের দুনিয়ায় ইসলাম; মুনীর উদ্দীন আহমদ, (অনুবাদ), কোলকাতা, ১৯৮১; পৃষ্ঠা ৩৩

১৬। বর্তমান সরকারের আমলে হিন্দুত্বের দ্বন্দ্বযুদ্ধো লেগে গেছে। রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে দূরদর্শন বেতার ইত্যাদি মারফৎ তীর্থযাত্রার খবর, পুরাণ, পাঁচালি আর কীর্তন প্রচার ক'রে আক্রমণাত্মক হিন্দুত্বে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

১৭। Moin Shakir. Secularization of Muslim Behaviour Calcutta, 1973. p. 91.

১৮। M C. Chagla, Quoted in Suman Dubey, Bhabani Sengupta, Prabhu Chawla and Sunil Sethi, Muslims : Politics of Insecurity. India Today, Vol V. No. 17. September 1-15, 1980. p. 21.

১৯। Moinuddin Qudir Islamic Law in the Modern World, in Anwar Moazzam (ed.) op. cit. p. 137. See also M.R.A Baig. The Muslim Dilemme in India. Delhi, 1974. p. 70

২০। Maulana Syed Hamid Ali. Changes in Muslim Personal Law : Scope and Procedure; in F. R Faridi and M. N. Siddiqi (ed.). Muslim Personal Law. Aligarh, 1973. p 82

২১। M. R. Zafar Ahmed Siddiqi 'Muslim Personal Law'. in F. R. Faridi and M. N. Siddiqi op cit p. 131.

২২। Yogendra Singh op. cit p. 65.

২৩। Hamid Dalwai Muslim Politics in India. Bombay, 1968. p 89.

[বোধি, শারদীয়া ১৩৮৯]